মসনদ

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

শশধর প্রকাশনী
১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

প্রথম প্রকাশ : ১৯৬২

প্রকাশিকা : রমা বন্দ্যোপাধ্যায়
১০/২, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট
কলিকাতা—৭০০ ০০৯

মুদ্রণ : অশোক কুমার ঘোষ
নিউ শশী প্রেস
১৬, হেমেন্দ্র সেন স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০ ০০৬

উৎসর্গ

শ্রী তানাজী সেনগুপ্ত

প্রীতিভাজনেষু

আমাদের প্রকাশিত কয়েকটি বিশিষ্ট বই ঃ

আলোচনা গ্রন্থ ঃ

মার্কসবাদ কবিতার উৎস সন্ধানে ঃ সম্পাদনা ঃ রমাপ্রসাদ দে

কেশবচন্দ্র সেন ঃ ব্যক্তিত্ব ও গদ্যশিল্প

ডঃ অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়

তত্ত্বসার ঃ রামচন্দ্র দত্ত (শ্রীরামকৃষ্ণের প্রথম শিষ্য)

প্রসঙ্গ রামায়ণ ঃ হিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রসঙ্গ মহাভারত ঃ

যত মত তত পথ

উপন্যাস ঃ

লা নুই বেঙ্গলী—মির্চা এলিয়াদ পরিমার্জনা ও সম্পাদনা ঃ
জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

শুকসারি কথা ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

উত্তরায়ণ ঃ তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

নির্ণয় ঃ আশাপূর্ণা দেবী

নরক স্বর্গ নরক ঃ মায়া বসু

অমৃতধারা ঃ তারাজ্যোতি মুখোপাধ্যায়

সপ্তকন্যার কাহিনী ঃ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

চারজন এবং একজন ঃ " "

সেরা প্রেমের গল্প ঃ আশুতোষ মুখোপাধ্যায়

ক্ষুধা ঃ " "

সেরা প্রেমের গল্প ঃ হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়

রম্যরচনা ঃ

চক্র বক্র ঃ বাণী রায়

কবিতা ঃ

বরণীয় কবি স্মরণীয় কবিতা ঃ সম্পাদনা ঃ রমাপ্রসাদ দে

বিংশতি কবিতা ঃ ডিরোজিও অনুবাদ ঃ রমাপ্রসাদ দে
মঞ্জুষ দাশগুপ্ত

বাংলা কবিতা : অর্ধশতক

সম্পাদনা : দিনেশ দাস ও রমাপ্রসাদ দে

দশ দিগন্তে রবি : সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে

চলচ্চিত্র :

চলচ্চিত্রের আবির্ভাব : জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়

স্ত্রী : বিমল মিত্র : চিত্রনাট্য : সলিল দত্ত

কিশোর গ্রন্থ :

সিনেমা আবিষ্কারের গল্প : জয়ন্ত ভট্টাচার্য

কত কাণ্ড রেলগাড়ীতে : আশাপূর্ণা দেবী

জয় পরাজয় : সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

ডিটেকটিভ :

স্বর্গের বাহন : সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজ

সোনার : ঠাকুর

ভ্রমণ কাহিনী :

দূর কভু দূর নহে : শংকর মহারাজ

জীবনী গ্রন্থ :

ডিরোজিও সম্পাদনা : রমাপ্রসাদ দে

আমার বাল্যকথা : সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

মসনদ

আমার কালো অ্যামবাসাডার গাড়ি রাজভবনে ঢুকছে। যখন গেটে প্রায় ঢুকে পড়েছি, তখন বুকটা ধক করে উঠল। ধরা যাক আর আধঘণ্টা। আর আধঘণ্টা পরে এই এতবড় একটা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে যাব আমি। পাঞ্জাবির পকেট থেকে ছোট্ট একটা কৌটো বার করে, আধখানা সরবিটেট জিভের তলায় ঢুকিয়ে দিলুম। দুম করে মরে না যাই! আজ থেকে দশ কি বিশ বছর আগে এই ভবিষ্যৎটা তো আমি দেখতে পাইনি! দেখতে পেলে তেলে ভাজা একটু কম খেতুম। হার্টটা ভালো থাকতো। কোলেস্টোরাল এত বাড়তো না। তখন তো মনে হত, 'কবে নিবি মা!' এখন মনে হয়, 'সহজে নিস নে মা। দেশের কাজ করতে দে মা। শুধু এলুম, আর হ্যা হ্যা করে চলে গেলুম। সেটা কি ঠিক হবে! মহাপুরুষরা বলে গেছেন, দাগ রেখে যা, দাগ।'

পাশেই বসে আছে আমার বউ। দশ বছর আগের সেই ঘরোয়ালী চেহারা আর নেই। সাতদিনেই পালটে গেছে। ইন ফ্যাকট আমি মুখ্যমন্ত্রী হতে পারি শুনেই, শরীরটাকে এক্সপার্টদের হাতে ফেলে দিয়েছিল। দে হ্যাভ ডান এ গুড জব। ভালো হাতের কাজ দেখিয়েছে। পা থেকে মাথা পর্যন্ত এমন একটা ব্যাপার করে দিয়েছে, আড় চোখে তাকালে মনে হচ্ছে, পরস্ত্রী। কেন্দ্রের মতো চেহারা করে দিয়েছে। মনে হচ্ছে, কেন্দ্রীয় স্ত্রী। এত কাল কোমরে আঁচল জড়িয়ে বলে এসেছে, 'ভাত দেওয়া হয়েছে, খাবে এসো।' পরশু দুপুর থেকে বলতে শুরু করেছে, "লাঞ্চ করবে এস"। কুঁচিয়ে পরা শাড়ি। ববকাট চুল। হাত কাটা ব্লাউজ। জিনিসটা দেখার মতোই হয়েছে। সংস্কার করলে সব বস্তুতেই চেকনাই আসে। পেতলের পিলসুজ আর কি।

রাজভবনের মোরাম বিছানো পথে মশমশ শব্দ তুলে আমার কালো অ্যামবাসাডার দরবার হলের সিঁড়ির সামনে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। দুধারে দু-সার আমার ক্যাবিনেট কোলিগস। শব্দটা ইংরেজি কাগজ পড়ে শিখেছি। সকলকেই আজ কেমন সম্মানিত দেখাচ্ছে! ভেরি রেসপেকটেবল। অথচ বছর দুয়েক আগেও এলাইটস অফ দি সোসাইটি, এদের দেখে মুখ বাঁকাতো।

বলত, স্কামস অফ দি আর্থ। জমানা বদলে গেছে। এর জন্যে আমার পূর্ব পূর্ব পূর্ব নেতাদের ধন্যবাদ। একেবারে সমতল করে দিয়ে গেছেন সব। উঁচু নিচু বলে আর কিছু নেই। সমাজ এখন ফ্ল্যাট চেস্টেড ওম্যানের মতো।

গাড়ি থেকে প্রথমে নামলেন আমার স্ত্রী। আগে খুব ইংরিজি সিনেমা দেখতুম। মনে হচ্ছে শিফনের শাড়ি পরা সোফিয়া লোরেন। দোলা লাগিয়ে দেবার মতো যৌবন এখনও আছে। গাড়ি থেকে নেমে কোলিগসদের দিকে তাকিয়ে বলতে ইচ্ছে করছিল, কজন মুখ্যমন্ত্রীর এমন স্ত্রী আছে! খুব সামলে নিলুম। প্রতিদিন নদীর জলের মতো আমার স্ট্যাটাস বাড়ছে। কাল যা ছিলুম, আজ আর তা নেই। চিন্তা, ভাবনা, কথা সব কিছুতেই চেক ভালভ পরাতে হয়েছে।

সারিবন্ধ মন্ত্রিসভার সদস্যরা আমাকে অভিবাদন জানালে। কাল রাতে এদের নানাভাবে ট্রেনিং দিয়েছি। ভিডিও আনিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান দেখিয়েছি। নিজে দেখেছি। আমারও তো তেমন কিছু জানা নেই। বাপের পয়সা ছিল। ছাত্রজীবনটা কলেজ চেখে চেখে কাটিয়ে দিয়েছি। এক সুন্দরী অ্যাংলো ইণ্ডিয়ানের সঙ্গ পাবো বলে কিছুকাল স্পোকন ইংলিশ শিখেছিলুম। যে কলেজেই গেছি সেই কলেজেই ছাত্র আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছি। ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস লেখা হলে দেখা যাবে, অনেকটা সংস্কৃত ভাষা শিক্ষার মতো। তিনটি পর্ব, আদি, মধ্য, অন্ত। আদিপর্বে, গেট বক্তৃতা, পোস্টারিং। মধ্যপর্বে ঘেরাও, ধর্মঘট। তারপর মানুষের অন্তিম দশার মতো। বোম, ছুরি ভাঙচুর মাঠময়দান।

যাক অতীত এখন থাক। এখন আমার খেলার সময়। পূর্ববর্তী মুখ্যমন্ত্রীর মডেলই আমি অনুসরণ করবো। তিনিই আমার গুরু। অমন সফল একজন মুখ্যমন্ত্রী তো এর আগে এ দেশে আসেননি। অদ্ভুত একটা পার্সোন্যালিটি ছিল তাঁর। হাঁটা, চলা, কথা বলা। তাঁর গুণের কথা বলতে গিয়ে সাংবাদিকরাই একটা কথাই বারে বারে বলতেন, ভদ্রলোকের মুখে কেউ কখনও হাসি দেখেনি। গত তিনদিন আমি একবারও হাসিনি। এখন আমার এমন আত্মবিশ্বাস এসে গেছে, কেউ কাতুকুতু দিলেও হাসব না। আমার স্ত্রী এই যে সিঁড়ি বেয়ে উঠছে, হাই হিল সামলাতে না পেরে উলটে পড়ে গেলেও হাসবো না।

আমার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীর মতো, এক হাতে কোঁচা ধরে আমি গুটগুট করে

ওপরে উঠে এলুম। বিলিতি আমলের বাড়ি, তার কেতাই আলাদা। আগে কখনও আসিনি। না এলেও ভয় করছে না একটুও। দুপাশে সার সার পামগাছের টব। লাল কার্পেটের ওপর দিয়ে হেঁটে সোজা দরবার হলে। ঝাড়লণ্ঠন জ্বলছে। বিশিষ্ট অভ্যাগতরা বসে আছেন। বিদেশী কনসুলেটের প্রতিনিধিরা এসেছেন। ব্যাপারটা প্রায় রাজসভারই মতো।

গলিত এক বৃদ্ধ। তিনিই রাজ্যপাল। আমাদের দেশের নিয়ম অনুসারে রাজ্যপাল, রাষ্ট্রপতি এইরকমই হবেন। গেল গেল গেল গেল, রইল রইল করে এক একটা দিন যাবে। কবিরাজী, হেকিমি, অ্যালোপ্যাথি, টোটকা করে ছাগল দুধ, গরুর দুধ করে টিকে থাকা।

মন্ত্রগুপ্তির শপথ নিলাম ইংরেজিতে। উপায় নেই। এই রাজ্যে, এই রাজ্যের মানুষ রাজ্যপাল হবেন, এমন আশা করাটাই অন্যায়। সেটা হবে প্রাদেশিকতা, বিচ্ছিন্নতা, সংকীর্ণতা, একদেশদর্শিতা, দেশদ্রোহিতা। গোর্খারা গোর্খাল্যাণ্ড চাইতে পারে, অসমীয়রা অসম চাইতে পারে, নাগারা নাগাল্যাণ্ড চাইতে পারে, তামিলনাড়ু অন্য ভাষার মাতব্বরি না মানতে পারে। অন্য প্রদেশের ব্যবসায়ীদের অর্থনীতি কব্জা করতে না-ও দিতে পারে ; আমাদের তা চলবে না। আমরা আন্তর্জাতিক। বুক পেতে দাও নেচে যাই।

একে একে আমার মন্ত্রিসভার সদস্যারা সব শপথ নিল। দু একজন একটু ভয় পেয়ে গিয়েছিল। এত করে তালিম দিয়ে নিয়ে এলুম, তাও ঠিক শেষ মুহূর্তে নার্ভাস হয়ে গেল। কিছুতেই বোঝাতে পারলুম না, দেশ শাসন করার মধ্যে হাতি ঘোড়া কিছু নেই। শাসন আবার কি ? সে ছিল ব্রিটিশ শাসন। ব্রিটিশরা চলে গেছে, শাসনের কালও শেষ হয়ে গেছে। আমরা স্বাধীন। স্বাধীন দেশে শাসন থাকবে কেন ? যার যার তার তার ব্যাপার। লড়ে যাও। শাসন নয় বিজনেস। ইংরেজি কোটেশান দিয়ে বুঝিয়েছিলুম, 'দি স্টেট ইজ এ বিজনেস'। কিছু দাও। কিছু নাও। যাক অনুষ্ঠান শেষ হোক, তখন আর একবার ভালো করে বোঝাতে হবে।

শপথ গ্রহণের পর চায়ের আসর বসল। এইটাই নিয়ম। রাজ্যপাল তাঁর নতুন মন্ত্রীসভাকে চা, প্যাস্ট্রি খাওয়ান। আমার কোলিগসদের একটা কথা বলতে ভুলে গিয়েছিলুম যে এই সব জায়গায় অসভ্যের মতো গপগপ করে খেতে নেই। ওরা সেই ভুলটাই করল। যে যা পারল একেবারে হামড়ে পড়ে খেতে শুরু করল। বিদেশী অভ্যাগতরা হাঁ করে দেখছেন। কি লজ্জার কথা !

যাক বেশিক্ষণ আর ভাবার অবসর পেলুম না। টিভি, রেডিও, সংবাদপত্র, সংবাদপত্রের রিপোর্টাররা একেবারে ছেঁকে ধরলেন। স্নানগ্লাসের চড়া আলো। ক্যামেরার ফ্ল্যাশ। কোনওদিকে আর মুখ ঘোরাবার উপায় নেই। যেদিকেই তাকাচ্ছি। ফটাফট মারছে। এরই মাঝে রাজ্যপালের সঙ্গে অল্প একটু আলোচনা করে নিলুম। মনে হল তিনি বেশ চিন্তিত। রাজ্যের ভবিষ্যৎ কি হবে!

'ভবিষ্যৎ কি হবে মানে? অতীতটা কি খুব ভালো ছিল? যা বলবেন ভেবেচিন্তে বলুন। শুরুতেই কেন্দ্রের কণ্টস্বর! হিজ মাস্টারস ভয়েস।'

রাজ্যপাল গম্ভীর মুখে বললেন, 'এই ভয়টাই করেছিলুম। রাজ্যপালের সঙ্গে কথা বলার নিয়ম আছে। সেইটা আপনাকে শিখতে হবে। কাগজের স্টেটমেণ্টে যা খুশি বলুন। ওটা স্টেট বিজনেসের একটা চাল। জনসাধারণের সামনে নানা ইস্যু রাখতেই হয়। ইস্যু হল ললিপপ। ছেলে কাঁদলে মা যেমন মুখে স্তন গুঁজে দেন। কিন্তু এখানে আমার কাছে যখন আসবেন, তখন আমরা হলুম রাজার জাত। আমাদের কথায় কোনও বিষয় থাকবে না। ঝাঁঝ থাকবে না। শ্লেষ থাকবে না। অর্থবোধক অথবা অনর্থবোধক কিছু শব্দ নিয়ে লোফালুফি। আপনি সব সময় মনে রাখবেন, আমরা নিমিত্তমাত্র।'

'আপনি কি আমাকে শিক্ষা দিচ্ছেন?'

'দিতে হচ্ছে। কারণ আপনি নভিস। পার্লামেণ্টারি ডেমোক্রেসির কিছুই জানেন না। ইউ আর টু লার্ন মেনি থিংস।'

'আমার কি বলা উচিত ছিল?'

'আপনার খুব থিয়োরেটিক্যাল কথা বলা উচিত ছিল। পরীক্ষার প্রশ্নোত্তরের মতো। যেমন,পাওয়ার আমাদের ফার্স্ট প্রায়রিটি। আনএমপ্লয়মেণ্ট নিয়ে সিরিয়াসলি ভাবতে হবে। ট্র্যান্সপোর্ট আমরা টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরিতে আসার চেষ্টা করবো। ডু ইউ ফলো?'

'আমরা টোয়েণ্টিয়েথ সেঞ্চুরিতেই তো আছি।'

'ফিজিক্যালি, মেটিরিয়ালি পড়ে আছি সেভেনটিন্থ কি এইটিন্থ সেঞ্চুরিতে। আমাদের গ্রামে এখনও জোনাকিই বিদ্যুৎ। টোটকাই একমাত্র চিকিৎসা। দিল্লী আর বোম্বাই কোনরকমে নাইনটিন্থ সেঞ্চুরি ক্রস করেছে।'

রাজ্যপালের আলাদা একটা আভিজাত্য। বেশ বুঝলুম এই আভিজাত্যে আমার খামতি আছে। মাথা নিচু করে দরবার হল থেকে বেরিয়ে এলুম। আমার স্ত্রী কেবল বলতে লাগল, 'হ্যাঁ গো, রাজ্যপাল তোমাকে ধমকালেন?

ধমকধামক দিলেন !'

আমি কথা বলতে পারছি না। গোটা ছয়েক মাইক্রোফোন আমার ঠোঁটের সামনে। আমি চলেছি মাইক্রোফোনও পাশে পাশে চলেছে। আমার স্ত্রীর কোমরে এক থাক চর্বি জমেছে। সেটা সুখের না অসুখের বলতে পারবো না। বাঁ হাত বাড়িয়ে কটাস করে চিমটি কেটে দিলুম। বোকা, তোমার বুদ্ধি নেই। যা বলছ, সব যে টেপ হয়ে সারা ভারতে ছড়িয়ে পড়ছে !

সাংবাদিকদের হাত থেকে সহজে মুক্তি পাওয়া অসম্ভব ব্যাপার। আজকাল আবার মেয়েরা সাংবাদিকতায় এসেছেন। তাঁদের আবার ঠেলে সরানো যাবে না। ইংরেজি কাগজের এইরকম একজন সাংবাদিক প্রশ্ন নিয়ে ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, 'আপনি কি এই মিনিস্ট্রি রাখতে পারবেন ?'

চান্ করে রক্ত উঠে গেল মাথায়। জিন্স পরা ছুকরি বলে কী। বেশ একটু রেগেই বললুম, 'পারবো না কেন ?'

'বড় বেশি জোড়াতালি তো। আর সবাই আনকোরা নতুন। একেবারে নভিস।'

'কম্পিউটার কি বলেছে জানেন ? এইটাই এ রাজ্যের শেষ মিনিস্ট্রি। শেষ কথা। লাস্ট ওয়ার্ডস।'

'কম্পিউটার তো আর দেশ চালাবে না।'

'দেশ আমরাই চালাবো। লেটেস্ট ম্যানেজমেণ্ট টেকনিকে।'

'একটু একসপ্লেন করবেন।'

'আমার নিজের ধারণা খুব একটা পরিষ্কার নয়। মডেলটা দিল্লি থেকে ধার করব। প্রয়োজন হলে আমেরিকা চলে যাবো। তবে আমার নিজস্ব প্ল্যান হল দেশটাকে বিভিন্ন ফ্যাকালটির হাতে তুলে দেবো। ব্যবসা বড়বাজার দেখবে। শিল্প শিল্পীরা দেখবেন। শিক্ষা শিক্ষকরা দেখবেন। কৃষি কৃষকরা দেখবেন। পুরো দেখাশোনার ব্যাপারটা কোম্পানীর হাতে ছেড়ে দেবো। মাসে মাসে আমরা একটা মাসোহারা পাবো। আমরা আমাদের বখেরাটা বুঝে নেবো। আমাদের স্লেট আমরা পরিষ্কার রাখবো। কাউকে বলতে দেবো না, যে তোমরা এই করলে না। ওই করলে না। যার হ্যাপা সে সামলাক, আমাদের কাঁচকলা।

'নির্বাচন জিতলেন কি করে ?'

'নেগেটিভ ভোট।'

'পরের বার ফিরে আসছেন কি?'

'পরের কথা পরে। পাঁচ বছরে আমরা সবাই সমানভাবে গুছিয়ে নোবো।'

গাড়িতে উঠে পড়লুম। পরের দিন কাগজের হেডলাইন দেখে স্তম্ভিত। ব্যানার হেডলাইন, 'নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণ। মুখ্যমন্ত্রীকে রাজ্যপালের তিরস্কার।'

শ্যামলীকে ডেকে দেখালুম, "তোমার কাণ্ড দেখে যাও। তোমার জন্যে প্রথম দিনেই বিশাল হোঁচট। অক্ষরের সাইজ দেখেছ। বিয়াল্লিশ কি বাহাত্তর পয়েন্টের এক একটা ঢ্যালা ছুঁড়ে মেরেছে। এখন থেকে জেনে রাখ, আমরা সাধারণ ভাত ডাল খাওয়া মানুষ নই। আমি মুখ্য, তুমি স্ত্রী মুখ্য। এক নম্বর নাগরিক আমরা। ফিল্ম স্টার আর পলিটিক্যাল স্টারে কোনও তফাৎ নেই। আমরা যা বলব, যা করব, সবই সংবাদ হয়ে কাগজে বেরিয়ে যাবে। জানবে, দেয়াল আর দেয়াল নয়। বিশাল চারটে কান। রাস্তা আর রাস্তা নয় ক্যামেরার লম্বা চোখ। সেই কারণে কথা বলবে না। কোনও কিছু করবে না। এখন থেকে আমাদের আদর্শ হবেন, শ্রীজগন্নাথ। এ বাড়ি, ও বাড়ি ওই আগের মতো, দিদি কী রান্না হল, দিদি কী সিনেমা দেখা হল,ছেলের রেজাল্ট বেরোবে কবে, এই সব একদম করবে না। এই অভ্যাসটা তোমার চিরকালের। লাটাইয়ের সুতোর মতো নিজেকে গুটিয়ে রাখবে সব সময়। সব কথার এমন উত্তর দেবে, যেন দুরকম মানে হয়, কি কোনও মানেই হয় না।'

'যদি কেউ জিজ্ঞেস করে কেমন আছেন?'

'বলবে, বর্ষা এবার ভালো হল না। না না, দাঁড়াও, ওটা তো বলা যাবে না।'

'কেন?'

'রিস্ক আছে। স্বীকারোক্তি হয়ে গেল। বর্ষা ভালো হল না মানে খরা। সঙ্গে সঙ্গে কাগজে ফলাও হয়ে যাবে। দেশব্যাপী খরা। মন্ত্রীরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমোচ্ছে। সেচের কোনও ব্যবস্থাই করা হয়নি, ত্রাণ বিলম্বিত। ত্রাণের টাকায় পার্টি ফিস্টি খেয়েছে। ওদের অনেক স্টক ছবি থাকে। খরার ছবি, বন্যার ছবি। বেহারের মাঠে গরু চরছে, ঠিক দুপুরে সেই ছবিটা ছেপে বললে, বীরভূম বাঁকুড়া জ্বলে গেল। ক্ষান্তপিসির ফাটা ফাটা মুখ, লিখে দিলে অনুদে। এজরা স্ট্রিটের ভিখিরি। অনাহারের অ্যানাটমি।'

'তা হলে কি বলবো?'

'বলবে ? আপাতত মাস তিনেক কিছু না বলাই ভালো। ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থাকবে। আমাদের মন্ত্র হবে, শুনেও শুনছি না, দেখেও দেখছি না।'

'আমি বলবো ? আমাদের মেয়েদের একটা ভালো শব্দ আছে, তাইই।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, তা আ আ আই। সবেতেই ওটা ব্যবহার করা যায় এবং করবেও। এখন দেখবে অনেকেই তোমাকে অনেক কিছু বলতে আসবে। আপার সোসাইটির মহিলারা আসবেন। ওঁদের সব নানা ব্যাপার আছে, বুঝলে ? ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। ক্র্যাফটস ডেভালাপমেণ্টসোসাইটি। স্লাম ডেভালাপমেণ্ট সোসাইটি। নিউট্রিশান প্রোগ্রাম। আই ব্যাঙ্ক। কিডনি ব্যাঙ্ক। মেডিসিন ব্যাঙ্ক। বুক ব্যাঙ্ক। প্রিজারভেশন অফ ওম্যান রাইটস। বটল ব্যাঙ্ক।'

'বটল ব্যাঙ্ক কি জিনিস ?'

'মদ ও বিয়ার বোতল সংগ্রহ করাই যে সমিতির কাজ। নানারকম জিনিস তৈরি করে, সারা বছর ওঁরা নানা ফেট অর্গনাইজ করেন, সেইখানে বিক্রি করা। ওই রকম একটা ফেটে আমি একবার এক মাসের মেয়ের গায়ে হবে এই রকম জামার দাম শুনে ভয়ে পালিয়ে এসেছিলুম। কত দাম হতে পারে ?'

'তিরিশ, চল্লিশ ম্যাকসিমাম।'

'সাদা, জ্যালজেলে একটা কাপড়। দাম, দুশো টাকা। ছোট্ট হাতমোছা একটা তোয়ালের দাম পঁচিশ টাকা। থাক ও প্রসঙ্গ থাক। ওই সব সুরভিত, অ্যাণ্টিসেপটিক মহিলারা তোমার কাছে প্রায়ই আসবেন। ঠোঁটে জাম রঙের লিপস্টিক। ঘর্মাক্ত মেকআপ। তোমাকে দিয়ে সভাসমিতি করাবেন, উদ্বোধন করাবেন, প্রাইজ দেওয়াবেন, আই অপারেশান ক্যাম্পে চশমা বিতরণ করতে হবে। বিরক্ত হলে চলবে না। ওই মহিলারা এখন বধূ হত্যা ও নারী ধর্ষণ নিয়ে খুব মাথা ঘামাচ্ছেন। তোমাকে হয়তো প্রশ্ন করলেন, বধূহত্যা কি খুব বেড়েছে?

'আমি সঙ্গে সঙ্গে বলব, তাআই।'

'রাইট। সোনা আমার। ওঁরা জিজ্ঞেস করবেন, গ্রামে গঞ্জে, রাস্তাঘাটে মহিলারা ধর্ষণকারীর ভয়ে হাঁটতে পারছে না।'

'আমি সঙ্গে সঙ্গে বলব, তাআআই।'

'তুমি পারবে। তোমার সে এলেম আছে। তবে তোমাকেও সেবার কাজে লাগতে হবে। ভয় পেও না। সেবা মানে কোমরে আঁচল জড়িয়ে পঙ্গতে পরিবেশন নয়। একটা গাড়ি থাকবে, তোমার হাতে কিছু ফাইল আর কাগজপত্র

থাকবে। তোমার কোথাও একটা অফিস থাকবে। আর সমাজসেবার এমন এমন দিক সব বেছে নেবে যা ইণ্টারন্যাশনাল। তোমার উদ্দেশ্যটা হবে, থেকে থেকে বিদেশ যাওয়ার সুযোগ করে নেওয়া। যেমন ধরো বস্তি বা ফুটপাথের শিশুদের পুঁয়ে পাওয়া নিবারণ। চলে গেলে আর্জেণ্টিনা কি উরুগুয়ে। যেমন ধরো নিম্নবিত্ত মায়েদের গর্ভকালীন অপুষ্টি। চলে গেলে নিউইয়র্ক। কর্ণিয়া গ্র্যাফটিং, চলে গেলে মস্কো। সব সময় মনে রাখবে, মানুষ তোমার গিয়ে বিলেতি কুকুর নয়, যে অত সেবা আর তোয়াজ করতে হবে। ভেবে দেখ, পৃথিবীতে যত গোল্ডেন রিট্রিভার, কি গ্রেটডেন, কি বকসার, কি চু হুয়াহুয়া আছে তার চেয়ে হাজার হাজার গুণ বেশি মানুষ এই কলকাতায় আছে। মানুষ পটল তুলে কিছুই করতে পারবে না। কোনও করুণা, কোনও সহানুভূতিই আদায় করতে পারবে না। দু হাজার এক সালে অবস্থাটা কিরকম দাঁড়াবে জানো, মরলো, মরলো, বাঁচলো বাঁচলো। অনেকটা নেড়ি কুকুরের মতো। সারা রাত খেয়োখেয়ি। পথের ধারে পুঁটকিপাঁট। লোকে যেভাবে মরা কুকুরের দিকে তাকিয়ে চলে যায়, সেই উদাসীনতায় চলে যাবে। বড় জোর গাটা একটু ঘুলিয়ে উঠবে। আমরা গদিতে কিছুকাল স্টিক করে থাকতে পারি, তা হলে আমাদের যে দুটো কাজ করে যেতে হবে, তা হল ক্যানিবলিক ক্যানাইন সোসাইটি তৈরি। পুরোপুরি। আংশিক নয়। একজন কসাই গরু কি ছাগল মরে পড়ে আছে দেখলে কি ভাবে? আহা, মরে গেল রে, বলে নাকের জল টানে? না। সে লাফিয়ে ওঠে, চামড়া। কাফ, ক্রোম, কিড লেদার। দু হাজার একে, আমরা এমন করে দোবো, মানুষ দেখলেই মানুষ কঙ্কালের কথা ভাববে। ছাড়িয়ে ছুড়িয়ে, ব্লিচ করে একসপোর্ট। বিদেশে কঙ্কালের ডিম্যাণ্ড জানো? সাংঘাতিক ভালো ব্যবসা। তারপর ধরো, মানুষটা জীবিত অবস্থায় ইংল্যাণ্ড, আমেরিকা, ভিয়েনা, ভেনেজুয়েলা যেতে পারল না। সেই দুঃখটা মিটলো। বিকাশ সামুইয়ের কঙ্কাল ভিয়েনায় ঝুলছে। কে বলতে পারে, হাড়ের খাঁচায় আত্মা-অদৃশ্য পাখী হয়ে উড়ে আসে কি না! আসতেও পারে। বিদেশে ওই লোহালক্কড় আর কিছু জামা কাপড় ছাড়া, আমাদের সব জিনিসই তো, সাব স্ট্যাণ্ডার্ড। ভেজালে ভর্তি। কঙ্কালে তো আর ভেজাল চলবে না। তুমি বুক ঠেলে ঠুকে বলতে পারবে, একসপোর্টার অফ পিওর, জেনুইন কঙ্কাল।'

'তুমি সিরিয়াসলি বলছ?'

'কঠিন সত্য সিরিয়াসলি বললেও ব্যঙ্গের মতো শোনায়। তুমিও জানো, আমিও জানি পৃথিবীটা সত্যই কি? ক্ষিতি, অপ, মরুৎ, তেজ, ব্যোম। আর্থ, ফায়ার, ওয়াটার। মাটি থেকে উঠে মাটিতে ফিরে যাওয়া। চিতায় চাপবো, চড়বড় করে পুড়ে যাবো। দেয়ালের দিকে তাকাও, ছবিটা নজরে পড়ছে।'

'হ্যাঁ। বাবা আর মা।'

'দুজনে দুজনকে ভীষণ ভালোবাসতেন। অন্তত আমরা তাই মনে করতুম। আত্মীয়-স্বজনরা বলতেন, আহা। সাক্ষাৎ হরগৌরী। মা মারা গেলেন। বছর না ঘুরতেই আমার মাসী মা হয়ে এলেন। বোঝো ব্যাপার। সে আবার কি রকম মা, যাঁর সংসার ভালো লাগে না। দশটা বাজতে না বাজতেই সেজেগুজে বেরিয়ে পড়েন। কয়েক শো বন্ধুবান্ধব। আজ এর বাড়ি কাল ওর বাড়ি। পরশু সিনেমা। দ্বিতীয় পক্ষের বউ। 'বাবা মিউমিউ করে বলেন, মানু সংসারটা এবার ধরো। মাসি বলেন, ধুর সংসার আমার ভালো লাগে না! এই তো জীবন! আজ আছি কাল নেই। ফুর্তি করে যাই। আসলে মায়ের পাশাপাশি বাবা মাসির সঙ্গেও একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বজায় রেখেছিলেন। সেই সময়ে আদর দিয়ে দিয়ে একটি বাঁদরী তৈরি করেছিলেন। তাকে আর সামলাবেন কি করে? আমার হাফব্রাদার ঝিয়ের কোলে মানুষ। আমাদের ছেলেবেলাটা মাসীর ড্রেস দেখেই কেটে গেল। মাঝে মাঝে আমার দিকে তাকিয়ে বলতেন, কিরে ছেলেটা! কি দেখছিস! আমার বাবা যখন মারা যাচ্ছেন, তিনি তখন কাঠমাণ্ডুতে কেরামতি করতে গেছেন। ফিরে এসে বললেন, মরার আর সময় পেলে না। মন্তব্যটাকে আপ্রাণ চেষ্টা করে আমরা ভুলে গেলুম। ভাবলুম, শোকে মানুষের মাথার ঠিক থাকে না তো! বেড়ালের পায়খানা করা দেখেছ? নরম ভুসভুসে মাটিতে করে, তারপর চাপা দিয়ে দেয়। জীবনের নোংরা সত্যকে আমরা সেইভাবে চাপা দিয়ে দি। তারপর বাগান করার সময় মাটি খুঁড়তে গিয়ে হঠাৎ হাতে লেগে যায়। ঘেন্না ঠেকাই এইভাবে, ভালো সার। গাছ ভালো হবে। তারপর সেই মাসি আমার বাবার বন্ধু সরোজবাবুর ঘাড়ে গিয়ে চাপলেন। রাধাবাজারে সরোজবাবুর ঘড়ির দোকান ছিল। মহিলার স্বভাব তিনি ভালোই জানতেন, তবু সামলাতে পারলেন না নিজেকে। সংসার ভাসিয়ে ভেসে পড়লেন। যিনি সময়ের ব্যবসা করতেন, তিনি নিজের সময় বুঝতে পারলেন না। মানসিক চাপে সেরিব্র্যাল অ্যাটাকিংয়ে ছ মাস বিছানায় পড়ে থেকে বিদায় নিলেন। তাঁর সাধের মানু একজন নার্সের হাতে তাঁকে তুলে দিয়ে যথারীতি নেচে বেড়ালেন।

এইবার আমি তোমার কথায় আসি। তুমি দিনকতক আমার বন্ধু শৈবালের সঙ্গে বেশ বাড়াবাড়ি করেছিলে। মনে আছে?'

শ্যামলীর মুখটা বেশ করুণ দেখাল। আমি ইচ্ছে করেই একটু ধাক্কা মারলুম। আজ আমার সুযোগ এসেছে। আমি অবশ্য খুব সাবধানে প্রতিভার কথাটা চেপে গেলুম। আমার এই ব্যক্তিগত কাদা খোঁচাতে গিয়ে, হঠাৎ একটা সত্য পেয়ে গেলুম। ল্যাক অফ ইনটেলিজেনস মানুষকে যেমন অসহায় করে, দুর্বল করে, স্টেটের ক্ষেত্রেও ইনটেলিজেনস ল্যাপস সাঙ্ঘাতিক একটা উইকনেস। উইকপয়েন্ট। শ্যামলী যদি প্রতিভার ব্যাপারটা জানত, সহজেই আমাকে ব্ল্যাকমেল করতে পারত। আমি অমন আপারহ্যান্ড নিতে পারতুম না। আমার ক্যাবিনেটে একটা দপ্তর রাখব, উইকনেস ডিপার্টমেন্ট। ফুল ফ্লেজেড একজন মন্ত্রী থাকবে, উইকনেস মন্ত্রী। তার কাজ হবে আমাদের দুর্বলতা খোঁজা। দুর্বলতা হল নাইলন কর্ড। হোলি অ্যালায়েনস টেঁকে না। ধর্মের কথা যত মত তত পথ। আনহোলি অ্যালায়েনস স্থায়ী হবে। হালফিল কেন্দ্রে কি হয়ে গেল। ভালো মানুষের ছেলেরা সৎ সরকার গড়তে চেয়ে কি কেলেঙ্কারি! কোথা থেকে এক বফর্স এসে ঢুকলো। কার যেন সুইশ ব্যাঙ্কে টাকা বেরোল। কে নিয়ে এল জার্মান সাবমেরিন। সব তালগোল পাকিয়ে গেল। এ বলে আমি সৎ, ও বলে আমি আরও সৎ। সতে সতে বুদ্ধির লড়াই। কাদা ছোঁড়া-ছুঁড়ি। পদত্যাগ। বহিষ্কার। দপ্তর বদল। আমি একজন প্রলোভন মন্ত্রী নিয়োগ করবো। সেই দপ্তরের কাজ হবে সৎকে প্রলোভনের মডার্ন টেকনিক দিয়ে অসৎ করে তোলা। সতের অহঙ্কার সাঙ্ঘাতিক অহঙ্কার। পাগলামি। আই অ্যাম অনেস্ট বলে ঠোঁট ফুলিয়ে, মুখ ভেটকে বসে রইল। যত সব কুসংস্কার। সোনার যেমন পাথরবাটি হয় না, মানুষের সংগঠনও তেমনি সৎ হতে পারে না। একজন মানুষ অতি কষ্টে হর্তুকি ত্রিফলা খেয়ে, চোখে গ্লুকোমা ধরিয়ে, সর্ব অঙ্গে বাত লাগিয়ে বাবা রে মা রে করে এক ধরনের জড়দ্গব সৎ হতে পারে। একসঙ্গে একশোটা মানুষের একটা দল সৎ হতে পারে না। তাই যদি হবে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের এ অবস্থা হবে কেন? শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খোলনলচে খুলে পড়ে যাবে কেন? 'হেলদি' মানুষ মাত্রেই এদিকসেদিক করবে। কোনও নিস্তার নেই। ইতিহাসের ও মাথায় তারকেশ্বরের মোহন্ত। এলোকেশীকে কোলে নিয়ে বসে আছেন। এ মাথায় রজনীশ।

হোঁদকা দুজন বডিগার্ড পাঠিয়েছে। আজকাল এই এক জ্বালা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বুকে স্টিলপ্লেট বেঁধে ট্যাঙা হয়ে ঘুরছেন। হাত দুটো বগলের পাশে টাঁশ হয়ে পড়ে না। চেতিয়ে থাকে। কোটের হাতা দুটো ট্যাঙটেঙি লাগে। 'হাম হিন্দুস্তানি' বলে বুকে ঘুষি মারার উপায় নেই। জেনুইন বুকের শব্দ বেরোবে না। কৃত্রিম ক্যানেস্তারা পেটা শব্দ বেরোবে। টেলিস্কোপিক রাইফেল দিয়ে কেনেডিকে মেরেছিল। সেই থেকে রেওয়াজ হয়ে গেছে, কিছু শিকারীর; যাই একটা প্রধানমন্ত্রী মেরে আসি। ভারতে গণ্ডা গণ্ডা মুখ্যমন্ত্রী। রোজ একটা করে মারা যায়। মারে না, কে আর ছুঁচো মেরে হাত গন্ধ করতে চায়? তবু রেওয়াজ হয়েছে, দুজন রক্ষী থাকবে। রক্ষীরা যে কত বাঁচাতে পারে, তা সে তো দেখা গেছে। সেই শ্রীলঙ্কায় প্রধানমন্ত্রীর ঘাড়ে বন্দুকের কুঁদো লড়িয়ে দিলে। যে মেরেছিল তার হাত ফসকে বন্দুকটা পড়ে না গেলে কি হত? আনোয়ার সাদাতের কি হল!

রক্ষী দুজন রকে বসে আছে। জানালা দিয়ে আমার ঝকঝকে গাড়িটা দেখতে পাচ্ছি। একটু পরেই আমাকে বেরতে হবে। মুখ্যমন্ত্রী হবার পর আমার জীবনের রুটিন একদম পালটে গেছে। সে আমি আর নেই। যোগ ব্যায়াম ধরতে হয়েছে। সেইটাই নিয়ম। এ দেশের বড় বড় লোক যোগ ব্যায়াম করেন ও দেশের বড় বড় লোক করেন জগিং। আমি জগিংই করব ভেবেছিলাম। সদ্য বিলেত ফেরত এক্সপার্ট বললেন, "জগিং তো এ শহরে চলবে না। এয়ার পলিউশান লেভেল এত হাই, এখুনি লাং ক্যান্সার ধরে যাবে। ইওরোপ হলে 'সেফলি' জগিং করতে পারতেন। কলকাতাটাকে তো আপনারা 'প্যারাডাইস লস্ট' করে ফেলেছেন। নরককুণ্ড।"

'আপনারা বলবেন না। আমরা কিছু করিনি। করেছেন যাঁরা চলে গেলেন তাঁরা। আমরা তো জাস্ট এলুম। এইবার করা শুরু হবে।'

এয়ার কণ্ডিশানড মার্কেট থেকে আমার যোগ ব্যায়ামের জাপানী পোশাক এসে গেছে। বিলেত ফেরত একজন ডাক্তারবাবু আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করেছেন। থরো চেকআপ। প্রেসার, পালস, হার্টবিট। সুগার, ব্লাড কোলেসট্রাল পরীক্ষা হয়ে গেছে। নর্মাল। এই চেকআপটা আমাকে মাঝেমাঝেই করাতে হবে। কোনও উপায় নেই। আমি তো আর সাধারণ মানুষ নই। এত বড় একটা স্টেটের মুখ্যমন্ত্রী। আমি এখন সব ব্যাপারেই এক নম্বর। এক নম্বর রোগ। এক নম্বর রোগী। আমার ডায়েট চার্ট তৈরি। চার্ট মিলিয়ে খেতে হবে। ভোর ছটায় একগেলাস লেবুর রস। সামান্য ওয়ার্কিং। আসন। বাথরুমে

বাথটাব গীজার এসে গেছে। এক টাব জল ভর্তি করে বাথ সল্ট ছেড়ে শুয়ে পড়ে খানিক খলর বলর। তারপর বাথরোব পরে পোর্টিকোয় বসে অল্প একটু দেশের চিন্তা। দেশই তো ঈশ্বর। তৎপরে ব্রেকফাস্ট। ডিম খাবো। রুটি খাবো। জ্যাম জেলি খাবো। ফল খাবো। চায়ের লিকার খাবো চিনি ছাড়া। তারপর ভিটামিন ক্যাপসুল একটা। ভিটামিনের কনসাইনমেন্ট এসেছে লন্ডন থেকে। দিশি ভিটামিনে ভিটামিন নাও থাকতে পারে। গুঁড়ো হলুদ। এ দেশের ওষুধে ওষুধ থাকবে এমন দেশ শাসন আমরা করি না। আমাদের পূর্বতন শাসকরাএকটা জিনিস শিখিয়েগেছেন সবকিছুরমধ্যে একটা'সারপ্রাইজ ফ্যাক্টর' রাখবে। কি আছে ! বাঘ আছে না ভালুক আছে ! ভুত আছে না প্রেত আছে। পেটে গেলে মরবে না বাঁচবে। তারপর কি হয় ! এই আছি। এরপর কি হয়। বোম মারে না ছুরি। মাল বোঝাই লরি ঘাড়ে চড়ে, না মিনি !'

ব্রেকফাস্টের পর রাইটার্সে গিয়ে রাজ চিন্তা। এগারোটায় এক কাপ ব্ল্যাক কফি। দেড়টায় লাঞ্চ। স্যুপ। চার চামচে দেরাদুন রাইস। প্লেন্টি অফ ভেজিটেবলস। বেকড ফিস। একটা মিস্টি। পনের মিনিট হালকা ঘুম। একটা ডানহিল সিগারেট। বেশ পরিবর্তন। দিনে চারবার বেশ পরিবর্তন। সাইকোলজিক্যাল ফ্যাক্টার। পরিধেয়র সঙ্গে মনের যোগ। রাইটার্স। মিটিং। ফাইল ধরে টানাটানি। ছটায় মিট দ্যা প্রেস। কর্মময় একটি দিনের অবসান। আটটার সময় মেপে মেপে ঠিক তিন পেগ স্কচ হুইস্কি। তারপর একটা মুরগীর ঠ্যাং। বেক করা। দুটো ফুলকো রুটি। একটা পুডিং। মানে যৎসামান্য ক্ষুন্নিবৃত্তি।

আমি আমার পার্সোনাল ফিজিসিয়ানকে বলেছিলুম,'মশাই তিনটে মধ্যবিত্ত বাঙালি ব্যায়রাম আমি ঘৃণা করি, কোনও বড় মানুষের যা কখনও হয় না, পেটের অসুখ, সর্দিজ্বর আর কথায় কথায় মাথাধরা।'

ডাক্তার বললেন, 'ধরেছেন ঠিক। কেরানী আর মাস্টারদের হয়। ডিফেকটিভ ইটিং হ্যাবিটস। আপনি বেগড়া চালের ভাত পুঁইশাকের ঘ্যাট, পোস্ত, বাড়ির চালে যেসব আনাজপাতি হয় যেমন লাউ কুমড়ো ছোঁবেন না। ঢ্যাঁড়স ঝিঙে চিচিঙ্গে এসব জনগণের দিকে ঠেলে দিন। স্রেফ প্রোটিনের ওপর থাকুন, আর দুতিন পেগ বিলিতি চালুন, দেখবেন কনস্টিটিউশান চেঞ্জ করে গেছে। আর আপনার তো কোনও টেনসান নেই।'

'টেনসান নেই ! বলেন কি ? এত বড় একটা দেশ, তার এই মিলিয়ানস

অফ প্রোবলেম।'

'ও সব বলবেন। মুখে একশোবার কেন, হাজারবার বলবেন, কিন্তু ভুলেও মনে বাসা বাঁধতে দেবেন না। সেই রবীন্দ্রসংগীতটাকে একটু এদিক সেদিক করে করে গাইবেন; হবার যাহা হবে তাহা। মরার যাহা মরে। দুটো জিনিস আপ্তবাক্য নিজে মনে রাখবেন, সভাসমিতিতে প্রত্যেকের মনে গেঁথে দেবার চেষ্টা করবেন। ডেভালপিং কাণ্ট্রি। চল্লিশ বছর ধরে ডেভালপিং। চারশো বছর পরেও ডেভালপিং। কাণ্ট্রি হলো কাণ্ট্রিলিকার, হাজার চেষ্টা করলেও স্কচ হুইস্কি হবে না। দুনম্বর হল সেণ্টার। স্টেট থাকলেই সেণ্টার থাকবে। সেণ্টারের বিমাতাসুলভ ব্যবহার। সাতখুন মাপ। আপনার আবার টেনশান কিসের। চাবুক মারার মতো দুটো ঘোড়া সবসময় রেডি। আর সবশেষে সুইট ডিশের মতো মিস্টি হেসে পরিবেশন করবেন, বন্ধুগণ, প্রবলেম ইজ লাইফ। এই করে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আপনার পূর্ববর্তীরা তো বেশ ভালই চালিয়ে গেলেন।

সব পার্টিরই একটা পার্টি-অফিস থাকে। প্রেসিডেণ্ট থাকে। চেয়ারম্যান থাকে। আমাদের তো আগে কোনও অর্গানাইজেশানই ছিল না। অন্তত আমার ছিল না। আমি হলুম গিয়ে রাজনৈতিক জেলে। খ্যাপলা জাল ফেলে পার্টিভাঙা এক একটা চেলাকে ধরেছি। রামপ্রসাদ বেঁচে থাকলে আমাকে দেখেই লিখতেন জাল ফেলে জেলে বসে আছে জলে। বড় বড় পার্টি সব ভাঙতে ভাঙতে টুকরো হতে হতে পার্টি আর নেই মিছরির চাক নয় চিনির দানা। ইলেকশান জেতার পর টাইম পত্রিকার একজন সাংবাদিক কথাপ্রসঙ্গে বলেছিলেন ভারতে এখন যা অবস্থা একটা লোক একটা পার্টি। ভদ্রলোক বয়সে প্রবীণ। ইতিহাস বেশ জানেন। অতুল্য ঘোষ, কংগ্রেসের ভাঙন থেকে রাজীবের অ্যাম্‌প্যুটেশান পর্যন্ত গড় গড় বলে গেলেন। ধরলেন জনসঙ্ঘকে। চলে এলেন কম্যুনিস্ট পার্টি অফ ইণ্ডিয়ায়। ভাঙছে, শুধু ভাঙছে।

টাইমের সাংবাদিক। বেশ সমীহ হচ্ছিল। টাইমে যদি ছোট্ট করে যেকোনও জায়গায় ভদ্রলোক আমাকে একটু স্থান করে দেন। পত্রপত্রিকার শেষকথা না কি এই টাইম ম্যাগাজিন! আমি শুনেছি। ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, আমেরিকান অ্যাকসেণ্টে 'হোয়াট ইঁজ দ্যা নেঁ অঁ ইওর প্যার্টি ?'

সবকটা শব্দ একসঙ্গে জড়িয়েমড়িয়ে এমন করে বললেন, প্রথমে ধরতে পারিনি। শেষে বুঝলাম প্রশনটা হোলো তোমার পার্টির নাম কি ? আমি ঝপ্ করে বললুম 'ছত্রভঙ্গ পার্টি অফ ইণ্ডিয়া।'

'ওয়াট। ছাত্রভ্যাঙ্গ। ওয়াটস দ্যাট ?'

সায়েব তুমি ছাতা নিশ্চয় দেখেছ ? আমব্রেলা। সিকটিক লাগানো। একসময় বিরাট একটা পার্টির বিশাল ছাতা ভারতের মাথার ওপর ধরা ছিল। তার তলায় সব নৃত্য করতেন। সেই ছাতাটা গেছে ফেঁসে। ফর্দাফাই। সিকফিক খুলে ছত্রাকার। এরই নাম ছত্রভঙ্গ। পুরনো সব দলই প্রায় ছত্রভঙ্গ। সেই সব সিক ধরে এনে আমার এই পার্টির ছাতা, দেশের মাথায় নয় নিজেদের মাথায় ধরেছি। যে কোনও দিন খুলে যাবে। সেই সম্ভাবনার কথা ভেবেই নাম রেখেছি, 'ছত্রভঙ্গ পার্টি অফ ইণ্ডিয়া'। আমাদের দেশের সবকিছুরই শেষ পরিণতি ছত্রভঙ্গ।

সায়েব শুনে মহাখুশি। এইটুকু একটা ক্যামেরা বের করে ফিচিক ফিচিক করে খান কতক ছবি তুলে নিলেন। অপেক্ষায় আছি, কবে টাইম ম্যাগাজিনে আমার ছবি বেরোয়। সায়েবদের আবার বিশ্বাস নেই। তাদের চোখে ভারতবর্ষ! ছত্রভঙ্গ পার্টির একটা অফিস হয়েছে, বড়বাজার ব্যবসায়ী সমিতির কৃপায়। বড় বিজনেস হাউসের কৃপা আমরা এখনও পাইনি। পেয়ে যাবো। টাউটরা ঘোরা ফেরা করছে। পলিটিকস আর প্রোসটিটিউশান আমরা এক করে ফেলব। সে প্ল্যান আমাদের আছে।

আজ আমাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মিটিং। দপ্তর বণ্টন করা হবে। সবচেয়ে বড় লাঠালাঠির ব্যাপার। একটি পানীয় জল কোম্পানী গাড়ি বোঝাই বোতল পাঠিয়ে দিয়েছে। সিঁড়ির বাঁপাশে বিশাল এক আইস বকস। জলের বোতল ঠাণ্ডা হচ্ছে। লাল, সাদা, হলদে। ঢোকার দরজার মাথার ওপর পাতিলেবু আর শুকনো লঙ্কার মালা ঝুলছে। দরজার দুটো পাল্লায় সদ্য আঁকা স্বস্তিকা চিহ্ন দগদগ করছে। বড় বড় করে লেখা, শুভলাভ। বড়বাজারের ম্যানেজমেণ্ট। এ যেন পানমশলার দোকানের উদ্বোধন অনুষ্ঠান। টেস্টে না

মিললেও সহ্য করতে হবে। সেই বলেছে না পলিটিকস মেক স্ট্রেঞ্জ বেড ফেলোজ। ওরা আপাতত মাসলম্যান সাপ্লাই করবে। টাকা পয়সা দেবে। পেপার পাবলিসিটিতে সাহায্য করবে। দুখানা মারুতি, একটা জিপ দিয়েছে নিসান কোম্পানীর। আবার কি! দুধ দিলে চাঁট সহ্য করতে হবেই বাবা। আমার আগে যাঁরা দেশসেবা করে গেছেন তাঁরা কি করেছেন বাবা! কার সেবা? ও সবাই জানে। সদ্যোজাত শিশুটি পর্যন্ত জানে। সেবা মানে গণেশ সেবা। সর্বহারার পার্টি হয়, সর্বহারা পার্টি হয় না। আমি গান্ধীবাদকে সামান্য একটু টুইস্ট করে নিয়েছি। সেটা হল বিগ হাউসের সেবার চেয়ে স্মল হাউসই ভালো। স্মলের চাহিদা স্মল। বিগের চাহিদা বিগ। বিগ টেকস্টাইল মিল এক কোটি টাকার লাইসেন্স চাইবে। স্মল চাইবে দশ লাখ টাকার জিংক কি লেড। স্পেয়ার পার্টস।

মিস্টার বুবনা আজ সিল্ক টেরিনের পাঞ্জাবি পরেছেন। পায়ে সাদা মোজা কালো বুট। ভুঁড়িটা ঠেলে উঠেছে। পাঞ্জাবির আবরণে মনে হচ্ছে স্টেনলেস স্টিলের ভুঁড়ি। ভদ্রলোক বড় বিনীত। সফল ব্যবসায়ীরা ওই রকমই হয়। হাত জোড় করে বললেন, 'সোব বোবোস্থা কোরে রোখিয়েছে ভী। বিলকুল ঠিক। কোনফারেনস টেবুলে পান ভি আছে, পান মোশালা ভি আছে।

'থ্যাঙ্ক ইউ থ্যাঙ্ক ইউ মিস্টার বুবনা।'

লোকটির নাম রামঅওতার বুবনা। বুবনারা দুভাই। রাজস্থান থেকে লোটাকম্বল নিয়ে এসেছিল। বড়বাজারে প্রথমে শুরু করে কাটা কাপড়ের বিজনেস। ডজন দরে কাটা কাপড় বিক্রি করত, কিনত মুরারীপুকুরের মেয়েরা। তারা জামাপ্যান্ট তৈরি করে বেচত হরিসার হাটে। সেই রকম এক মেয়ের সঙ্গে বুবনার প্রেম হল। বাঙলার বায়ু, বাঙলার জল। বুবনাও প্রেমে পড়ল। বিয়ে হল। মিসেস বুবনা পয়া মেয়ে। ঠমক ঠামক দেখলে এখনও মাথা ঘুরে যায়। তা না হলে রাজস্থানী কৈলাশকে বগলদাবা করতে পারে। আজ এখানে অস্থায়ী একটা কিচেন হয়েছে সম্মানিত আমাদের খাওয়াবার জন্যে। শ্রীমতী বুবনা সিল্কের শাড়ি পরে তদারকি করছেন। হাফকাট শ্যাম্পু করা চুল ফর্সা তেলা পিঠের উন্মুক্ত অংশে ঝোলাঝুলি করছে। সিল্কের কাঁধ কাটা ব্লাউজ। আমি আর বলতে পারছি না। মুখ্যমন্ত্রীর উচিত নয়, পরস্ত্রীর রূপ বর্ণনা করার। কাটা কাপড়ের বুবনা আজ মাল্টি মিলিঅনিয়ার। সত্যনারায়ণ পার্কটা কিনতে চেয়েছিল। একটুর জন্যে ফসকে গেছে। এখন ইচ্ছে হয়েছে এসপ্লেনেডটা

কিনবে। কিনবে মানে, একটা কায়দাটায়দা করে দখল করে নেবে। গাড়ির জন্যে এক চিলতে রাস্তা রেখে দুটো পাশ ফেরিঅলাদের দাদন দিয়ে দেবে। বাজার বসাবে। ফল আনাজপাতি রাজস্থানী চুড়ি শাড়ি। তৈরি জামাকাপড়, চপ্পল, ফুচকা, ভেলপুরি। এসপ্লানেড অঞ্চলের ফুটপাত এতকাল আমার পূর্ববর্তী মন্ত্রিসভার এক শরিক দলের মৌরসি পাট্টায় ছিল। বুবনা বলছে, দ্যাট ইজ নো বিজনেস। ওতে লাভ কমে যাচ্ছে। থার্ড পার্টি মুফতে টাকা মেরে বেরিয়ে যাচ্ছে। ও বলছে. কলকাতাকে সেল করতেই হবে, আর আমরাই কিনবো। ইংরেজ চলে যাবার পর আমরাই সায়েব। সেল যখন করতেই হবে. ভালো ভাবে করো। লোকটা আবার একটু অশ্লীল মতো আছে। ওই রেডিমেড মেয়েটার ইনফ্লুয়েন্স। বলে কি, সঙ্গম যখন করবে নির্ভাবনায় করো, পয়সার কথা ভেবো না। ব্যাটা! হারামজাদা। না না, বলতেই পারে। ইণ্টেলেকচ্যুয়াল বাঙালী বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেস্কের ওপর তবলা বাজাচ্ছে। সল্টলেকে জমি কিনেছিল লটারি করে। সে জমিও বেহাত। ব্যাট না ধরেই ক্রিকেটার, বলে পা না ঠেকিয়েই ফুটবলার, তুলি না ধরেই পেণ্টার,কলম না ধরেই সাহিত্যিক। যেমন আমি, ত্যাগ না করে, দেশসেবা না করেই মুখ্যমন্ত্রী। আমার শিক্ষকরা বলতেন, ছেলেটা বলিয়ে কইয়ে আছে, ওকে আটকাবে কে! এ পারে পুতে দিলে, ওপারে গাছ বেরোবে। বইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নেই স্রেফ মনের জোরে পরীক্ষার পর পরীক্ষা কাঁচকলা দেখিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে। ছোকরার এলেম আছে। বুবনা বলে, গরু আমাদের দুনম্বর ব্যবসা, আর তোমাদের দুনম্বর জ্ঞান, মাইরি বলছি, ভারতকে কোন শালা ঠেকায়! আসল টেঁকশালটাই একদিন নিলাম হয়ে যাবে। প্রায় হয়েই এসেছে। বাজারে নতুন নোট দেখতে পাও। খুচরোর কি টান!

শ্রীমতী বুবনা এগিয়ে এসে আমার হাত দুটো ধরে আপ্যায়ন করে সভাকক্ষে নিয়ে গেলেন। এ যেন মনে হচ্ছে বুবনার মেয়ের বিয়ে! শ্রীমতীর গা দিয়ে বিলিতি চাঁপা ফুলের গন্ধ বেরোচ্ছে। ফলের রস খেয়ে শরীরটাকে কেমন রেখেছে! ফল খাঁটি দুধ আর ঘি। মেছোবাজারের রমরমাতো এদের জন্যেই। বাঙালির ফল হল মালদার দামড়া ফজলি আর বারুইপুরের পেয়ারা, কারবাইডে পাকানো। খাও আর যাও।

আমার আসতে একটু দেরি হয়েছে। আমার বউ লাস্ট মোমেণ্টে এক জ্যোতিষী ডেকে এনেছিলেন। আমি আবার ওসব মানিটানি না। তা বললে, এত বড়

মোগল সম্রাট আকবরেও না কি জ্যোতিষী ছিল। স্টেট অ্যাস্ট্রোলজার। সেই জ্যোতিষীর জন্যে দেরি হয়ে গেল। তিনি ধরে রাখলেন। চেপে বসিয়ে রাখলেন। বারোটা পনেরর আগে বেরনো যাবে না। এই মন্ত্রিত্বে আমার কোন লোভ নেই। তবে ওই। পাঁচটা বছর টিকে থাকতে পারলে মন্দটা কি? কিছু তো একটা হবে। একেবারেই ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো তো নয়।

ঘরে ঢুকে চেয়ারে বসতে বসতে দেখি এক পশলা সব হয়ে গেছে। কোল্ড ড্রিংকসের খালি বোতল টেবিলে। কারুর কারুর মুখে পান। ভালো। পরের পয়সায় এই তো সবে শুরু। এখনও কত রাত পড়ে আছে। শ্রীমতী বুবনা আমার পাশের চেয়ারে বসলেন। ব্যাপারটা ধরতে পারছি না। শ্রীমতী কি আমার প্রাইভেট সেক্রেটারী হবেন? হলে আমার আপত্তি নেই। স্টেট বিজনেসের বিরক্তিকর একঘেঁয়েমি খানিকটা কমবে।

'আচ্ছা শুরু করা যাক।'

মিস্টার বুবনা, মুখে তার দুখিলি পান। দরজার কাছ থেকে বললে, 'আরে ভাই জাতীয় সংগীত দিয়ে শুরু করো।'

বলেছে ভালো। উঠে দাঁড়িয়ে আমরা সবে শুরু করতে যাচ্ছি, জনগণমন, বুবনা বললে, 'নো নো। আমাদের সংগীত থোড়া ডিফারেণ্ট আছে।' টেবিলের ও মাথায় ভুঁড়ি ফুলিয়ে দাঁড়াল, তারপর হেঁড়ে গলায় ধরল,

রঘুপতি রাঘব রাজারাম
বিপন্ন বাঙালি চাইছে আরাম
ঈশ্বর আল্লা তেরো নাম
গালটাল পরে পাবে আগে ফেলো দাম।

আমার কলিগরা দেখলুম বেশ খুশি হয়েছে। অনেকেই বুবনার প্রতিভার প্রশংসা করলে। বেশ যুগোপযোগী। বাস্তব মানে আছে। একজন বললে, আজকাল ক্যাসেটে যেসব হাসির গান বেরোয় এ তার চেয়ে শতগুণে ভালো।

সভা আমার হাতের বাইরে চলে যাচ্ছে। আমি একটা খালি বোতল টেবিলে ঠুকে বললুম 'অর্ডার, অর্ডার। কাম টু বিজনেস।' শ্রীমতী বুবনাকে বললুম, আপনি আমাদের প্রোসিডিংসের একটা নোট নিন।'

তিনি বললেন, 'নোট খুচরোর দরকার নেই। সামনেই যন্ত্র বসিয়ে রেখেছি। লেটেস্ট। জাপানি রেকর্ডার, শার্প সিকস চ্যানেল। ফিল্টার লাগানো।'

আমার এক সময় এই সব জিনিসের খুব ঝোঁক ছিল। ইচ্ছে করছিল হাত

•দিয়ে নেড়েচেড়ে দেখি একটু খবরাখবর নি। মুখ্যমন্ত্রী হয়ে মুশকিলে পড়ে গেছি। একেই তো তেমন অভিজ্ঞতা নেই বলে পাঁচজনে পাঁচ কথা বলছে। আমার পূর্বতন মুখ্যমন্ত্রীদের কেউই ফেলনা ছিলেন না। গদি থেকে ফেলেও দিলে চিকেন লেগস, বসিয়ে দিলেও চিকেন লেগস, ক্যাডিলাক। আভিজাত্য বাড়াবার কোনও রাস্তা নেই। ডিগ্রি বাড়ানো যায়, ব্যাংক ব্যালেন্স বাড়ানো যায়। নীল রক্ত কোথায় পাওয়া যায়। হায় পিতা।

বুবনা বললে, 'আপনি প্রথমে একটু কিছু বলুন।'

'বলবো, ? বেশ বলছি। কমরেডস!

'হলো না বাবুজী! কমরেডস নয়। ওরিজিনাল কিছু ছাড়ুন।'

'গবেটস!'

'হাঁ সো বাত ঠিক আছে।'

'গবেটস, মন্ত্রিসভা কেউ বড় করে' কেউ ছোট করে।,

এইটুকু বলতে পেরেছি। বাইরে দুমদাম বুমবাম বোমার শব্দ। নিশ্চয় আমার মুখে ভয়ের ছাপ পড়েছিল। বুবনা বললে,

'ঘাবড়াবেন না। আমার অ্যারেঞ্জমেন্ট। যে পুজোর যা নিয়ম। বোমা ছাড়া পলিটিকস হয় না। তাই আমার ছেলেরা ফাটিয়ে গেল। আপনি বলুন।'

পিলে চমকে গিয়েছিল। আমি শুরু করলুম,

'গবেটস, মন্ত্রিসভা ছোট হবে না বড় হবে তা নির্ভর করছে, কাজকে আমরা কতভাগে ভাগ করছি তার ওপর। আমি কাল বসে বসে একটা লিস্ট করেছি। পড়ছি। কারুর কিছু মন্তব্য থাকলে বলবেন। টেপে টেপ হয়ে যাবে। প্রথম হল, কৃষি। দেশে চাষবাস তো চাই ঃ তা না হলে তো দুর্ভিক্ষ হবে। তা যার জমি আছে সে চাষ করবে। করবেই করবে। বীজ কিনবে, সার কিনবে, ব্যাংক লোন দেবে। লোন দেওয়াই ব্যাংকের বিজনেস। তাহলে আমাদের ফোপরদালালি করার কি আছে! আমাদের খরা ঠেকাবারও ক্ষমতা নেই, বন্যা ঠেকাবারও ক্ষমতা নেই। আমাদের পূর্বতন মন্ত্রীরা বন্যার সময় হেলিকপটার চেপে আকাশপথে বন্যাঞ্চল ঘুরে চলে এসেছেন, আর শেষ পর্যন্ত সেনাবাহিনীকে ডেকে পাঠিয়েছেন। ওদিকে মানুষ চালে উঠে বসে আছে এদিকে শাসকদল আর বিরোধী দলে কাজিয়া বেঁধে গেছে। ক্ষমতাসীন দল ত্রাণ নিয়ে আর কাউকে এগোতে দিচ্ছে না। গেলেই কামড়াতে আসছে। মেরে লাশ ফেলে দিচ্ছে। মহাজ্ঞানী মহাজন যে পথে করে গমন কবিতাটা মনে আছে নিশ্চয়। স্বীয় কীর্তি ধ্বজা ধরি

আমরাও সেই পথে এগোবো আরও আটঘাট বেঁধে। বন্যা আর খরা আসে শাসকদলের বরাত ফেরাতে। এ এমন এক ওপন সিক্রেট যা সকলেই জানে। খরাত্রাণ আর বন্যাত্রাণের সেণ্ট পারসেণ্ট ক্রেডিট আমাদের নিতে হবে। তাহলে কৃষি নয় চাই ত্রাণবিরোধী দপ্তর। ত্রাণের কাজ আটকাবার জন্যে চাই ত্রাণ পুলিস। তাহলে কি দাঁড়াচ্ছে, পুলিস দপ্তরে আর একটি বিভাগ যুক্ত হল। সঙ্গে সঙ্গে এমপ্লয়মেণ্ট অপরচুনিটি বেড়ে গেল। আনএমপ্লয়মেণ্ট প্রবলেম সলভ করতে হবে তো। যারা চাকরি পাবে, তারা আমাদের ভোটার হবে।'

'ঘোড়ার ডিম হবে। ইতিহাস ভাল করে পড়ুন মুখ্যমন্ত্রী মহাশয়। কেন্দ্রীয় সেই রেলমন্ত্রীর কথা মনে পড়ে?'

'তিনি তো রিটার্নর্ড' হয়েছিলেন ভাই। ভোটাররা তো বেইমানি করেনি, বেইমানি করেছে তাঁর পার্টি।'

'কিন্তু পরের বার নির্বাচনে তাঁর নির্বাচন এলাকায় দল গোহারান হেরেছে।'

'সে ভাই খুব গোলমেলে ইতিহাস। আমরা আমাদের নির্বাচকদের অতটা অকৃতজ্ঞ নাই বা ভাবলুম। থিংক পজেটিভলি। থিংক পজেটিভলি।'

'আমার মনে হয় ভাবনামন্ত্রীর একটা পদ তৈরি করুন; যিনি আমাদের ভাবতে শেখাবেন।'

'আমি ডার্বি অ্যাডভাটাইজিং এজেনসিকে আসতে বলেছি। তাঁদের প্রতিনিধি কি এসেছেন।'

বলতে না বলতেই ঘরে ঢুকলেন মিস্টার সেনশর্মা, 'আসতে পারি?

'আসুন, আসুন। আপনি তো মশাই মোস্ট সট আফটার পার্সন।'

সেনশর্মা বসলেন। নিজের ক্ষেত্রে অত্যন্ত কৃতী পুরুষ। টাকে চুল গজাবার একটা লোশানের এমন ক্যামপেন করেছিলেন, টাকে যে চুল কস্মিনকালে গজাতে পারে না, তা জেনেও হাজার হাজার ক্রেতা সেই দামী হেয়ারটনিক কিনে, এক বছরের মধ্যে টনিক কোম্পানীকে লাল করে দিয়েছিলেন। সেই প্রতিষ্ঠান এখন মাঠে ঘাস গজাবার ওষুধ তৈরি করছেন। সেনশর্মার আর একটি কৃতিত্ব, বৃদ্ধকে যুবক করার একটা বাড়ি কয়েক কোটি টাকা বিক্রি করিয়ে দিয়েছিলেন স্রেফ প্রচারের জোরে। এখনও বাজারে সেই ওষুধের সাংঘাতিক রমরমা।

'গবেটস, মিট মিস্টার সেনশর্মা। ডার্বি অ্যাডভাটাইজিং এজেনসির ডিরেকটার।'

'মিস্টার সেনশর্মা আমাদের কী করবেন?'

'আমাদের এই লিমিটেড কোম্পানীকে পাবলিকের কাছে সেল করবেন।'

'আমাদের তো কোনও প্রোডাক্ট নেই।'

'কে বলেছে নেই। মানুষের অবস্থা ফেরাবার প্রতিশ্রুতিই হল আমাদের প্রোডাক্ট। সেনশর্মা একজন নামকরা মার্কেটিং অ্যাডভাইসার। আপনি আমাদের কিছু অ্যাডভাইস করুন।'

সেনশর্মার হাসিটি ভারি সুন্দর। 'ভেরি মাইডিয়ার'। এক চিলতে হাসি ছেড়ে তিনি বললেন, 'পুরনো একটা প্রবাদ আছে আপনারা শুনেছেন, সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়। এই টেকনিকটা আপনারা যত ভালভাবে কাজে লাগাতে পারবেন ততই আপনাদের সাকসেস। শিল্পে এই নীতিটা আপনাদের সাঙ্ঘাতিক পপুলার করবে! যে কটা শিল্প প্রতিষ্ঠান এখনও আছে, লেবার ক্ষেপিয়ে সব বন্ধ করে দিন এক ধার থেকে। তারপর শিল্প দপ্তরের মধ্যস্থতায় একে একে খুলতে আসুন। আবার বন্ধ করতে করতে চলে যান। আবার খুলতে খুলতে আসুন। আবার বন্ধ করতে করতে চলে যান।'

'বুঝেছি, বুঝেছি। কিন্তু শিল্পের বারোটা যে বেজে যাবে!'

'বারোটা তো বেজেই আছে। পাট গেছে। লোহা গেছে। ওষুধ গেছে। হোসিয়ারি গেছে। টেক্সটাইল গেছে। প্রেস গেছে। কেমিকেলস গেছে। প্ল্যান্ট অ্যান্ড মেশিনারি গেছে। আছেটা কি? শিল্প বলতে তো এখন মহারাষ্ট্র, গুজরাট, তামিলনাড়ু, উত্তরপ্রদেশ। বোকার মতো. পশ্চিমবাংলায় শিল্প করুন' বলে শিল্পপতিদের কাছে সচিত্র নিমন্ত্রণ-পত্র ছাড়বেন না। ঘাড়ে গুরুদায়িত্ব এসে যাবে। পাওয়ার দিতে হবে, র মেটিরিয়াল দিতে হবে, লেবার ফ্রন্টে শান্তি বজায় রাখতে হবে। ছোট মুখে বড় কথা হয়ে যায়, তবু স্বামী বিবেকানন্দ থেকে বলি. জীবন হল খেলা; কিন্তু হোয়েন প্লে বিকাম এ টাস্ক, তখনই বিপদ। আপনারা মাছের মতো খেলুন, শিল্পে খেলুন. কৃষিতে খেলুন, শিক্ষায় খেলুন, জনস্বাস্থ্যে খেলুন। আর একটা কাজ করতে পারবেন?'

'বলুন?'

'মোটামুটি আপনার চেহারা আছে, গলা আছে। কোনওরকমে উত্তমকুমার হতে পারবেন?'

'উত্তমকুমার?'

'আমাদের জীবনে টিভি আর ফিল্ম ছাড়া কিছু নেই। সিনেমার নায়ক পলিটিকসে এলে যত বড় দেশসেবকই হোক নির্বাচনে কাৎ। তাদের গ্ল্যামারের

কারুর দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। আপনারা তার প্রমাণ পেয়েছেন।'

'উত্তমকুমার হওয়া কি সহজ! সে প্রতিভা আমার নেই।'

'দক্ষিণ ভারতের পলিটিকসে দেখুন রুপোলি পর্দার নায়কদের কি দাপট! কেউ কেউ আবার গেরুয়া ধারণ করেছেন। প্রোডাক্টের সঙ্গে সঙ্গে প্যাকিংটাও তো দেখতে হবে। আজকাল দেখছেন তো, সামান্য ধূপকাটি, আগে বিক্রি হত তাগড়া বাণ্ডিল বেঁধে, এখন আটটা কি বড় জোর দশটা কাঠির প্যাকেট দেখলে মাথা ঘুরে যাবে। এখন মালের চেয়ে প্যাকিং বড়। কাজের চেয়ে ঘোষণা বড়। আপনাদের ঘোষণা কোথায়! বিজয় উৎসব, বিজয় মিছিল কোথায়?'

'ঘোষণা একটা করা যায়; কিন্তু কি ঘোষণা করবো?'

'অ্যায় দেখুন। আরে মশাই কত কি ঘোষণা করার আছে। মানুষকে আশা দিন, ভরসা দিন। টাকে চুল গজাবে বলেই না লাখ লাখ শিশি বিক্রি হয়েছিল! আপনার এই মন্ত্রিসভার সকলকে বলুন একটা করে আশার বাণী দিতে। এই পার্টি অফিসে একটা বাকশো বসান, সেই বাকসে প্রত্যেকে একটা করে আশার বাণী ফেলুন। মানুষের আশা। ফুটপাথের মানুষ থেকে রাজপ্রাসাদের মানুষ, সকলেই যেন ভরসা পায়। মা, মাসি, দাদা, দিদি, বেকার, সাকার সকলেই যেন দু হাত তুলে নাচতে থাকে। সেই বাণী সম্বলিত সুদৃশ্য হ্যাণ্ডআউট রঙিন, পাঁচ রঙে ছাপা, হাতে হাতে ঘুরবে। তার মধ্যে একটা বাণী থাকবে অশ্লীলতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম। অশ্লীলতা বললেই আমি অশ্লীল একটা ছবি ছাপতে পারবো, হ্যাণ্ড আউট নিয়ে তখন কাড়াকাড়ি পড়ে যাবে; কেউ আর না পড়ে ফেলে দিতে পারবে না। আর একটা বিজয় উৎসব করুন।'

বিজয় উৎসবে লোক হবে। আমাদের তো তেমন ইমেজ নেই।'

'আপনাদের ইমেজ না থাক, কিশোরকুমারের ইমেজ আছে, মিঠুন চক্রবর্তীর ইমেজ আছে, শ্রীদেবীর ইমেজ আছে।'

'তাঁদের ইমেজ আমরা ভাঙাবো কি করে?'

'খুব বলেটলে রাজি করিয়ে, বিজয় উৎসবকে যদি একটা স্টার নাইটের চেহারা দেওয়া যায়, ফাটাফাটি ব্যাপার হয়ে যাবে। মারদাঙ্গা। কত রকমের মডার্ন টেকনিক আছে রে ভাই। আমেরিকার কাছে আমাদের অনেক কিছু শেখার আছে। একটা বিজয় মিছিল করবেন তো! পথপরিক্রমা!'

'আমাদের ফলোয়ারস কোথায়! ক্যাডার কোথায়!'

'ফলোয়ারস তৈরী করতে হবে। মানুষ ফলো করে, না ফলো করে মানুষের

লোভ! আপনারা একজন সাইকোলজিস্টের সার্ভিস বুক করুন। আধুনিক মানুষের সাইকোলজি না জানলে রাজত্ব চালাবেন কি করে! দমন পীড়নে কাজ হবে না বক্তৃতাবাজিতে কিছুই হবে না। জৈনদের মতো খটমাল খিলাতে হবে। লোভের ছারপোকা বের করে আনুন মনের খাটিয়া থেকে তারপর একটু একটু খাওয়ান।'

'মিছিলটা তাহলে কি ভাবে হবে?'

'লটারি।'

'তার মানে?'

'মিছিল পথ পরিক্রমা করে ময়দানে মিলবে। সেখানে থাকবে, দেড় হাজার সাইকেল, সেলাইকল, হাতঘড়ি, রঙিন টিভি, জামাকাপড়, পাখা, রেডিও, টেপ-রেকর্ডার, যাবতীয় সব লোভনীয় জিনিস। লটারি হবে।'

'মিস্টার সেনশর্মা মারামারি হয়ে যাবে। রক্তগঙ্গা বয়ে যাবে।'

যায় যাবে। আরে মশাই, শেষমেশ তো এদেশে একটা গৃহযুদ্ধই হবে। সেইটার পথ এই পাঁচ বছরে তৈরী করে সরে পড়ুন।'

'কোথায় সরবো মশাই, এই এতোগুলো লোক।'

'কেন সুইজারল্যাণ্ডে। ওই একটাই তো দেশ আছে। পাতকী-তারণ। পাঁচ বছরে বেশ কিছু পাচার করে দিন। দেশসেবার কথা ভুলেও মাথায় আনবেন না। আপনারা হেলেন কেলারও নন, নার্স সিসিও নন যে জনে জনে সেবা করে বেড়াতে হবে। সুযোগ যখন এসেছে, বেশ করে নিজেদের সেবা করুন। টাকা পাচারের অনেক রাস্তা আছে ওই যে আমাদের ব্যবসায়ী বন্ধু রয়েছেন, ওই ভদ্রলোক সব বলে দেবেন।'

'তাহলে আপনি আমাদের একজন ম্যানেজমেণ্ট কনসালট্যাণ্ট ব্যবস্থা করে দিন।'

'হবে হবে। আগে মন্ত্রিসভার কাঠামোটা তৈরি করে ফেলুন।'

সেনশর্মা বিদায় নিলেন।

কাঞ্চন-গুপ্ত, ছাত্রজীবনে কবিতা লিখত। কাঞ্চনকে দেওয়া হল কৃষি। কৃষির সঙ্গে মন্ত্রিসভার যোগ কবিতার মতোই। সার আর কীটনাশক কোম্পানি বিবিধ ভারতীতে তো চাষীভাইদের কবিতাই শোনান। প্রথমে একটা ঢাক বাজে তারপর শুরু হয় তরজা কবিতা, শোনো শোনো চাষীভাই, মাজরা পোকা, ঝাজরা পোকা, ভেঁপু পোকায় ভাবিয়ে যায়। কৃষি দপ্তরকে তো বিশেষ কিছু করতে হবে না। চাষবাসে আলাদা'র পলিটিকস কাজ করবে। লাঠি, বল্লম, হেঁসো, বেরোবে। জোর যার ফসল তার। পর মধ্যে কোনও কবিতা নেই। ফসলে মাঠ ভরে যায় কবিতার মতো। ক্ষুধার মধ্যেও কবিতা। তা না হলে সুকান্ত কি লিখতেন, পূর্ণিমার চাঁদ যেন ঝলসানো রুটি।

গোবিন্দ জানা মাছের বাজারটা ভালো জানে। কলকাতার কোন বাজারে কেমন মাছ, ওর একেবারে নখদর্পণে। গোবিন্দই আমাকে মানিকতলার বাজার চিনিয়েছিল। অমন মাছের বাজার আর কলকাতায় দুটো নেই। মাছ খেতে ওর আপত্তি নেই। মাছের দপ্তরটা নিতেই ঘোরতর আপত্তি। 'আমি তোর ক্যাবিনেটের সকলের চেয়ে বেশি ভোটে জিতে এলুম, আমাকে দিলি মাছ। মাছে কি করার আছে?'

'বাঙালিকে শস্তায় র‍্যাণ্ডাম মাছ খাওয়াবি। আমাদের আসন পাকা হয়ে যাবে।'

'বিধান রায় থেকে ভক্তিভূষণ মণ্ডল কেউ পেরেছেন বাঙালীকে পাঁচ টাকা কিলো কাটা পোনা খাওয়াতে? ভেড়ি পলিটিকস তুই জানিস না। রোজ রাতে লাশ পড়ে যাচ্ছে। মাছ খেলছে জলে। মানুষ খেলছে ডাঙ্গায়।'

'ভেড়ির মাছ খাওয়াবি কেন? আমাদের আগের আগের মিনিস্ট্রির হাতে আমেরিকা থেকে ফ্রোজন মাছ আনাবার একটা পরিকল্পনা ছিল। টিন খুলে প্লেটে এখানকার রুম টেম্পারেচারে রাখলে কিছুক্ষণের মধ্যেই মাছ আবার নড়েচড়ে উঠবে। দপ্তরে বসে সেই সব পুরনো ফাইল আবার টেনেটুনে বের কর।'

'আমেরিকার মাছ আমেরিকান রুই তুই গুলিয়ে ফেলেছিস।'

'আজ্ঞে না। আমেরিকার বাঙালিরা পশ্চিমবাংলার বাঙালিকে ডলার ফিশ খাওয়াতে চায়। আর তুই ভাবছিস কেন, দু তিন মাস অন্তর অন্তর বিদেশ যা। নানারকম পরিকল্পনা নিয়ে ঘোরাফেরা কর। মাছ খাওয়াতে না পারিস, মাছের পরিকল্পনা খাওয়া। মনে নেই আমাদের আগের মিনিস্ট্রি কলকাতার বাজারে বাজারে কয়েকদিন সরকারি মাছ বিক্রির চেষ্টা করেছিলেন। তিন চারদিন চলেছিল, তারপর সব ভুট্টা। ডিপ ফ্রিজ লাগানো সেই গাড়িগুলো কোথায় আছে খুঁজে বের কর। কাজে লাগা।'

গোবিন্দ গাইগুই শুরু করল।

'খুঁতখুঁত করলে তো চলবে না ভাই। দেশের কাজ করতেই হবে।'

'মাছ খাইয়ে দেশের কাজ। ওই তোমার বুবনা টুবনা যাদের হাতে অঢেল পয়সা তারা সব নিরামিষাশী। আর যারা মাছ খায় তাদের ভাঁড়ে মা ভবানী। একশো গ্রাম মাছ কিনে পাঁচ টুকরো করে। বাঙালীকে মাছ না খাইয়ে মাছের জল খাওয়া।'

ডিকটেটারের কায়দায় ডেমক্রেসি চালাতে হবে। তা না হলে সব ভেস্তে যাবে। গোবিন্দকে এক দাবড়ানি লাগালুম। 'বেশি গাইগুঁই করলে মাছ দুধ কিছুই পাবি না। যুবকল্যাণে ঠেলে দেবো। শোন, পশ্চিমবাংলার দ্বিতীয় মুখ্যমন্ত্রী ডকটর রায় কি বলতেন জানিস, বলতেন আমার মন্ত্রীরা সব কচ্ছপ। সকালে বিধানসভায় আসার সঙ্গে সঙ্গে চিৎ করে রেখে দি, আর কাজ শেষ হবার পর এক এক করে উপুড় করে দি, গুটিগুটি সব বাড়ি চলে যায়। গোবিন্দ। ঘোষ আর রায় জুটির এই ডিসিপ্লিন ছিল বলেই চুটিয়ে রাজত্ব করে যেতে পেরেছেন। মহাজনের পথই পথ। সেই ডিসিপ্লিন আমাদেরও অনুকরণ করতে হবে।'

মাছ নিয়ে গোবিন্দ চলে গেলো। খগেন সামন্তকে শিক্ষার দায়িত্ব দিলুম। উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু যত দূরে খগেন সামন্ত শিক্ষা থেকে ঠিক ততটাই দূরে। খগেন অশিক্ষাটা ভীষণ ভালো জানে বলেই তাকে শিক্ষাটা দিলুম।

'বড় বিপদে ফেললে তুমি। আমি তো আমলাদের হাতের পুতুল হয়ে যাবো।'

'তোমার একটু ইনফরমেশন গ্যাপ হয়ে আছে ভাই। গত পনের বছরে আমলারা সব আমলকী হয়ে গেছে। অফিসে এসেছেন, চেয়ারে বসেছেন পা নাচিয়েছেন, ছুটির পর বাড়ি চলে গেছেন।'

'কেন ?'

'ওই রেজিমে তাঁদের হোলসেল অকেজো করে রাখা হয়েছিল। অফিস চালিয়েছিলেন পার্টির ছেলেরা। আমলাদের ট্যাঁ ফোঁ করার উপায় ছিল না। আমলাদের দাপট ছিল রায় সেনের আমলে। আই. সি. এস, আই. এ. এস। আই. পি. এস। আমলারা আপাতত চিঁচিঁ করছেন। তুমি যা বলবে তাঁরা তাই করবেন।'

'আমি কি করবো ?'

'আমার সঙ্গে কনসাল্ট করবে। আমাদের পূর্বতনরা একটা লেভেল পর্যন্ত পাশ ফেল তুলে দিয়ে ভীষণ পপুলার হয়েছিলেন। কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ে চমৎকার একটা পরিবেশ তৈরি করেছিলেন। আমাদের সময় ভীষণ একটা ভয়ের পরিবেশ ছিল। অধ্যাপকদের ভয়ে, পরীক্ষার ভয়ে জীবনের সবচেয়ে ভালো সময়টা ছিল সবচেয়ে দুঃখের। কলেজে যাবার আগে বাথরুমে যেতে হত বারকতক। ডকটর ব্যানার্জির ক্লাসে আমার মনে হত আত্মহত্যা করি। পড়া না পারলে কোএডুকেশন ক্লাসে মেয়েদের সামনে সে কি মিষ্টি মিষ্টি জুতো। পরীক্ষার আগে পাঁচ কেজি ওজন কমে যেত। এই নেগেটিভ ব্যাপারটা এখন কেমন পজিটিভ হয়ে গেছে। ক্লাস যদি হয়, তাহলে সেই ক্লাসে আসার আগে এখন অধ্যাপকদেরই বাথরুমে ছুটতে হয়। এখনকার কলেজ আর বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো অতো সুন্দর আড্ডা আর লড়াইয়ের জায়গা আর দ্বিতীয় নেই। রাজনীতির হাতেখড়ি, সংসারের হাতেখড়ি হচ্ছে। ভবিষ্যতের নেতাদের জন্মভূমি।'

'তা আমরা কি আবার আমাদের কালে ফিরে যাবো ?'

'পাগল! যুবকদের সব সময় সন্তুষ্ট রাখতে হবে। তারাই হল আমাদের ভবিষ্যৎ।'

'দেশের ভবিষ্যৎ ?'

'ধুর পাগল! দেশের ভবিষ্যৎ নয়। আমাদের ভবিষ্যৎ। এই তোমার আমার ভবিষ্যৎ। আমাাদের গদির ভবিষ্যৎ। বুড়োহাবড়াদের ভোটে আমরা কোনও দিনই পাওয়ারে আসতে পারবো না। আমাদের নির্ভর করতে হবে যুবকদের ভোটের ওপর। নিউ ভোটারস। তরুণ সুর্ব সব। শতকরা পঁচাত্তর ভাগ হল যুবক। টাটকা প্রাণ, টগবগ করে ফুটছে, দিকে দিকে গ্রামে গঞ্জে, নট ইওর ওলড ফসিলস। তাদের ভবিষ্যৎ কি হল তোমার আমার জানার দরকার নেই। তাদের ভবিষ্যৎ মেরামত করতে গেলে আমরা অপ্রিয় হয়ে যাবো! নিউ

জেনারেশান আমাদের ঘৃণা করুক, এইটাই কি তুমি চাও! ঘৃণা! না না, সে আমার সহ্য হবে না।'

'আমার বাবা বলতেন।'

'তোমার বাবা গুষ্টির পিণ্ডি কি বলতেন আমার জানার দরকার নেই। বাবাদের কাল শেষ। এখন ছেলেদের কাল।'

'আমার বাবা বলতেন।'

'আবার সেই আমার বাবা। আরে আমার বাবা আর তোমার বাবা একই কথা বলবেন, ছাত্রানাং অধ্যয়নং তপঃ।'

'আর বলতেন ব্রহ্মচর্য। ব্রহ্মচর্যের অভাবে আমার না কি লেখাপড়া হল না। আকাট মূর্খ হয়েই রইলাম।'

'তুমি যে মন্ত্রী হলে, সেটা নিশ্চয় তিনি এখন ওপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন। ওসব পুরেনো থিওরি এখন অচল। ওই করে আমাদের ধর্মটা শেষ হয়ে গেল। যত সব নেগেটিভ অনুশাসন। কাম কাম করেই সব গেল। নারী নরকস্য দ্বার। এদিকে সব বিশাল বিশাল মুনি ঋষি, কেউ যোগবলে ধূম্রজাল সৃষ্টি করে নৌকোর ওপর মৈথুন করছেন। কেউ বলবালাকে জাপটে ধরেছেন। ধর্ম গেছে যাক। শিক্ষাকে আমরা যুগোপযোগী করব। স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয় হবে আনন্দের জায়গা, ফুর্তির জায়গা। ফ্রি স্টাইল কুস্তি, ক্যারাটে, কুংফুর জায়গা। হিরো, হিরোইনের জায়গা। হিরোইনের দুটো মানে। নায়িকা আর নেশা। পরীক্ষাটাও আমরা তুলে দোবো। পরীক্ষা মানে টোকাটুকি। টোকাটুকি বন্ধ করতে গেলেই ভাঙচুর। পরীক্ষা মানে খাতা দেখা। বছর ঘুরে যায় রেজাল্ট বেরোয় না। কাগজওলাদের লেখার খোরাক মেলে। ক্লাসেরও কোনও ধরাবাঁধা নিয়ম থাকবে না। যত খুশি ভর্তি হও। ভর্তি করা নিয়ে অধ্যক্ষদের আর ঘেরাও হতে হবে না। ছাত্র-সংগঠনের পাণ্ডারাও আর হামলা করার সুযোগ পাবে না। একটা বড় আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাবে। যত খুশি ছাত্র ভর্তি করে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় আয় বাড়াতে পারবে। টার্ম শেষ হয়ে যাবার পর ছাত্রছাত্রীরা কি করবে! ইউ. এস. আই. এস লাইব্রেরিতে দেখেছো, লেখা থাকে 'টেক ওয়ান', প্যামফ্লেট থাকে, বই থাকে, সেইরকম, কলেজে-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা কাউন্টারে লেখা থাকবে, 'টেক ওয়ান'। যার যার ডিগ্রি, ডিপ্লোমা তুলে নাও। নিজেই সুন্দর করে নামটা কালো কালিতে লিখে নাও। বুফে লাঞ্চের কায়দা। কেমন আইডিয়াটা?'

'জিনিসটার মধ্যে তেমন আঁট রইল না যে।'

'আ মোলো, স্বাধীনতার পর পঞ্চাশটা বছর চলে গেল এখনও শৃংখলা। বিশৃংখলার জন্যেই তো স্বাধীনতা! অভিভাবকরা চান ছেলেমেয়ের নাম যে কোনও একটা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের খাতায় লেখানো থাক। আর সব শেষে যেন একটা কাজ পায়। ছাপ চাই ছাপ। সেই ব্যবস্থা আমরা করে দিলুম। কোনও বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশ আর আছে! দিবারাত্র টিভি চলেছে। ভিডিও চলেছে। শিক্ষার ব্যাপারে আমাদের এই মুক্ত চিন্তা, যুবমহলে কিরকম সাড়া তোলে দেখবে! একে বলে হাইডাইনামিক মিনিস্ট্রি।'

'তাহলে আমার কাজটা কি হবে?'

'তোমার কাজ হবে নুন শো।'

'সে আবার কি?'

'তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের সঙ্গে পরামর্শ করে কলেজ কমানরুমে, বিশ্ববিদ্যালয়ে বারোটা থেকে তিনটে চালাও তামিল ছবি। ডাকবাংলোয় মাঝরাত, গরম শরীর।'

'ছি ছি। সে তো অপসংস্কৃতি। দেশের ভবিষ্যৎটা কি দাঁড়াবে।'

'বোকা বোকা কথা বোলো না গোবিন্দ। অনেক আগে তোমার মনে আছে নিশ্চয়. অপসংস্কৃতির ঘোরতর বিরোধী এক সরকার লবণ হ্রদের স্টেডিয়ামে ভাল্লুক নাচে করিয়েছিলেন। টিভির মিডনাইট ফিল্মের কথা ভোলোনি নিশ্চয়। আমরা হঠাৎ এসে গদিতে বসেছি। আমাদেরও তো শিখতে হবে। কার কাছে শিখব? আগে যাঁরা ছিলেন, তাঁরাই আমাদের গুরু। পাবলিকের কাছে সেইটুকুতেই তাঁর পপুলার হয়েছিলেন। আমরা আরও এক ধাপ এগোতে পারলে আরও পপুলার হব। চোখ কান খোলা রেখে কাজ করতে হবে। মন্ত্রী হওয়া অত সহজ নয়। সব সময় স্রোতের দিকে থাকে, স্রোতের বিরুদ্ধে নয়। একটা আঙুল রাখবে পাবলিকের পালসে।'

'ভবিষ্যৎ তো একটা আছে রে ভাই। আমাদেরও তো ছেলেপুলে আছে।'

'ইউ আর এ জ্যাক অ্যাস। আমাদের ছেলেরা মাউন্ট আবুতে যাবে! সেখান থেকে সোজা বিলেতে। পাবলিকের ছেলেদের নিয়ে তোমাকে মাথা ঘামাতে হবে না। অত তাড়াতাড়ি সব ভুলে যাও কেন! মনে পড়ে সেই ব্যর্থ আন্দোলনের কথা। বিশ্ববিদ্যালয় আর প্রেসিডেন্সির কত চোখা চোখা ছেলে মারা গেল? যাঁরা আন্দোলনের নেতা ছিলেন, আর যাঁরা মারলেন, তাঁদের কারুর কোনও

দয়ামায়া ছিল ? ছিল না। পাওয়ার ফুটবলের মতো পাওয়ার পলিটিকস।'

দপ্তর বণ্টন মোটামুটি একরকম হল। এইবার আমরা সব রাইটার্স বিল্ডিং-এ যাবো। কলকাতার পাতাল রেল এখনও শেষ হয়নি। হলেই বা কি! কলকাতার সারফেসের শোচনীয় অবস্থা। এক মাস আগে, আমি তখন কিছুই না, একটা টেম্পোয় শেয়ালদা থেকে ফারনিচার তুলে টালায় আমার বাড়িতে আসছিলুম। কম সে কম তিন জায়গায় ট্র্যাফিক পুলিসকে ঘুষ দিতে হয়েছে। সেই সময় আমর রেশান কার্ড হারিয়ে গিয়েছিল ঘুষ দিয়ে বের করতে হয়েছে। মালদা থেকে মেসোমশাই এসেছিলেন কিডনির অসুখ নিয়ে। কোনও হাসপাতালে সিট না পেয়ে শেষে নার্সিংহোম। আমার দিদির বড় ছেলে পাঁচটা নম্বর কম পেয়েছিল বলে ক্যালকাটা ইউনিভারসিটিতে ভর্তি করাতে পারিনি! আমার কাকা কবে রিটায়ার করেছেন। না পেনসান, না প্রভিডেন্ট ফান্ড, গ্র্যাচুইটি। আমি আর আমার স্ত্রী একদিন একটু রাত করে আমাদের আত্মীয়দের বাড়ি থেকে ফিরছি। ইণ্ডিয়ান এয়ারলাইনসের সামনে পাঁচটা ছেলে আমাদের ঘিরে ধরে সব ছিনতাই করে নিলে। থানার ডায়েরি হল। ফল শূন্য। গলার কাছে ছুরির দাগটা আজও স্মৃতি। যোগেন জুট মিলে ভাল চাকরি করত। বেকার বসে আছে। ছেলেমেয়েরা ফ্যালফ্যাল করে ঘুরছে। যোগেনের স্ত্রী স্কুল মাস্টারি করছিল লিভ ভেকান্সিতে। মাস্টারিটা গেছে। অনেক চেষ্টা করেও পাকা চাকরি হল না। কায়দা করে বাজার পুড়িয়ে দিলে। নিত্যানন্দের দোকান পুড়ে গেল। নিত্যানন্দ এখন ভিক্ষে করছে। আজ আমি মুখ্যমন্ত্রী। আমার গাড়ির সামনে পুলিস পাইলট ওঁয়া ওঁয়া করে চলেছে। কোথায় কলকাতার ট্রাফিক জ্যাম। এক মাস আগের সেই পুলিস, আজ আমার জন্যে কত তৎপর!)

চেয়ারে বসলুম। চারপাশে একবার তাকালুম। প্যানেলিং করা ঝকঝকে দেয়াল। একটা মাত্র ছবি এ ঘরে থাকবে। কার ছবি? পরে ঠিক হবে। পাবলিকের চোখে কোন মহাপুরুষ এখন সবচেয়ে শ্রদ্ধেয়। ওই সেনশর্মা

যে ফার্মকে দেবেন, তাঁদের, দিয়েই একটা রেটিং করাতে হবে। সেই অনুসারে ছবি হবে।

চিফ সেক্রেটারি, ডিপার্টমেন্টাল সেক্রেটারিরা একে একে এলেন। হিউম্যান্স সাইকোলজি আমি কিছুটা বুঝি। সেই সঙ্গে খানিকটা সিক্সথ সেনসও আছে। সকলেরই চোখে মুখে একটা ব্যঙ্গের দৃষ্টি। যেন অর্বাচীন কোনও প্রাণী দেখতে এসেছে। পোড় খাওয়া, ঝানু পলিটিসিয়ান আমি নই। সাতপুরুষে বড়লোক আর লটারি পাওয়া বড়লোকে যা তফাৎ সেই তফাৎ আর কি? কিভাবে এদের হ্যান্ডল করবো ভাবছি। আমার টেবিলটা বিশাল। সামনে, পাশে অনেক চেয়ার। প্রত্যেকেই বসেছেন। সেই একইভাবে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। এর আগে পশ্চিম বাংলায় কয়েক মাসের জন্যে একটি মন্ত্রিসভা হয়েছিল। এঁরা ভাবছেন সেই রকমই একটা কিছু হয়েছে। ভাবছেন, ওই তোমার চেয়ার। বসেছ, বোসো। হেসে নাও দুদিন বইঁতো নয়, কার যে কখন সন্ধ্যা হয়।

আমি বললুম, 'কি দেখছেন অমন করে?"

সকলেই একটু অপ্রস্তুত হলেন। চিফ সেক্রেটারি বললেন, 'না দেখছি, বয়েসে আপনি খুবই তরুণ। এ রাজ্যের তরুণতম মুখ্যমন্ত্রী।'

'আপনি কিন্তু বেশ প্রবীণ। প্রোমোশন পেতে পেতে উঠেছেন তাই না?'

'হ্যাঁ, সেইটাই তো নিয়ম।'

'আর ক' বছর?'

'হয়ে এল। বছর তিনেক আছে।'

'প্রেসিডেন্টস রুল করে না দিলে, আপনার পর আমরা আরও দু' বছর আছি।'

'হ্যাঁ, আপনার আশংকা অমূলক নয়। প্রেসিডেন্টস রুল হয়ে যেতে পারে।'

'অনেক দিন হয়নি। হলে আপনাদের দাপট অনেকটা বাড়ে। অচল হয়ে আছেন অনেক দিন।'

'অপনি তো সবই জানেন।'

'শিগগির একটা কমুন্যাল রায়ট বাঁধাবার চেষ্টা হবে। ব্যাংক ডাকাতি আর খুনখারাবি বাড়বে। জিনিষপত্রের দাম অস্থির হবে। কি কি হবে আমি জানি। ব্যাপক লোডশেডিং হবে। লেবার ট্রাবল বাড়বে। এই রাজ্য কিছু দিনের

মধ্যেই খুব অসুস্থ হয়ে পড়বে। ইনফ্লুয়েঞ্জা, ডেঙ্গু, টাইফয়েড সবই একসঙ্গে হবে।' আমরা সেইভাবেই প্রস্তুত হব। দেখা যাক কি হয়! এতে আপনাদের কোনও ভূমিকা নেই। জনসাধারণেরও বিশেষ কিছু করার নেই। স্বার্থের লড়াই।'

বিভাগীয় সেক্রেটারিরা চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে এলেন কর্মচারী সমিতির এক প্রধান! বেশ উদ্ধত ভাব। বসতে বলার আগেই চেয়ার সরিয়ে বসে পড়লেন এবং একটা সিগারেট ধরালেন কায়দা করে। এ ব্যবহারটা আমার পরিচিত। অসম্মান করে ব্যক্তিত্ব বাড়াবার চেষ্টা। আগের রেজিমে এঁদের খুব দাপট ছিল।

ভদ্রলোককে ভালো করে দেখলুম। তিনিও আমাকে দেখলেন।

প্রথমে আমিই কথা বললুম, 'আপনার কিছু বলার আছে?'

'আপনি কিছু বলবেন?'

'এখন না পরে। বিশেষ কিছু বলার নেই, অনেক কিছু করার আছে।'

'কি আর করবেন? আমাদের কেউ কিছু করতে পারেনি।'

'তাহলে শুনুন, কোলিয়ারি দেখেছেন?'

ভদ্রলোক বেশ অবাক হলেন। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে সিগারেটে খুব রামটান মারছিলেন, আর ফুস করে ধোঁয়া ছুঁড়ে দিচ্ছেলেন আমার মুখের দিকে। আমার প্রশ্ন শুনে সেই অসভ্যতা থেমে গেল।

'কোলিয়ারি? হ্যাঁ, আসানসোলে একবার একটা কোলিয়ারি দেখেছিলুম।'

'ভালো করে দেখেননি। কয়লা তুলে নেবার পর এক একটা পিট জল আর বালি ভরে সিল করে দেওয়া হয়। একে বলে সিলিং টেকনিক। অনেক সময় বড় রকমের অ্যাকসিডেন্টের পর যেমন চাসনালায়, ডেডবডি সমেত পিট সিল করে দেয়। এই সচিবালয়টিকে আমরা সবার আগে সিল করে দোবো?

নেতা একটু মুচকি হেসে বললেন, 'কাজ হবে কি করে?'

'বাইরে থেকে। আমরা একটা প্যারালাল সচিবালয় তৈরি করবো। আপনারা মাইনে পাবেন; কিন্তু কোনও কাজ থাকবে না। গল্প করবেন, চা খাবেন। আরও অনেক চায়ের দোকান করিডরে করিডরে বসিয়ে দেবো। আমাদের মানবিকতা বোধের অভাব হবে না। কেবল সুইট পলিটিকস আর করা যাবে না। অনেক হয়েছে। এবার আপনাদের ছুটি।'

ভদ্রলোক হুঁক করে একটা শব্দ করলেন, যার অর্থ, কত হাতি গেল তল, মশা বলে দেখি কত জল। চেয়ার সরিয়ে উঠে গেলেন। আমি ফোন তুলে নিলুম,

মিস্টার সেনশর্মা, পাবলিকের পালস আর প্রেসার বোঝার কোনো যন্ত্র আছে ?
শুনেছি আমেরিকায় আছে।'

'যন্ত্র নেই প্রতিষ্ঠান আছে। আসনে বসতে না বসতেই অমন উতলা কেন ? অত ভয়ের কি আছে ! তেমন বুঝলে নেমে দাঁড়াবেন। না গদির মোহ ধরে গেছে ?'

'মোহ নয় রোখ চেপে গেছে। হেরে যাবো কেন ! এখন মনে হচ্ছে সত্যি সত্যিই দেশসেবা করবো।'

'এই রে মুদ্র ধরেছে। সাত দিনের মতো ভোগাবে। দেশ সেবা করা যায় না। আজ পর্যন্ত কেউ পারেনি। যাক আমি হাইড্রা মার্কেট সার্ভে এজেন্সিকে পাঠাচ্ছি।'

'মার্কেট সার্ভে ?'

'হ্যাঁ মার্কেট সার্ভে। নিজেদের মনে করুন, সার্ফ কি নিরমা কি ডেট কি রিন।'

'সে কি মশাই ?'

'ওই হল। হাইড্রাকে পাঠাচ্ছি।'

ফোন ডিসকানেক্ট করে কমিশনার অফ পুলিসকে চাইবো, ঘরে ঢুকলেন লম্বা ছিপছিপে এক ভদ্রলোক।

'আমি আপনার প্রাইভেট সেক্রেটারি স্যার। আমাকে ব্যবহার করুন। কি লাইন চাই ? কার লাইন ?' রিসিভার ফেলে দিয়ে বললুম, 'বসুন আপনি। কি নাম আপনার ?'

ভদ্রলোক বসলেন না। নাম বললেন, বিকাশ ভট্টাচার্য। আমাকে খানিকটা অতীত শুনিয়ে দিলেন। এই ঘর। এই চেয়ার। সব ইতিহাস। ভদ্রলোকের পান খাওয়া অভ্যাস। তখনও অল্প একটু মুখে আছে। নাড়াচাড়া করেছিলে। তবে কোনও চ্যাকর চ্যাকর শব্দ হচ্ছিল না। এই ঘরে কত বড় বড় নাটক হয়ে গেছে। প্রফুল্ল ঘোষ, বিধানচন্দ্র, প্রফুল্ল সেন, অজয় মুখার্জি, সিদ্ধার্থশংকর, জ্যোতি বসু। সব বলে বললেন, 'আপনাদের অবশ্য কোনও অতীত নেই। পড়ে পাওয়া সাতগণ্ডা। আমার মুখের স্যার তেমন আগঢাক নেই। যা আসে তাই বলে ফেলি। তবে সত্য বলি।'

আমি হাঁ হয়ে বসে রইলুম। তিনি দরজা ঠেলে চলে গেলেন।

কমিশনার এলেন। পুলিস দপ্তরটা আমার। মুখ্যমন্ত্রীরা এই দপ্তরটা

সাধারণত নিজের হাতেই রাখেন। আমি বেশ একটু রেগেই ছিলাম, 'আপনাকে ডাকতে হল ? আপনার উচিত ছিল না নিজে আসার।'

'আমি জানি এস পি আসছেন। আমি নিজে একটা ঝামেলায় আটকে ছিলুম। কলেজ স্ট্রিটে খুব ঝামেলা হয়ে গেছে। এখনও বাস ট্রাম বন্ধ।'

'কলেজ স্ট্রিটে আবার কি ঝামেলা হল ?'

'ও কিছু নয়, রুটিন ব্যাপার। দুই ছাত্র সংসদে মারামারি। আজ ব্যাপারটাকে একটু গুরুপাক করে ফেলেছে।

দু-তিন রাউন্ড গুলি চালাতে হয়েছে। দু-একটা মরেছে মনে হয়।'

'এ আপনি কিভাবে কথা বলছেন। এলিয়ে এলিয়ে। দু-একটা মরেছে। সঠিক সংখ্যা বলুন।'

'ও আপনি নতুন তাই বোধহয় জানেন না, ইউনিভারসিটি পাড়ায় আমরা মৃত্যুর হিসেবে রাখি না। ইন সেভেনটিজ আমরা এত ছাত্র মেরেছি যে ছাত্র আর ছারপোকা এক হয়ে গেছে।'

চেয়ারে বিশাল চেহারা এলিয়ে দিয়ে ভদ্রলোক বসেছেন। অসভ্যতাই বলা চলে। একটু কড়কে দেওয়া যায় কি না জানি না। অভিজ্ঞতা এত কম আমার।

প্রশ্ন করলুম, 'শহরের অবস্থা কি ?'

'থমথমে।'

'থমথমে কেন ?'

'বুঝতেই পারছেন। পলিটিক্যাল ঘুঘুরা নির্বাচনের রায়ে খুব একটা খুশি নয়। হিট ব্যাক একটা হবেই। পি ডি এফ প্রথম ইউ এফ এর কথা মনে পড়ে। কাল আবার ময়দানে দুটো বড় দলের খেলা আছে। কমিউন্যাল ভায়োলেনসের সম্ভাবনায় আমাদের প্রস্তুত থাকতে হবে। তার পরেই আসছে পরব। ব্যাপারটা বুঝতে পারছেন ?'

'আপনি কলকাতার সমস্ত ওয়ার্ডের মাস্তানদের মিসায় অ্যারেস্ট করুন। দ্যাট ইউ ক্যান।'

'না, আই ক্যান নট। এখন যা অবস্থা, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড়। আপনার জেলখানায় জায়গা নেই। তা ছাড়া কোনও মাস্তানই ফ্রি নেই। সবাই লিংকড আপ। অন দি পে রোল অফ পলিটিক্যাল পার্টিজ, বিজনেস হাউসেস অ্যান্ড আদারস।'

'তা হলে আমরা হেল্পলেস ?'

'অনেকটা তাই। প্যারালাল অর্থনীতির মতো, প্যারালাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তৈরি হয়েছে।'

'তা হলে আপনারা কি করতে আছেন?'

'ফসলের মাঠে কাকতাড়ুয়া কি করতে থাকে? কোনও কাক ভয় পেল তো পেল, না পেলে হাঁড়ির মাথায় বসে পায়খানা করে দিয়ে গেল।'

'বিজনেস হাউস, পলিটিক্যাল পার্টি'স যদি পারচেজ করতে পারে, আমরা কেন পারবো না। শ'খানেক কি শ' দুই মাস্তানের দাম কতো?'

'অনেক অনেক অনেক। ফ্যাবুলাস অ্যামাউণ্ট। বাপ কখনো ছেলেকে পারচেজ করতে পারে? আইদার তাকে ভালবাসতে হবে আর তাকে শাসন করতে হবে। আপনাদের ভূমিকা বাপের ভূমিকা। গত পঞ্চাশ বছরের ইনডালজেনসে সব ভেস্তে গেছে। এখন আর কোনও উপায় নেই। নাথিং ডুইং।'

'আপনারা এই কথা বলছেন?'

'আপনারাই বা কি কথা বলে এসেছেন এতকাল। ওপর দিকে থুতু ছেটালে নিজের গায়েই এসে পড়ে! দেন ডোণ্ট স্পিট। সোয়ালো। আমাদের এই ইউনিফর্ম আছে, কোমরে একটা করে জংধরা পিস্তল আছে। এ দিয়ে মডার্ন ক্রিমিন্যালসদের আমরা কি করবো। তেড়ে পেটাতে গেলে চিফ মিনস্টার বলবেন, এ আপনি কি করলেন, এটা স্বাধীন দেশ, উগাণ্ডা, আর্জেণ্টিনা, নিকারাগুয়া নয়, প্রিটোরিয়া নয়। ফলে আমরা সব সাক্ষীগোপাল।'

"এ তো মহা মুশকিল। রাজ্য চালাবো কি করে?"

'চালাবেন না। শুধু বক্তৃতা দিয়ে যান আর বিদেশ ভ্রমণ করুন। স্টেট নামক লটারিটা যখন পেয়ে গেছেন, যে কদিন আছেন, আখের গুছিয়ে নিন।'

'সিনিয়ার পুলিস অফিসার হয়ে এই সব কথা বলছেন?'

'আপনি তো জানেন সব। আমি শুধু বলেছি। আপনি তো আর নাবালক নন। আর দিন কয়েকের মধ্যেই তো আপনি বিক্রি হয়ে যাবেন।'

'বিক্রি হয়ে যাবো মানে?'

'নিলাম হয়ে যাবেন। হায়েস্ট বিডার এসে আপনাকে কিনে নেবে। আগেও তাই হয়েছে। এখনও তাই হবে। দামটা কেবল মনে মনে হিসেব করে রাখুন। মিনিমাম কত আপনি আশা করেন।'

'আপনাকে ট্র্যানসফার করতে ইচ্ছে করছে।'

করবেই, কারণ ওইটুকুই আপনার ক্ষমতা। একদা আমাদের দেশে একজন প্রধানমন্ত্রী ছিলেন, যিনি জামা পালটাবার মতো রোজ মন্ত্রী পালটাতেন আর অফিসারদের বদলি করতেন। তারপর। তারপর আপনি জানেন।'

আমি একটু থমকে গেলুম। সেই প্রধানমন্ত্রী কেন, আরও অনেক প্রধান-মন্ত্রীর কথা মনে পড়ে গেল। সকলেই চেলাচামুণ্ডা পরিবৃত হয়ে রাজত্ব করে গেছেন। একার জোরে সিংহাসনে বসে থাকা যায় না। গণতন্ত্রের এই এক দোষ। কোটি মানুষের মন যুগিয়ে চলতে হবে। চেলারা ডোবালে ডুববে। ভাসালে ভাসবে। প্রবীণ এই অফিসারকে চটালে চলবে না। সারেণ্ডার করলুম। বললুম, 'আপনি তো অনেক কিছু জানেন। অভিজ্ঞ মানুষ। বলতে পারেন, আমাদের পরমায়ু কত দিন।'

'বেশি দিন নয়। দেখছেন না, তাই অমন গা করছি না। এই টেবিল, এই চেয়ার সাধ্য সাধনার জিনিস। আপনি বসে আছেন, মনে হচ্ছে পাখির ডালে বসা। এখনি উড়ে যেতে হবে।'

'সরে বসবো ?'

'না, না, সেটা আবার বাড়াবাড়ি হয়ে যাবে। যদ্দিন পারেন অস্বস্তি হলেও বসে থাকুন।'

'কিছু করা যায় না ?'

'আপনাদের ক্যাডার আছে ? হয় গুণ্ডা না হয় ক্যাডার, যে কোনও একটা চাই।'

'আজকাল বিয়ে বাড়ি যেমন ক্যাটারিং এজেন্সি সামলায়, সেই রকম ক্যাডার সাপ্লাইয়ের জন্যে কোনও এজেন্সি নেই ?'

'ক্যাডার আপনার তৈরি করে করতে হয়। ও কেউ সাপ্লাই করতে পারে না। ওসব চিন্তা ছাড়ুন। ভগবানকে ডাকুন।'

কমিশনার চলে গেলেন। ঘরে আদুরে চেহারার এক ভদ্রলোক ঢুকলেন। বগলে অনেক ফাইলপত্র।

'আপনি কে ?'

'ইনফরমেশান অ্যাণ্ড পাবলিক রিলেশানস-এর সেক্রেটারি।'

'বসুন।'

'আজকের পেপার কাটিংস। দেখবেন তো ?'

'কি লিখছে ?'

'বেশ সব ড্যামেজিং কথাবার্তা আছে। আপনাদের ফেভারে কেউ তেমন লেখেনি।'

'বয়ে গেল।'

'বয়ে গেল কি স্যার! এমন কোনও সরকার নেই যাঁরা প্রেসকে ভয় পান না। পাওয়ারফুল মিডিয়া। একটা কাগজ তো আপনাদের বলছে, ডেবরিজ সরকার। ভাঙা ইটপাটকেল দিয়ে তৈরি।'

'প্রতিবাদ করুন। এডিটারের বিরুদ্ধে মানহানির মামলা করুন।'

'তা হয় না। প্রথম দিন থেকেই মামলা মকদ্দমা। সেটা তো ঠিক হবে না। এখন তো আপনাদের ইমেজ বিল্ডিং-এর সময়।'

'তা হলে এডিটারকে ডেকে মেঠাইমণ্ডা খাওয়ান।'

'আমাদের তো এক কাপ চা আর গুনে ঠিক দুটো কাজু বাদাম ছাড়া আর তো কিছু খাওয়াবার স্যাংসান নেই। আমি পেপার ক্লিপিংসগুলো রেখে যাই, সময় মতো দেখবেন।'

'দেখে কি হবে। কিছু তো করার উপায় নেই।'

'নিজেদের সংশোধন করতে পারবেন। আর একটু স্মার্ট হতে পারবেন। একটা বাংলা কাগজ তো আপনাদের এলেবেলে সরকার বলেছে।'

'তাতে আপনার কি? আপনার খুব আনন্দ হয়েছে মনে হচ্ছে।'

'আমার আনন্দ হবে কেন। খুব দুঃখ হয়েছে। আপনার ওই চেয়ারে কারা বসে গেছেন জানেন? ডক্টর রায়, জ্যোতি বসু।'

'সবাই তো আর চিরদিন থাকেন না। আজ আমরা এসেছি। আপনি একটা বড় করে প্রেস কনফারেনস ডাকুন।'

'কনফারেনস ডেকে কি হবে। আপনাদের তো কোনও কর্ম পরিকল্পনা নেই।'

'আপনি আমাদের স্টেট লটারির ডিরেকটারকে ডেকে পাঠান। বলুন সি এম চাইছেন ওই ড্রাম ঘুরিয়ে ফার্স্ট সেকেণ্ড থার্ড নয়, দেশের মানুষের কাছ থেকে জনগণের কাছ থেকে দেশ গঠনের পরিকল্পনা চেয়ে পাঠাতে। প্রতি সপ্তাহে বেস্ট পরিকল্পনা দাতাকে ফার্স্ট প্রাইজ দেওয়া হবে।'

'লটারির ডিরেকটার কি করবেন? লটারি স্টেটের একটা বড় ইনকাম। সেটাকে বন্ধ করলে কর্মচারীদের মাইনে বন্ধ হয়ে যাবে। হাজার হাজার লটারির টিকিট বিক্রি হবে কি করে। না না, আপনার মাথায় এখনও তেমন কিছু আসছে না। আপনি আরও একটু ভাবুন। আপনার মন্ত্রীদের নিয়ে বসে আগে একটা

এ ক্লাস পরিকল্পনা তৈরি করুন। আর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব টিভি আর রেডিওতে ঠেসে কিছু ভাষণ দিন। আপনার ভাষণ আমি শুনিনি, কেমন আসে? জ্যোতিবাবুর মতো হয়?'

'কিসে আর কিসে। চাঁদে আর চাঁদ মালায়। আমি ওই থেমে থেমে কোঁত পেড়ে পেড়ে কিছুটা বলতে পারি। তাও আবার সব গুলিয়ে যায়। শুরু করলুম দেশ দিয়ে শেষ হল কড়া পাক সন্দেশে।'

'কি করে পাওয়ারে এলেন স্যার?'

'কে জানে? কে আমার এই সর্বনাশ করলে?'

ভদ্রলোক কি একটা চিবোতে চিবোতে সুখী হংসের মতো চলে গেলেন। আমি ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আমার দপ্তর আমার সঙ্গে তেমন সহযোগিতা করবে না। কেন করবে! আমি যখন সাধারণ মানুষ ছিলুম, মন দিয়ে গোটা কাগজটা পড়তুম, তখন প্রায়ই মুখ্যমন্ত্রীদের আক্ষেপ শুনেছি, পুলিস সহযোগিতা করছে না, সচিবালয়ের কর্মীরা অগ্রগতির কাছা টেনে ধরছে। তখন ওই সব বিলাপ চোখ এড়িয়ে চলে যেত। অনেক সময় খুশিই হতুম। নিচের তলার মানুষের ওপরতলার মানুষের ওপর একটা রাগ থেকেই থাকে। ওঁরা ওঁরা করে রাস্তা দিয়ে ছুটছে। বিলিতি গাড়ি চেপে। তখন আমি ছিলুম নিচেরতলার প্রতিনিধি। এখন আমি হঠাৎ ওপর তলার হয়ে গেছি। হলে কি হবে। ভেতরে বসে আছে তো সেই নিচু তলার মন।

আমার পি এ এসে টেবিলে একটা চিরকুট রাখলেন। আমি ভুরু কুঁচকে তাকালুম।

'এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে চান।'

'কি ব্যাপারে?'

'বলতে চাইছেন না। অনেকবার প্রশ্ন করেছি, বলছেন পার্সোন্যাল। আপনার শিক্ষক ছিলেন।'

'আমার শিক্ষক ছিলেন, বেশ আসতে দিন।'

দরজার দিকে তাকিয়ে রইলুম। মুখ্যমন্ত্রীর ঘরের অনেক কায়দা। একপাশে কনফারেনস রুম। আর একপাশে সেক্রেটারির ঘর। আর এক পাশে প্যাসেজ। গোটা তিনেক দরজা। কোন দরজা দিয়ে ঢুকবেন কে জানে। সামনের দরজা দিয়ে ঢুকলেন নীলকমলবাবু। নীলকমল বোস। এক সময় আমার কলেজে

ইংরেজির নামকরা অধ্যাপক ছিলেন। আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম 'আসুন স্যার।'

'তোমার কাছে আসা খুব সহজ নয়। জনসাধারণের কাছ থেকে কত দূরে সরে গেছ? অ্যাঁ। এই তোমার ঘর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। এই রকম ঘরেই আমাদের বসতে হয়। সেইটাই না কি নিয়ম।'

'এক সময় আমি তোমার শিক্ষক ছিলুম। তোমার জীবনের অনেকটা সময় তুমি আমার সঙ্গে কাটিয়েছ। আমার গোটা বাড়ির এরিয়া বোধহয় অ্যাতোটা হবে না। অ্যাঁ, কি লাকসারির মধ্যে আছো? এর মধ্যে থেকে জনসেবা করবে? মূর্খ।'

'আপনি আগে বসুন।'

'হ্যাঁ বসবো তো বটেই। কাগজে তোমার নাম দেখে আর সামান্য যেটুকু পরিচয় বেরিয়েছিল সেইটুকু পড়ে, মনে হল তুমি কলেজে আমার ছাত্র ছিলে। এই বয়েসে তোমাদের এই অদ্ভুত অমানুষিক ট্রান্সপোর্ট ব্যবস্থা ঠেঙিয়ে আমি তোমাকে অভিনন্দন জানাতে আসিনি। আমি তোমার কাছে কাঁদতে এসেছি।'

'কেন স্যার। এই আনন্দের দিনে কাঁদতে এলেন কেন? আমি কি তাহলে আরও খারাপ হয়ে গেলুম।'

'আজকাল তো আর ভালমন্দের পুরনো বিচার-পদ্ধতি অচল। যে যত বড় দুশ্চরিত্র সে তত বড় বীর। যে যত বড় চোর সে তত বড় দেশসেবক। যদু-বংশের এই শেষ পরিণতিতে তোমার কাছে চোখের জল ফেলতে আসিনি। আমি তোমাকে জানাতে এসেছি, আর কতকাল সহ্য করা যায়?'

'কি সহ্য?'

'অসহ্য অবস্থা।'

'আপনি আমাকে বলুন। টাকা পয়সার কোনও অসুবিধে থাকলে বলুন। আমার অনেক ফান্ড আছে। আপনাকে আমি না হয় একটা অ্যাডভাইসারের চাকরি করে দিচ্ছি, এডুকেশান সেক্রেটারির সঙ্গে আলোচনা করে।'

'ছি ছি ছি, আমি তোমার কাছে ভিক্ষে চাইতে আসিনি। বাবা। আমি সেই জেনারেশানের যে সময় শিক্ষকরা শিক্ষকই ছিলেন, ডাক্তাররা ডাক্তারই ছিলেন, ছাত্ররা ছাত্রই ছিল। অভাব আমাদের কি করবে। তুমি? তুমি কি মহাভারত পড়েছিলে? না, সময় হয়নি।'

'অল্প অল্প খামচা খামচা পড়া আছে।'

'থাক না পড়ে ভালই করেছ। এক একটা লক্ষণ মিলে যেত, আর ভয়ে আঁতকে উঠতে। সময় পেলে তুমি শুধু ওই যায়গাটা পড়ে নিও, মুসলপর্ব। বিশ্বামিত্র, কণ্ব আর নারদ দ্বারকাধামে এসেছেন। অনেকদিন শ্রীকৃষ্ণের দর্শন পাননি। তাই এসেছেন দেখা করতে। সারণ আর অন্যান্য বীরেরা তাঁদের দর্শন করে গেলেন। তাঁরা করলেন কি, সাম্বকে স্ত্রীলোক সাজিয়ে সেই মানী মুনিদের সামনে হাজির করে বললেন, ইনি অমিতবলশালী বভ্রুর পত্নী। আপনারা ত্রিকালজ্ঞ ঋষি, এখন বলুন এর গর্ভে কি জন্মাবে, পুত্র না কন্যা ?

'ব্যাপারটা একবার বোঝো। জানে ঋষিরা ত্রিকালজ্ঞ। মুখে বলছে, আপনারা ত্রিকালজ্ঞ, আবার সাম্বকে মেয়ে সাজিয়ে এই অশ্লীল প্রশ্ন। সাম্ব কে ? না স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের পুত্র। অবমানিত মুনিরা তখন বললেন, রে বক্রস্বভাব, ক্রোধী দুরাচার যাদবকুমার। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই পুত্র সাম্ব এক ভয়ঙ্কর লোহঘটিত মুসল প্রসব করবে, যার দ্বারা সমগ্র বৃষ্ণি ও অন্ধকবংশ বিনষ্ট হবে। কেবল বলদেব আর শ্রীকৃষ্ণ সেই সর্বনাশ থেকে রেহাই পাবেন। শ্রীমান বলরাম দেহত্যাগ করে সমুদ্রে প্রবেশ করবেন আর জরা নামক জনৈক ব্যাধ ভূতলে শায়িত মহাত্মা কৃষ্ণকে বাণ মেরে নিহত করবে।

'তুমি ওই মুসল পর্বটা দয়া করে পড়ে নিও।'

'কেন বলুন তো ?'

'শোনো, স্বাধীনতা আন্দোলনের পিরিয়াডটা যদি কুরুক্ষেত্র পর্ব হয় তাহলে তোমাদের এই কালটা হল মুসলপর্ব।

ব্যজায়ন্ত খরা গোষু করভাদশ্বতরীষু চ।
শুনীষ্বপি বিড়ালাশ্চ মূষিকা নকুলীষু চ॥'

'স্যার আমি তো তেমন সংস্কৃত জানি না।'

'না জানাই ভালো। ডেড ল্যাঙ্গোয়েজ। অকসফোর্ডের সায়েবরা জানুক, জার্মানরা জানুক। জানুক আমেরিকানরা। মানেটা বড় সুন্দর। ঠিক এখনকার মতো, গাভীর গর্ভে গর্দভ, অশ্বতরীর গর্ভে হস্তিশাবক, কুক্কুরীর গর্ভে বিড়াল ও নকুলীর গর্ভে মূষিক জন্মাবে। এখন যা হচ্ছে। মানুষের গর্ভে মানুষ আর জন্মাচ্ছে না।'

মাস্টার মশায় উঠে দাঁড়ালেন। বিচলিত মনে হচ্ছে। অসাধারণ শিক্ষক ছিলেন। অসাধারণ বলিয়ে কইয়ে ছিলেন। তিনি ঘরময় পায়চারি করতে করতে বলতে লাগলেন।

'নাপত্রপস্ত পাপানি কুর্বন্তো বৃষ্ণয়স্তদা।
প্রাদ্বিষণ ব্রাহ্মণাংশ্চাপি পিতৃন দেবাংস্তথৈব॥'

'বৃষ্ণিবংশধরগণ সেই সময় পাপকার্য করেও লজ্জিত হত না আর ব্রাহ্মণ দেখলেই জ্বলে উঠত, পিতৃপুরুষ আর দেবতারা ভেসে গেলেন। স্ত্রীলোকেরা স্বামীদের তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিত আর স্বামীরা স্ত্রীদের লঙ্ঘন করে ব্যভিচারের স্রোত বইয়ে দিতো।'

মাস্টারমশাইকে ধ'রে চেয়ারে বসালুম। আগের চেয়ারে আগের অনেক শীর্ণ হয়েছেন। শরীর কাঁপছে।

'আমি আপনার জন্যে কি করতে পারি মাস্টারমশাই। খুলে বলুন না।'

'তুমি আমার জন্যে কিছুই করতে পার না।'

বৃদ্ধ মানুষটির ওপর এইবার আমার রাগ হচ্ছে। আমার মুখামস্তীত্ব জেগে উঠছে।

'তা হলে এলেন কেন?'

একটু জোরেই বলে ফেলেছি। অসহায় মানুষটি আমার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকালেন। সেই তীব্র উজ্জ্বল চোখ আর নেই। সাদা ঘোলাটে মৃত চোখ। তলার পাতা ভিজে ভিজে। আবেগে প্রায় রুদ্ধকণ্ঠ।

'আমি যে তোমাকে বলতে পারছি না বাবা। বড় লজ্জার ব্যাপার। বড় হীন ব্যাপার। তুমি বরং আজকের বাংলা কাগজটা আনাও।'

আমার ইণ্ডিকেটার ল্যাম্প জ্বেলে পি একে ডেকে কাগজটা আনালুম। মাস্টারমশায় হাতে নিয়ে পাতা উলটে একটা জায়গা দেখিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই জায়গাটা পড়ো।'

আমি পড়ছি। তিনি মাথা নিচু করে বসে আছেন।

ঘটনাটা পড়ে আমার শরীরই কেমন যেন করে উঠল। মাস্টারমশাইয়ের বাড়ির চারপাশে চোলাই আর সাট্টার ডেন গজিয়ে উঠেছে। তিনি প্রায়ই যাবতীয় অসামাজিক কার্যকলাপের প্রতিবাদ করতেন। শিক্ষক মানুষ চোখের সামনে যুবসমাজের এই অবক্ষয় সহ্য করতে পারতেন না। এই নিয়েই অশান্তি বাড়ছিল। গতকাল একদল দুর্বৃত্ত, মাস্টারমশায়ের নাতনী যখন স্কুল থেকে ফিরছিল তখন সবাই মিলে তাকে তুলে নিয়ে যায় ওইপাড়ারই বহুকালের পুরনো এক পরিত্যক্ত বাড়িতে। সেখানে পর পর সাতজন তাকে ধর্ষণ করে ফেলে রেখে যায়। মেয়েটি

হাসপাতালে।

'থানায় ডায়েরি করেছেন ?'

'নিলে না। আমাকে বোঝালে, আপনি জ্ঞানী গুণী মানুষ। যত লোক জানাজানি হবে ততই আপনার অপমান।

গুরের গামলায় ইট মারলে নিজের গায়েই ছিটকে আসে। এর পর আমার আর কি বলার থাকতে পারে, তুমিই বলো।'

আমি গুম মেরে কিছুক্ষণ বসে থাকার পর বললুম, 'মাস্টারমশাই আপনি বাড়ি যান। দেখি আমি কি করতে পারি।'

কমিশনারকে আবার ডেকে পাঠালুম, কাগজটা সামনে ফেলে দিয়ে বললুম, 'দেখেছেন খবরটা ?'

এক নজরে খবরটা দেখে নিয়ে বললেন, 'হ্যাঁ, কি হয়েছে ? নাথিং নিউ।'

'কিছু করা যাবে না ?'

'এ তো একটা। এই রকম শত শত ঘটনা ঘটছে। কটা রিপোর্টেড হয় ? কাগজ এ সব ফলাও করে লেখে লোকে পড়তে মজা পায় বলে। এ আগেও হত। এখনও হয়। ভবিষ্যতেও হবে। এ সব মহাভারতের কাল থেকেই ভারতে হয়ে আসছে।'

'আবার মহাভারত ?'

'হ্যাঁ মহাভারত। ওইটাই তো আমাদের জেনুইন, অথেণ্টিক হিস্ট্রি। যদু-বংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর মহাতেজা অর্জুন বৃষ্ণি বংশীয় শোকার্ত রমণীদের নিয়ে দ্বারকা থেকে ফিরছেন। অনেকদিন চলার পর তাঁরা এসে হাজির হলেন পঞ্চ-নদ দেশে। পঞ্চনদের শস্যসমৃদ্ধ একটি অঞ্চলে অর্জুন সেই রমণীকুলকে নিয়ে তাঁবু ফেললেন। বিশ্রাম করবেন। আর ওদিকে কি হল, একদল যুবক মহাভারতকার যাদের দস্যু বলেছেন, তাদের নোলায় জল এসে গেল। গাদা গাদা সুন্দরী বিধবা আর তাদের রক্ষক হল একজন মাত্র পুরুষ। তারা সেই তাঁবুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সুন্দরীদের হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে যে যেদিকে পারল ছুটলো। অর্জুন কাকে আটকাবেন। সেই কবে কুরুক্ষেত্র হয়ে গেছে। ধনুর্বিদ্যা ভুলে বসে আছেন। বিশাল গাণ্ডীবে গুণ পরাতেই দম বেরিয়ে যাবার অবস্থা। যাই হোক গুণ পরাতে পরাতেই তাঁর তর্জনগর্জন চলেছে, রে অধার্মিক পাপিষ্ঠ, যদি বাঁচার সাধ থাকে, তবে ব্যাটারা পালা তা না হলে এখনই বাণ মেরে সব ছিন্ন ভিন্ন করে দোবো। মুখে বলছেন বটে ওদিকে গুণ

পরাতে গিয়েই বুঝতে পেরেছেন খুন্ধ করার দম আর নেই। অস্ত্রশস্ত্রের কথা চিন্তা করার চেষ্টা করলেন, সব ভুলে মেরে দিয়েছেন। বাণের পর বাণ চালালেন। সবই ভোঁতা। লক্ষ্যেরও ঠিক নেই। অর্জুনের চোখের সামনে দস্যুরা মেয়েদের টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল। তারপর কি করলে, সে তো আপনি রোজ কাগজেই দেখছেন।

'অনেক দিন পরে বীর অর্জুন গেছেন সত্যনিষ্ঠ বেদব্যাসের আশ্রমে, অর্থাৎ মহাভারতকারের কাছে। পঞ্চনদ দেশের সেই ঘটনা তখন দগদগে ঘায়ের মতো হয়ে আছে মনে। ম্লান বিষণ্ণ অর্জুনকে দেখে ব্যাসদেব, প্রশ্ন করলেন, হে পৃথানন্দন, তোমার কি হয়েছে বাবা। তোমাকে এমন শ্রীহীন দেখছি কেন? অর্জুন তখন সব বললেন। আমি কুরুক্ষেত্রের অমিততেজা বীর অর্জুন, আমার চোখের সামনে বিধবারমণীদের ওপর বলাৎকার। আমার মৃত্যুই এখন শ্রেয়। ব্যাসদেব বললেন, আরে অর্জুন তুমি ভেতরের রহস্যটা জান না? তোমার বীরত্ব কমেনি। আসল ব্যাপারটা হল, ওই স্ত্রীগণ পূর্ব জন্মে অপ্সরা ছিলেন। অষ্টাবক্র মুনির রূপ দেখে উপহাস করেছিলেন। মুনি শাপ দিয়ে বলেছিলেন, তোমরা মানবী হয়ে জন্মাবে, দস্যুদের দ্বারা ধর্ষিতা হয়ে উদ্ধার পাবে। ওই শাপের ফলেই তোমার বল কমে গিয়েছিল।

এইবার প্রেজেণ্ট কণ্টেকস্টে চলে আসুন। ওই সব চোলাই খেকো, সাট্টা প্লেয়াররা হল অষ্টাবক্র মুনি। তাদের উপহাস করেছেন অপ্সরা। ফল এ জন্মেই মিলেছে। ধর্ষিতা। উদ্ধার।'

'ওদের আপনি অষ্টাবক্র মুনির সঙ্গে তুলনা করছেন?'

'বাঃ, অ্যাডভানসড থিওরিটা কি? স্বামীজী বলে গেছেন, বহুরূপে সম্মুখে তোমার। সবাই ঈশ্বর।'

'আরে মশাই আমার মাস্টারমশায়ের স্কুলে-পড়া নাতনী। মহাভারত না আওড়ে কালপ্রিটদের ধরার ব্যবস্থা করুন। লোক্যাল থানা ডায়েরি নেয়নি।'

'নেবে না তো। এসব কেসকে আমরা মনে করি সভ্যতার অগ্রগতি। আমেরিকায় সেকেণ্ডে একটা করে রেপ হয়।'

'আমেরিকার খারাপটা নিলেন। আমেরিকা ভালোটি চোখে পড়ল না? তারা যে চাঁদে চলে গেল!'

'পয়সা থাকলে হিল্লি দিল্লি মানুষ অনেক জায়গায় যেতে পারে। দিন না আমাকে একটা রকেটে ভরে। দেখুন না, আমিও চাঁদে চলে গেছি।'

'এ কেসটার আপনারা কিছু করতে পারবেন না তাহলে ?'

'ব্রাহ্মণের ছেলে কেন মিথ্যে কথা বলবো, এসব কেসে কিছু করা যায় না। কেন যায় না শুনবেন, প্রথম হল পলিটিক্যাল ইনফ্লুয়েন্স। দ্বিতীয় হল, সাক্ষী পাওয়া যায় না। কে সাক্ষী দেবে? কেউ দেবে না। সকলেরই প্রাণের ভয় আছে। ওই যে মনে আছে, বেশ কিছুকাল আগে একটা ছেলে অন্ধকারে একটা মেয়ের গায়ে অ্যাসিড ঢেলে দিয়েছিল। মেয়েটা পুড়ে মারা গেল। কি হল? সাক্ষীর অভাবে দুষ্কৃতকারীরা ছাড়া পেয়ে গেল। ওদিকে দেখুন অত বড় একটা কেসে পুত্রবধূকে মেরে বিছানায় মুড়ে খাটের তলায় রেখে দিয়েছিল। কেস চলে চলে ফাঁসির হুকুম হল। আপিলে সুপ্রিমকোর্ট বললেন, কেউ তো মারতে দেখেনি। যাবজ্জীবন হয়ে গেল। ওই যে আর এক পুত্রবধূ, লস্যির সঙ্গে পারা। কি হল। হয় না, বুঝেছেন, অপরাধ প্রমাণ করা যায় না। অসম্ভব। তবে আপনি এই কেসে ইন্টারেস্টেড। আমরা সাধারণত যা করি, তাই করবো। একটা নিরীহ ছেলেকে পাড়া থেকে তুলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে দোবো। আধমরা করে সারা জীবনের মতো পঙ্গু করে দোবো।'

'আপনারা ওই সাট্টা আর চোলাইয়ের ডেনগুলো ভেঙে দিন না। সেটা তো পারেন।'

'ওসব লাইনে কেন ভাবছেন? ডেস্ট্রাকটিভ লাইনে? কিছু ছেলে করে খাচ্ছে, সহ্য হচ্ছে না আপনার? পারবেন বেকারদের চাকরি দিতে? পারবেন না। কলকারখানা, মিলফিল সব বন্ধ। জানেন তো দিনকাল খুব খারাপ। বেশি ঠ্যাণ্ডাঠেঙি করতে গেলেই মেহতা কেস। নিশ্চয় ভোলা সম্ভব হয়নি আপনারাও। কিভাবে ভদ্রলোককে মেরেছিল? আমি মাঝে মাঝে রাতে ভাবি, আর দুঃস্বপ্নে আঁতকে আঁতকে উঠি। আমি সেই ডেডবডি দেখেছিলুম। উঃ, সে দৃশ্য ভাবা যায় না। চোখ দুটো জ্যান্ত অবস্থায় খাবলে তুলে নিয়েছে। একটা একটা করে হাত কেটে নিয়েছে। শেষ বোধ হয় পুরুষাঙ্গ। না আমি উঠি।'

'উঠি কি? এই কেসটার একটা কিছু করতেই হবে।'

'কি করব? কিছু করার নেই।'

'আমি দেখছি, আপনার জন্যেই আমার মন্ত্রীসভা ভেঙে যাবে।'

'শুনুন এই রাজ্যে কি কি আপনি বন্ধ করতে পারবেন না বলুন তো, চোলাই, সাট্টা, জুয়া, ছিনতাই, রেপ, ডাকাতি, ওয়াগন ব্রেকিং, মাল পাচার,

কয়লা চুরি, ভেজাল, ছাত্রবিক্ষোভ, শিক্ষক ধর্মঘট, কলকারখানা বন্ধ, মিছিল, টিকেটলেস ট্র্যাভেলিং, দেহ ব্যবসা, মদ্যপান, দলীয় সংঘর্ষ, ফুটপাথ দখল, যত্রতত্র খোঁড়াখুঁড়ি। আরও সব আছে, আমার মনে পড়ছে না। এই কয়েকটা ব্যাপারে মাথা না ঘামিয়ে দেশ সেবা চালিয়ে যান।'

'আমি হাঁ করে বসে রইলুম। ভদ্রলোক চলে গেলেন। পি এ এসে বললেন, 'টেলিভিসান এসেছে।'

'টেলিভিসান কি করব আমি। এই ঘরে টেলিভিসান ঢোকাবেন না।'

'টেলিভিসান নয়, টেলিভিসানের লোকজন। সামনে বিশাল এক পরব আসছে, সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার জন্যে ছোট্ট একটা ভাষণ দিতে হবে স্যার।'

লটবহর ঘরে ঢুকে পড়ল। টপাটপ চড়া চড়া আলো ফিট করে ফেলল। গলায় একটা স্পিকার ফিট করে দিল। বেশ স্মার্ট একটি ছেলে এদিকে ওদিকে ছোটা-ছুটি করে বেড়াচ্ছে। ক্যামেরায় আর একজন। লম্বা লম্বা চুল। মনে হচ্ছে ক্যামেরার দাড়ি বেরিয়েছে। স্মার্ট ছেলেটি বললে, 'দু একটা কথা বলুন স্যার, আমি একটু অডিওটা টেস্ট করেনি।'

আমি বললুম, 'আজ শুক্রবার। আমার নাম হযবরল। হারাধনের দশটি ছেলে।'

'ব্যাস ব্যাস। অল রাইট। আমি স্যার হাতের ইশারা করলেই শুরু করবেন।'

চড়া আলোয় আমার চোখ ছোট হয়ে আসছে। অথচ দর্শকদের দিকে বড় বড় চোখে তাকাতে হবে। সেইটাই নিয়ম। ছেলেটি হাত নাড়ল। কয়েক সেকেণ্ড আমি কিছু বলতে পারলুম না। ভেতরে ভেতরে ঘাবড়ে গেছি। কি বলতে হয়! শেষে বললুম, 'পশ্চিম বাঙলার জনগণ, আপনাদের কাছে নিবেদন, বড় একটি উৎসব আসছে। উৎসব মানেই আতঙ্ক, যেমন আপনাদের ফুটবল আমাদের কাছে এক আতঙ্ক, পরীক্ষা এক আতঙ্ক। আসন্ন উৎসবে আপনারা দয়া করে শান্ত থাকবেন, কেমন লক্ষ্মী ভাই আমার। সকলকে বুকে টেনে নিন, কাছে টেনে নিন। আমরা এক সংকটের মধ্যে দিয়ে চলেছি। কবেই বা আমাদের সংকট ছিল না? ছেচল্লিশ থেকেই শুরু হয়েছে। এক যায়, তো আর এক আসে। সেই জয় বাংলা কমলো তো এসে গেল আন্ত্রিক। তেলের দাম কমে, তো চিনির দাম বাড়ে। বাস বাড়ে তো রাস্তা কমে। রাস্তা বড় হয় তো পথচলার নিরাপত্তা কমে। যেমন ধরুন বি টি রোড। যেই বিশাল চওড়া

হল রোজ অ্যাকসিডেন্ট। আমরা মানে মন্ত্রীরা বেশ অস্থির হয়ে আছি। কোনওভাবেই কিছু সামলাতে পারছি না। আপনারা ভাই হয়ে ভাইয়ের বুকে ছুরি বসাবেন না। আমাদের এই দেশ রামমোহন রায়ের দেশ, রামকৃষ্ণের দেশ, বিবেকানন্দের দেশ, রবীন্দ্রনাথের দেশ। আমাদের বুঝেসুঝে চলতে হবে ভাই। দয়া করে শান্তি বজায় রাখুন। বেশ আনন্দে সংসারযাত্রা নির্বাহ করুন। আমরা গরিব মানুষ, আমাদের বেশি বাড়াবাড়ি মানায় না। ভগবানের নাম নিয়ে, আল্লার নাম নিয়ে, যীশুর নাম নিয়ে সব ছেলেমেয়ে মানুষ করুন। আমরা মানুষ চাই। মোষের খাটাল চাই না। জয়হিন্দ।'

টিভির ছেলেটি বললে, 'বেশ একটু নতুন ধরনের হল। খোলামেলা। মুখ্যমন্ত্রীরা সাধারণত এইভাবে বলেন না।'

ছেলেটি তারফার গুটিয়ে, লটবহর নিয়ে চলে যেতেই, হঠাৎ নতুন এক চৈতন্যের উদয় হল। এই যে চেয়ার, যে চেয়ারে আমি বসে আছি, এখানে আমার আগে, তার আগে, তারও আগে যাঁরা বসে গেছেন সকলেই ছিলেন মহা মহারথী। তাঁদের দল ছিল, অভিজ্ঞতা ছিল। ওই পথে তো আমার যাবার উপায় নেই। আমি যদি একটা অন্য রাস্তা ধরি। চার্লি চ্যাপলিন, পিটার সেলার, ড্যানি কে? কেমন হয়। ভাঁড়কে লোকে পছন্দ করে। যেমন পছন্দ করে অভিনেতাকে। অমিতাভ বচ্চন, সুনীল ডাট, বৈজয়ন্তীমালা। উত্তমকুমার বেঁচে থাকলে অবশ্যই একালের হিড়িকে মুখ্যমন্ত্রী হতেন।

পি এস কে ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, আমি কি একা একা বাইরে একটু বেড়িয়ে আসতে পারি? মাথাটা জ্যাম হয়ে গেছে।'

'পাগল হয়েছেন স্যার। কোনওদিন দেখেছেন লোমওলা ফুটফুটে বিলিতি কুকুর নেড়ি কুকুরের মতো একা একা রাস্তায় ঘুরছে। এইটুকু স্যাক্রিফাইস আপনাকে করতেই হবে। আপনি হলেন চেনে বাঁধা ভি আই পি।'

কর্মীদের প্রতিনিধিরা এই সময় হুই হুই করে ঢুকে পড়লেন। বেশ একটু রাগ রাগ মুখ। আমি বলার আগেই যে যার চেয়ারে বসে পড়লেন। নেতা কোনও ভূমিকা না করেই বললেন, 'আমাদের মাইনে বাড়াতে হবে।'

মাইনে বাড়াতে হবে মানে? সরকারী কর্মচারীদের মাইনে বাড়ে না কি? পশ্চিমবঙ্গ সরকারে মাইনে বাড়ে না। সরকারী চাকরি তো ঠিক চাকরি নয়, দেশ সেবা।'

'দেখুন ওসব তাপ্পি আমরা আর শুনছি না। দ্রব্যমূল্য সাংঘাতিক বেড়ে

গেছে। আমাদের সংসার চলছে না।'

'স্বার্থপরের মতো, আপনারা শুধু আপনাদের কথাই ভাবছেন, দেশের সাধারণ মানুষের কথা ভাবুন, যাদের কোনও স্থায়ী রোজগার নেই। মাসে হয় তো একশো কি দেড়শো টাকা রোজগার করে। দু'বেলা মোটা ডালভাতই জোটাতে পারে না। তাদের কথা ভাবার সময় এসেছে।'

'বাঃ, আপনি দেখছি বেশ তৈরি হয়ে গেছেন। সেই পুরনো সুর। পুরনো কথা।'

'কই আপনারা তো আগের মিনিষ্ট্রিতে একটাও কথা বলেননি। বেশ শান্ত ছিলেন।'

'সে ছিল আমাদের মিনিস্ট্রি। একটু আগে আপনি আমাদের ভয় দেখিয়েছেন। আমাদের আন্দোলনের পথে ঠেলে দেবেন না। তা হলে কিন্তু সব অচল হয়ে যাবে।'

'যায় যাবে। আমার কাঁচকলা।'

'আপনি তাহলে লড়াইয়ের পথ বেছে নিলেন।'

'অফকোর্স। আপনারাই তো আমাকে শিখিয়েছেন। আপনাদের মিছিল আমি দেখেছি। চিৎকার করতে করতে চলেছেন, লড়াই, লড়াই, লড়াই লড়াই। এ লড়াই বাঁচার লড়াই।'

সেন শর্মা সোনার চশমা পরে এসেছেন। গায়ে বিলিতি গন্ধ। আমি আছি। আমার ক্যাবিনেটের আরও কয়েকজন আছেন। পুরো ক্যাবিনেটটা নেই। বেশ কিছু কিছু সদস্য ক্ষমতার আরকে বেগোড়বাঁই হয়ে গেছে। আত্মীয়স্বজনদের বাড়িতে বাড়িতে ফাট দেখিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। ক্রীড়ামন্ত্রী এসে দুঃখ করছিল, 'আমার বউ দুম করে লালবাজার থেকে এক টুকরো মার্বেল পাথরে আমার নাম খোদাই করে এনেছে, তলায় লেখা, ক্রীড়ামন্ত্রী, পশ্চিমবঙ্গ। যখন ঝোঁকের মাথায় করাতে দিয়েছিল, তখন খেয়াল ছিল না লাগাবে কোথায়। এখন বিপদে পড়ে

গেছে। আমার তো নিজের বাড়ি নেই। শেষে মিস্ত্রি ডাকিয়ে আমাদের শোবার ঘরের বাইরের দেয়ালে লাগিয়েছে। ব্যাপারটা একটু হাস্যকরই হয়ে গেল। তা আর কি করা যাবে! আপনি আমাকে এমন এক বিভাগ দিলেন, পাঁচ বছর কেন, পনের বছরেও বাড়ি করা যাবে কি না সন্দেহ। আবগারি বিভাগটা আমাকে দিন না। তবু দুটো পয়সার মুখ দেখা যেত। আমি কথা দিচ্ছি, ওই বিভাগটা আমার হাতে দিলে, আমি জনগণের অ্যায়সা সেবা করবো যে সকাল সন্ধে কেউ আর উঠতে পারবে না। সবাই গড়াগড়ি যাবে। ঘরে ঘরে আমি চোলাই যন্ত্র চালু করে দোবো। পাড়ায় পাড়ায় ভাটিখানা। মোড়ে মোড়ে বিয়ার পাব। একবিংশ শতাব্দীতে চা আমি অচল করে দোবো।'

আমি কিছুটা অবাক হয়ে তাকিয়েছিলুম। রোগে ধরেছে। টাকা-ব্যামো। আমাদের অবশ্য ঘরে ঘরে জিমনাসিয়াম করার একটা পরিকল্পনা আছে। প্রত্যেক বাড়িতে ফ্রি একসেট ডাম্বেল, বারবেল, আর রোমান রিং দেওয়া হবে। লাফাবার দড়ি। প্রত্যেকে প্রত্যেকের শরীরের দিকে নজর দিলে অন্যের দিকে নজর দেবার আর সময় পাবে না। দেহনেশায় সব বুঁদ হয়ে থাকবে। সংশয়ের একটা প্রশ্নই উঠেছে, বধূনির্যাতন বাড়বে কি না! ডাম্বেল দিয়ে দাঁতের গোড়া ভাঙলো, কি রোমান রিং-এ দুটো পা গলিয়ে দিয়ে বউকে ঝুলিয়ে রেখে কীর্তন শুরু করল, ও বউ তোর বাপের কাছ থেকে আরও দশ হাজার নিয়ে আয়। স্বামী গাইবে আখর দিয়ে, সখি গো, তোর এ কষ্ট সয় না প্রাণে, নিয়ে আয় নিয়ে আয়, সোনাদানা যা পারিস নিয়ে আয়, নিয়ে আয়।

সেনশর্মা বললেন, 'মনে করুন, আপনারা একটা ম্যাগাজিন। টকিং ম্যাগাজিন। এটা তো ঠিক, কথা বলা ছাড়া আপনাদের আর কোনও কাজ নেই। পাঁচটা বছর চুটিয়ে কথা বলে যাবেন। তেড়ে বক্তৃতা দিয়ে যাবেন। একটা ম্যাগাজিনের সার্কুলেশান বাড়ে কি ভাবে? বলুন, সবাই ভেবে ভেবে বলুন।'

'ভালো গল্প চাই।'

'হ্যাঁ, ঠিক বলেছেন। ভালো গল্প শোনান দেশের মানুষকে। এই হবে, সেই হবে। হাতি হবে, ঘোড়া হবে। বেকার চাকরি পাবে। মানুষ ভালো খেতে পাবে। পরতে পাবে। ট্রাম পাবে। বাস পাবে। ইচ্ছা পূরণের গল্প শোনান।'

'ধারাবাহিক উপন্যাস চাই।'

'রাইট। তার মানে সব কিছুই ক্রমশ করে রাখা। আগামী সংখ্যায় দেখুন। কোনও কিছু শেষ করবেন না। শেষ বলে দেবেন না। বানিয়ে বানিয়ে চলুন। মোক্ষম এক একটা ইস্যু ধরে তালগোল পাকিয়ে রাখুন। যেমন কেন্দ্র-রাজ্য সম্পর্ক। ধারাবাহিক উপন্যাস। আপনারা আসার আগে একমন্ত্রী ফারাক্কার জল নিয়ে উপন্যাস শুরু করেছিলেন। এদিকে গোর্খাল্যান্ড এক সময় ধারাবাহিক উপন্যাস হয়ে উঠেছিল। ওদিকে পঞ্জাব, শ্রীলঙ্কা।'

'আন্তর্জাতিক রাজনীতি চাই।'

'অফকোর্স চাই। আমেরিকা এই ব্যাপারে আপনাদের অনবরত সাহায্য করবে। থার্ড ওয়ার্ল্ডে যেই নাক গলাবে কলকাতার আমেরিকান সেণ্টারের সামনে বোমা ফাটাবেন। কুশপুত্তলিকা দাহ করবেন। অবশ্য তার আগে ঠিক করে নিন নিজেদের ভেতর, আপনারা রাশিয়ান না আমেরিকান।'

'রাশিয়ান, আমেরিকান মানে? আমরা তো ভারতীয়।'

'ধুস, আমরা আবার কবে ভারতীয় হলুম মশাই। ভারতীয় হলে ভারতের এই অবস্থা হয়। থার্ড ওয়ার্ল্ডের ফাদার হয় রাশিয়া না হয় আমেরিকা। রাশিয়া হওয়াই ভালো। পশ্চিমবাংলার মানুষ রাশিয়াটা ভালো খায়। একটা বিপ্লব বিপ্লব গন্ধ আছে।'

'এরপর কবিতা চাই।'

'কবিতা তো চাইই। শব্দ থাকবে, মানে থাকবে না। খুব নামী এক মুখ্যমন্ত্রী কোনওদিন সেনটেন্স কমপ্লিট করতেন না। সবচেয়ে বড় কবি হলেন সবচেয়ে বড় স্টেটসম্যান, সবচেয়ে বড় স্টেটসম্যান হলেন সবচেয়ে বড় কবি। তিনি সব কিছু কবিতার মতো, লেজঝোলা করে রাখতেন। যে পার বুঝে নাও।'

'একটু সেক্স চাই। একটু ভায়োলেনস চাই।'

'অবশ্যই চাই; তবে নর্ম্যাল সেক্স নয়। পারভারসান। পারভারসান কাকে বলে জানেন?'

'আপনার মুখেই শুনি।'

'হিন্দি ছবি যে-দেশের এত বড় সম্পদ, সে দেশের মানুষকে পারভারসান আর ভায়োলেনস বোঝাতে হবে? ধরুন কেউ নেচে নেচে, কোমর দুলিয়ে দুলিয়ে গান গায়। কোনও মহিলা শিল্পী।। খুব হইচই বাধিয়ে দিল। অপসংস্কৃতি বলে শোরগোল তুলে দিন। বাস! কাজ হয়ে গেল। সমস্ত দেশের দৃষ্টি চলে গেল সেই শিল্পীর দিকে। তাঁর গান নয় তাঁর শরীরটাকে আণ্ডারলাইন

করে দিলেন। এইবার হঠাৎ বললেন, না না, ওটা অপসংস্কৃতি নয়, ভারতীয় সংস্কৃতি। সঙ্গে সঙ্গে মানুষ কাতারে কাতারে ছুটল তাঁর অনুষ্ঠান শুনতে। একে বলে চাঁদে কলঙ্কলেপন টেকনিক। মাঝে মাঝে অশ্লীল সিনেমার বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তুলবেন; কিন্তু বন্ধ করবেন না। সিনেমার পোস্টারে নায়িকার উন্মোচিত বুকে কালো রঙের পোঁচড়া টেনে দেবেন। অতীতে এক সম্পাদক ছিলেন, তিনি এক ঢিলে দুপাখি মারতেন। তাঁর কাগজে আলাদা একটা বিভাগ ছিল, সাহিত্যে অশ্লীলতা। বিভিন্ন কাগজে প্রকাশিত গল্প, উপন্যাসের অশ্লীল অংশ তুলে তুলে দিয়ে মন্তব্য লিখতেন, বাংলা সাহিত্যে আজকাল এই সব অপকর্ম চলেছে। ওই বিভাগটি পড়ার জন্যেই কাগজের কাটতি বেড়ে যেত। খুঁজে খুঁজে হরেক রকম সমস্যা বের করুন। আসল সমস্যা নয়, নকল সমস্যা। সেই সব সমস্যা নিয়ে বিশাল শোরগোল তুলে দিন। দেশকে সব সময় একটা আন্দোলনের অবস্থায় ফেলে রাখুন। মানুষ সুস্থির হলেই মাথা ঘামাবার অবকাশ পেয়ে যাবে। তখনই হিসাব মেলাতে বসে যাবে, কি দেবার কথা ছিল, কি দিলেন, কি দিলেন না। সব ব্যাপারে মানুষকে একেবারে জেরবার করে রাখুন। কারুকে মাথা তুলতে দেবেন না। জানেন তো ইংরিজিতে একটা কথা আছে, গিভ দেম অ্যান ইঞ্চ, দে উইল আস্ক ফর অ্যান এল। যেই এক ইঞ্চি দিলেন, অমনি পরমুহূর্তে চেয়ে বসবে এক বিঘত। মানুষকে প্রথমে একেবারে ল্যাঙটা করে দিন; তারপর এগিয়ে দিন একটা বাঁদিপোতার গামছা। আমার এক রিলেটিভের একবার পকেটমার হয়ে গেল। প্রায় হাজারখানেক টাকা চোট। ভীষণ মন খারাপ। পকেটমারকে গালাগাল দিয়ে ভূত ভাগিয়ে দিলে। হঠাৎ একদিন ডাকে একটা রেলের মাস্থলি এল। পকেটমার মাস্থলিটি ফিরিয়ে দিয়েছে। সেই পকেটমারের প্রশংসায়, সততায় আমার আত্মীয়টি একেবারে পঞ্চমুখ। উচ্ছ্বাসের বশে ভদ্রলোক এমন কথাও বললেন, এইসব মানুষ আছে বলেই দেশটা এখনও তলিয়ে যায়নি।'

'মানুষকে কি ভাবে, কতভাবে জেরবার করা যায়?'

'অনেক উপায় আছে। সপ্তাহে একদিন, দেড়দিন পানীয় জল বন্ধ করে দিন। মানুষকে প্রচণ্ড গরমে শুঁটকি মাছ হতে দিন। থেকে থেকে লোডশেডিং করে দিন: বিশেষ করে ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষার সময়। যানবাহনের সংখ্যা আরও কমিয়ে দিন। চারপাশে ভ্যাট ভ্যাট নর্দমা আর পচা কাদার কেয়ারি করে দিন। মানুষ এক পা এগোতে যেন বাপের নাম ভুলে যায়। রাতে রাস্তায় একবিন্দু

আলো যেন না থাকে। রাস্তার চতুর্দিকে বড় বড় গর্ত খুঁড়ে রাখুন। পাবলিক সার্ভিস শব্দটা ডিকশনারি থেকে মুছে দিন। রাজপথে বিশাল বিশাল জ্যাম তৈরি করুন। পুলিশ আর হোমগার্ডকে এমন ট্রেনিং দিন, একজন বলবে আয়, আর একজন বলবে আসিস না।'

হঠাৎ আমার পি-এ ঘরে ঢুকে পড়ল, 'স্যার ফিনানসের একজন পিওন আপনাদের কি বলতে এসেছে।'

আমাদের এখন জরুরি মিটিং হচ্ছে। আপনার বুদ্ধিশুদ্ধি কি লোপ পেয়ে গেল ?'

'ব্যাপারটা খুব সাংঘাতিক।'

'নিয়ে আসুন।'

বোকাবোকা চেহারার একটি লোক ঘরে ঢুকে বললে, 'আপনাদের এক মন্ত্রী একটা গর্তে পড়ে আছে।'

'গর্তে পড়ে আছে ? মন্ত্রী কি ইঁদুর। বাজে কথা বলার জায়গা পাওনি ?'

'মাইরি বলছি। মা কালীর দিব্যি।'

'এ কে রে ? দিব্যিটিব্যি করছে। কোন মন্ত্রী ?'

'তা বলতে পারবো না, আপনারা তো সব নতুন। চেহারাটা মোটা মতন। চোখে চশমা।'

'অ্যাঁ, সে তাহলে আমাদের পূর্তমন্ত্রী। মরেছে, গর্তটর্ত দেখতে গিয়ে পা সিলিপ করে পড়ে গেছে।'

'না না সিলিপ করে নিজে থেকে পড়েনি। পাবলিক ফেলে দিয়ে ঘিরে রেখেছে। সে খুব তামাশা হচ্ছে। স্যার যেই ওঠার চেষ্টা করছেন, পাবলিকে পেঁদিয়ে ফেরত পাঠিয়ে দিচ্ছে।'

আমারও এক সময় খুব মাইরি বলার অভ্যাস ছিল। রকে বসেছি, চায়ের দোকানে বসেছি, আলুর চপ খেয়েছি। মুখ ফসকে বেরিয়ে গেল, 'মাইরি।' পরে সামলে নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সুলভ একটা হুংকার ছাড়লুম, 'অ্যায়, একে বের করে দাও। লোকটা কথা বলতে শেখেনি।'

লোকটি অবাক হয়ে বললে, 'জনগণ এইভাবেই কথা বলে, আর আপনারা তো জনগণেরই সরকার।'

'না, আমরা জনগণের সরকার নই।'

লোকটি তবু বললে, 'বাঃ মাইরি।'

চলে যাচ্ছিল, ডেকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কোন রাস্তায় পড়ে আছে।'

'ওয়াগর লেনে।'

ওখানে কি করতে গিয়ে মরেছে কে জানে! মরার আর জায়গা পেলে না। পি-এ-কে বললুম, 'ফায়ার সার্ভিসের ডিরেক্টার।', সঙ্গে সঙ্গে লাইনে ভদ্রলোক এসে গেলেন, প্রথমে তো বুঝতেই পারেন না। কেবল বলেন, গর্তে মোষ পড়েছে তো কি হয়েছে স্যার। ও খাটালের লোকেরা দড়িটড়ি বেঁধে চাগাড় দিয়ে তুলে নেবে।

এক দাবড়ানি দিয়ে বললুম, 'ধুর মশাই, কানের মাথা খেয়েছেন। গর্তে মোষ নয় মন্ত্রী পড়েছেন। আপনাদের পূর্তমন্ত্রী।' ভদ্রলোক আপেক্ষ করে বললেন, 'এই সব নতুন নতুন মন্ত্রী হয়েছেন। ভালো করে হাঁটতে শেখেন নি। কলকাতায় পথচলা কি অতই সহজ রে বাবা! তেনজিং নোরগের মতো লোক আসতে ভয় পেত।'

আমাদের ক্যাবিনেট ভেঙে গেল। আমার কোলিগরা বললেন, 'চলুন স্যার, আমরা সবাই একবার যাই।'

'মন্ত্রী গর্তে পড়লে মুখ্যমন্ত্রীরা আগে কখনও গেছেন? নজির দেখাতে পারবেন?'

'কি আশ্চর্য! আগে কোনও মন্ত্রী তো গর্তে পড়েন নি এভাবে। দিস ইজ দি ফার্স্ট কেস। নজির থাকবেটা কি করে! একবার এক মন্ত্রীর কানটা, বস্তির এক মেয়ে কামড়ে ছিঁড়ে নেবার চেষ্টা করেছিল। তাও সবটা পারেনি। আর বয়স্কা মহিলারা মুড়ো ঝাঁটা জলে ভিজিয়ে সপাসপ মেরেছিল। মন্ত্রী প্রথমে রেগে গিয়েছিলেন। তারপর খুব খুশি হয়েছিলেন।

'খুশি হয়েছিলেন কেন?'

'এই যে নিরক্ষর স্বাক্ষর হয়েছে। বিদ্যাসাগর মশাইয়ের দ্বিতীয়ভাগ পড়েছে বলেই না ভুবনের মতো মাসির কান কামড়েছে। খালি লিঙ্গ জ্ঞানটা ছিল না। তারপরেই তো বিদ্যাসাগর পুরস্কার চালু হল!'

'এই ঘটনার পর আমরা কি পুরস্কার চালু করবো?'

'বাবা বৈদ্যনাথ পুরস্কার। বৈদ্যনাথ-ধামে গিয়ে দেখবেন শিবলিঙ্গ মাটির ভেতর রাবণরাজার থাবড়া খেয়ে দশ হাত ঢুকে গেছেন। আমরা বৈদ্যনাথ পুস্কার চালু করতে পারি। এপিকধর্মী উপন্যাসের জন্যে।'

'এপিক। এপিক লেখার মতো সাহিত্যিক বাংলা সাহিত্যে আছে? ওই তো

সব সাহিত্যের ছিরি। বড় গল্পকে টেনে বাড়িয়ে উপন্যাস বলে চালায়। এপিক লেখার মতো সব কবীজ্র জোর আছে না কি।'

'আমরা বেদব্যাসকে পস্থ্যুমাস অ্যাওয়ার্ড দিয়ে স্টার্ট করবো।'

'হ্যাঁ, তা অবশ্য করতে পারি। একটা ভাল উদাহরণ হয়ে থাকবে। প্রবলেম হল পুরস্কারটা নেবে কে?'

'কেন? আমরা তাঁর বংশধরকে খুঁজে বের করব। বংশ লোপাট হয়ে যায়নি তো!'

আমি সেনশর্মার দিকে তাকিয়ে বললুম, 'কি মশাই! আপনাদের মর্ডান ম্যানেজমেণ্ট টেকনিকে একেই তো বলে ব্রেন-স্টর্মিং। মাথা থেকে কিরকম সব বেরোচ্ছে। মণিমাণিক্য। এরপর আমরা বাল্মীকিকে। তারপর শ্রীকৃষ্ণকে গীতা লেখার জন্যে বৈদ্যনাথ পুরস্কার দোবো। একটা বৈপ্লবিক ব্যাপার করে ছাড়বো।'

সেক্রেটারি কানে কানে বললে, 'স্যার পূর্তমন্ত্রী গর্তে পড়ে আছেন।'

ওঁয়া ওঁয়া করে আমার গাড়ি ছুটলো। গাড়িতে আমার পাশে বসেছিলেন পুরমন্ত্রী। জিজ্ঞেস করলুম, 'এই শহরের মেয়র কোথায়?'

'তাঁর তো সুইজারল্যাণ্ড থেকে ফিরে এসেই ম্যালিগন্যাণ্ট ম্যালেরিয়া হয়েছে।'

'সুইজারল্যাণ্ড গিয়েছিলেন কেন?'

'শহর কি করে সাজাতে হয় দেখার জন্য।'

'নিজের পয়সায়?'

'না না, পাবলিকের পয়সায়।'

'বেশ আছে সব।'

'না না, ও বলবেন না। এরপর তো আমাকেও যেতে হবে।'

কোথায় যাবেন?'

'এই তো সামনের মাসে আমি ইওরোপের সব কটা বড় বড় শহর ঘুরে ঘুরে দেখবো।'

'কি দেখবেন?'

'ইউরিন্যাল। কলকাতার পেচ্ছাপ সমস্যার একটা পজেটিভ সমাধান চাই। সেদিন কাগজে চিঠিপত্র বিভাগে সব চিঠি লিখেছে মেয়েরা। দামড়ারা অসভ্যের মতো চৌরঙ্গী ফ্লাড করে দিচ্ছে।'

'পাঁচ আইনে কয়েকটাকে তো প্যাঁচ মারলেই হয়। এই সামান্য কারণে সাধারণের অর্থে ইওরোপ!'

'আপনি তো নেগেটিভ সলিউশনের কথা বলছেন। পজেটিভ সলিউশান হল, করো। যত খুশি, যেখানে খুশি করো, কিন্তু জনগণমন্ত্র ধারনের জন্যে প্রশাসন পিছপা নয়। চ্যালেঞ্জ। প্রয়োজন হলে মন্ত্রমন্ত্রীর পদ তৈরি হবে।'

'সলিউশানটা কি?'

'সেইটাই তো শিখে আসবো। ধরুন, এমন কোনও ইলেকট্রনিক সিস্টেম, যেখানেই করুন একটা ইলেকট্রনিক চোঙা মাটি ফুঁড়ে বেড়িয়ে এসে সামনে দুলবে আর বিপবিপ শব্দ করবে।'

'মাথাটা গেছে। তা ইলেকট্রনিক্সের কথা যখন ভাবছেন, তখন ইলেকট্রনিক্সের দেশ জাপানে যান।'

'ইওরোপে যাবার আর একটা কারণও আছে, যদি আবর্জনাভুক কোনও প্রাণীর সন্ধান পাই।'

'মানে? সে আবার কি?'

'কিছু মনে করবেন না স্যার! আপনার জেনারেল নলেজ থোড়া কম আছে। আমি সব বিদেশী ম্যাগাজিনউগ্যাজিন পড়ি। জাপানে এক ধরনের ব্যাকটিরিয়া আবিষ্কার হয়েছে, যারা পেট্রোলিয়াম জেলি খায়। পেট্রোলিয়াম জেলিতে খুব প্রোটিন থাকে। সেই প্রোটিন খেয়ে ব্যাকটিরিয়াগুলোও সব মোটামোটা প্রোটিনের দানা হয়ে যায়। প্রথমে জাপান ভেবেছিল ওই প্রেট্রো প্রোটিন মানুষকে খাওয়াবে। কিন্তু ভীষণ গন্ধ। তখন করলে কি সীলমাছকে খাওয়াতে লাগল। সেই প্রোটিন খেয়ে সীলগুলো সব হয়ে গেল হাতির মতো এইবার সেই হাতীসীল খেয়ে জাপানি ছেলেমেয়েরা ফুটবল। জানেন তো, নেসাসিটি ইজ দি মাদার অফ ইনভেনসান। আবার, হোয়ার দেয়ার ইজ এ উইল, দেয়ার ইজ এ ওয়ে। উইপোকা কাঠ খায়। পঙ্গপাল ফসল খায়। পিপীলিকাভুক পিপীলিকা খায়, ব্যাঙ মশা খায়, সাপে ব্যাঙ খায়, বেজিতে সাপ খায়...'

'বাস, বাস, বাঘে মানুষ খায়। বাঘকে কে খায়!'

'আপনি রেগে যাবেন না। বায়োলজি দিয়ে আজকাল কেলেঙ্কারি করে ছেড়ে দিচ্ছে। আমি বায়োজেনেসিস নিয়ে একটু ঘাটাঘাটি করবো। তারপর বায়োমের সন্ধান করবো। এমন কোনও প্রাণী অবশ্যই আছে যারা হাঁউহাঁউ করে আবর্জনা খায়। শকুন হল পাখি। আমি চাই চতুষ্পদ, আর ফাস্টইটার। নিমেষে

মনুমেন্টের তলার ভাগাড় খেয়ে ফেলবে। দু'ঘণ্টায় কলেজ স্ট্রিট, মেছো বাজার সাফ। বায়োডিগ্রেডেবল খুঁজবো। বায়োডেস্ট্রাকটিবল। আমার মাথায় নানা পরিকল্পনা একেবারে সুতলির মতো জট পাকিয়ে আসে। পাঁকের মতো ভ্যাড়ভ্যাড় করছে। ইয়োরোপের মাটিতে প্লেন যেই টাচডাউন করবে, ছুটে বেরিয়ে যাবো। ধরধর করে ছুটবো। পরিকল্পনা ধর। বিজ্ঞানী ধর। আর সেই সঙ্গে মোড়ে মোড়ে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা। পশ্চিমবাংলার ইমেজ তৈরি করব।'

'দুটো জিনিস ভুল করলেন।'

'এখন ভুলে গেলেও, ওখানে গিয়ে মনে পড়ে যাবে। জলবায়ুর একটা গুণ আছে তো! এই ভ্যাপসা ভাদ্দরের গরম তো সেখানে নেই।'

'দুটো জিনিস, এখান থেকেই মনে রেখে যেতে হবে। এক, আপনি সে দেশের ভাষা জানেন না···!'

'আমি দোভাষী নেবো।'

'দুই, আপনি কেন্দ্রীয় মন্ত্রী নন। রাজ্যমন্ত্রী। পশ্চিমবাংলার বিদেশে কোনও ইমেজ হয় না। ইমেজ হল ভারতের।'

'ইমেজ তো কারুর মনোপলি হতে পারে না। আমি পশ্চিমবাংলার ইমেজই বাড়িয়ে আসবো। কবিতা দিয়ে শুরু করবো, ইচ অ্যান্ড এভরি বক্তৃতা, বাম হাতে যার কমলার ফুল, ডাহিনে মধুকমালা, ভালে কাঞ্চন শৃঙ্গমুকুট, কিরণে ভুবন আলা।'

'আমার মনে হচ্ছে আপনার হয়তো ভুল হচ্ছে। ডান হাতে যার···।'

'আপনি আমার ফাইলটা। বিদেশ যাবার ফাইলটা সই করে ছেড়ে দিন, হাতপা আমি সব ঠিক করে নেবো। কতকাল আগের পড়া। সাংঘাতিক মেমারি বলে এখনও মনে আছে।'

আমার গাড়ির পেছনে ঘণ্টা বাজিয়ে দমকল আসছে। আমার গাড়ি চলেছে রাস্তার মাঝখান দিয়ে। সামনে পুলিশ পাইলটের ও'য়া ও'য়া। ফায়ার ব্রিগেড আসছে ঝড়ের বেগে। চেষ্টা করছে আমাদের ওভারটেক করতে। সাধারণ মানুষের গাড়ি হলে রাস্তার একেবারে বাঁ ধারে সরে যেতে হত। ফায়ার ব্রিগেড আর অ্যাম্বুলেন্স সবার আগে যাবে। সেইটাই নিয়ম।' আমার ড্রাইভারকে বললুম ; বাঁদিকে পাশ করে, ফায়ার ব্রিগেডকে যেতে দাও।'

'আপনার কথায় হবে না স্যার। পাইলট আমাকে যে ভাবে চালাবে আমি সেই ভাবে চলব।'

'আরে মূর্খ ওটা দমকল। দমকল সবার আগে যায়।'

'আমি মূর্খ হতে পারি স্যার ; কিন্তু আপনি হলেন মূর্খমন্ত্রী।'

মূর্খ বললে না মুখ্যই বললে কে জানে! বেশি ঘাঁটাবার সাহস হল না। মুখ্য বলে 'দমকলের প্রবল ঘণ্টাখানির বিরাম নেই। আসলে দমকলের ঘণ্টা যে বাজায় তার পুরোহিতের মত অভ্যাস। অক্লেশে, না থেমে নেড়ে যায়। বেশ বুঝতে পারছি, ভীষণ একটা প্রশাসনিক জটিলতা দেখা দিয়েছে। দমকল আগে যাবে, না মুখ্যমন্ত্রী। এখন গাড়ি থামিয়ে ম্যানুয়াল দেখতে পারলে ভালো হয়। সামনে দেখতে পাচ্ছি আমার পুলিশ পাইলট মনের আনন্দে ভরর ভরর চলেছে। তারও ও'য়া ও'য়া অভ্যাস। এই হয় তো করে আসছে গত দশ বছর। আমিও অসহায়। গাড়িও আমার নয়, ড্রাইভারও আমার নয়। তবু বললুম, 'বাঁ দিক করো।'

'ড্রাইভার বললে, 'আপনার কথা শুনে এই বাজারে চাকরিটা খোয়াতে চাই না স্যার।'

এই রকম পরিস্থিতিতে যে যত দরেরই মানুষ হোক, তার বলা উচিত, লে হালুয়া।'

যাক, আমরা ওস্তাগর লেনে এসে গেলুম। বেশ বুঝতে পারছি, এরই মধ্যে আমার ভেতর বেশ একটা অহংকারের ভাব এসে গেছে। গাড়ি থেকে নামতেই ইচ্ছে করছে না। যতই হোক আমি একটা মুখ্যমন্ত্রী। এইসব ছোটখাটো ব্যাপারে আমার কি আসা উচিত।

ব্যাপারটা যত ছোট ভেবেছিলুম তত ছোট নয়। মাইক লাগিয়েছে। কান ফাটানো সুরে গান বাজছে, 'দিল তোড়ো না।'

একটা বাচ্চার কি আনন্দ। সে বলছে, একটা মোটামতো লোককে, গাড্ডায় ফেলে মুস্তাফিরা খুব রগড়াচ্ছে। লোকটা না আপন মনে বসে বসে চুরুট খাচ্ছে। একটা ল্যাবা মতো লোক।' একালের ছেলে। তার হাবভাব কথাবার্তাই অন্য-রকম। কোথা থেকে একটা ফেরিওলা এসে গেছে। তার লাঠির মাথায় বাঁধা, লাল হলুদ ফিতে। ঝুলছে সেফটিপিনের পাতা, কাপড় শুকোতে দেবার ক্লিপ। হজমিওলা এসে গেছে। মাঝে মাঝে চেল্লাচ্ছে, 'হজমাহজম'। ওদিকে গান পালটে গেছে, 'হালুয়াবালা আ গয়া।' আমাকে বলছে না কি। মনে হচ্ছে উৎসব। রামনবমী কি তালনবমী। যা হয় একটা কিছু।

ওস্তাগর লেনকে আর রাস্তা বলা যায় না। বাঁ দিকে বিশাল একখানা খুঁড়ে

রেখেছে। সমস্ত মাটি ডান দিকে তুলে পাহাড়। বাঁ দিকের বাড়ির সামনে সামনে একফালি কাঠ পাতা। সেই কাঠের ওপর দিয়ে হেঁটে এসে পাহাড়ে উঠে স্লিপ খেতে খেতে বড় রাস্তায় আসতে হবে। আর ডান দিকের বাড়ি থেকে যারা বেরোবে তারা ওই মাটির পাহাড় বাড়ির দেয়াল আর প্রাচীন নর্দমার মাঝখানে মহাপ্রস্থানের পথের মতো একফালি সঁাড়ি পথ পাবে। সেই পথের জায়গায় জায়গায় আবার বাঙালির বড় আদরের আঁস্তাকুড়। সেই আঁস্তাকুড়ের একটার ওপর কে আবার নির্লজ্জের মতো একটি ব্যবহার করা স্যানিটারি ন্যাপকিন ফেলে গেছে।

রাস্তার মুখে ঢিবিটার মাথায় উঠে আমি সব দেখছি। ভেতরে ঢোকার উপায় নেই। মেয়ে মদ্দ সব মজা দেখছে। পুলিস, ফায়ার ব্রিগেড সব থমকে দাঁড়িয়ে আছে। মানুষের ফাঁকে ফাঁকে দেখতে পাচ্ছি, অনেক দূরে গর্তের মধ্যে, সাদা মতো কি একটা প্রাণী নড়াচড়া করছে। আমার সামনে দুজন দাঁড়িয়েছিল, সভাসমিতিতে যাদের আমরা খুব খাতির করে বলি, বন্ধুগণ। একজন আর একজনকে দেখাচ্ছে, 'ওই দ্যাখ মন্ত্রী বটেক।' আমার ভীষণ রাগ হল। গত চল্লিশ বছরে মন্ত্রীদের মানসম্মান কোথায় নেমে এসেছে।

আমার পাশে কমিশনার, ওপাশে ফায়ার সার্ভিসের ডিরেক্টার। ডিরেক্টারকে বললুম, 'দাঁড়িয়ে না থেকে দড়ি ফেলে পাতকো থেকে বালতি তোলার মতো করে ওই ব্যারেলটাকে তুলুন।' আমার রাগে গা জ্বলে যাচেছ। আমাকে একেবারে বেইজ্জত করে ছেড়ে দিলে। কাতারে কাতারে লোক রাস্তায় দাঁড়িয়ে দেখছে। ঝুল বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখছে। আমি দেখছি এই পূর্তমন্ত্রীরা হল সবচেয়ে গোলমেলে জীব। অনেক আগে এক মন্ত্রী, প্রধান মন্ত্রীর চিতা ভস্ম ভরা হাঁড়ি মাথায় নিয়ে নেচেছিলেন। সাংবাদিকদের বেশ্যা বলেছিলেন। সে এক সাংঘাতিক এমব্যারাসমেন্ট।

ডিরেক্টার বললেন, 'পাবলিককে তো ড্রিল করেন নি। তুলতে না দিলে তোলা যাবে না।'

কমিশনারকে বললুম, 'ফোর্স দিয়ে সব হঠান। না সেটাও পারবেন না?'

ভদ্রলোক এই সংকটেও এক মুখ হেসে বললেন, না স্যার, পারা যাবে না। ওই গর্তে যিনি পড়ে আছেন তাঁর স্বার্থেই পারা যাবে না। এই মাটির ডাঁই ভেঙে, ধসে ভেতরে পড়ে গেলে জীবন্ত সমাধি। আপনাদের মশাই আচ্ছা ব্ল্যাকমেল করেছে। এগোলেও নির্বংশের ব্যাটা। পেছলেও নির্বংশের ব্যাটা।

'ওসব প্রবাদ ছাড়ুন। কি করা যায় ভাবুন।'

'আপনি নেতা। আপনি মুখ্যমন্ত্রী। আপনার ভাবমূর্তি দিয়ে জনতাকে শান্ত করুন। একটা মধ্যস্থতায় আসুন।'

'এই গর্ত কে খুঁড়েছে। কেন খুঁড়েছে। কার হুকুমে খুঁড়েছে।'

'হাঃ হাঃ, সেই ছেলেবেলায় পড়া একটা বইয়ের কথা মনে পড়ছে—কে কি কেন কবে কোথায়। কলকাতার গর্ত পলিটিক্স আপনি জানেন না!'

'ঠিক আছে, ডাকুন গর্তে মন্ত্রী ফেলার পাণ্ডাদের। বলুন আমি মুখ্যমন্ত্রী।'

প্রবীণ, নবীনে একটি দল এগিয়ে এল। তার মধ্যে বেশ তালেবর একটি ছোকরা বললে, 'নমস্কার স্যার।'

'তোমরা এমন একটা কাজ করলে কেন? আমরা তোমাদেরই রায়ে সবে এসে ক্ষমতায় বসেছি। তোমাদের আশাআকাঙ্ক্ষা স্বপ্ন আমাদের হাতে। তোমরা আমাদের একজন মন্ত্রীকে দুম করে গর্তে ফেলে দিলে!'

'মা কালী, অন গড, আমরা ফেলিনি। নিজেই পড়ে গেলেন। আমরা এটা অন্যায় করেছি, ভদ্রলোককে তুলিনি। যেই বললেন; আমি পূর্তমন্ত্রী, সঙ্গে সঙ্গে ঠিক করে ফেললুম, থাক শালা পড়ে।'

ছেলেটি জিভ কেটে বলে, 'সরি স্যার।'

'পড়ে থাকবে কেন?'

'আপনি বলুন, ছমাস হয়ে গেল, রাস্তাটা এইভাবে পড়ে আছে। এর মধ্যে পাড়ায় সাত সাতটা বিয়ে হয়েছে। কোনও গাড়ি ঢুকতে পারে না। মানুষ হাঁটতে পারে না। বরকে চ্যাংদোলা করে আনতে হয়। বর বউ গাঁটছাড়া বাঁধা অবস্থায় পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। সেদিন একটা বাচ্চা মেয়ে উলটে পড়ে হাসপাতালে গেছে। ডাক্তারবাবুরা আসতে পারে না। বুধবুধারা ছমাস গৃহবন্দী। আপনিই বলুন, আর আমরা কত সহ্য করবো! আমরা আমাদের কাউন্সিলারকে বললুম। বললেন, সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়কে গিয়ে বলো, যিনি কলকাতার পাতাল প্রবেশের ব্যবস্থা করে গেছেন। আপনিই বলুন, কোথায় পাতাল রেল আর কোথায় আমাদের ওস্তাগর লেন। শা তা বললে ভালো লাগে!'

'এখন তাহলে ভদ্রলোককে তোলা যাক।'

'না স্যার, ফাঁদে বাঘ যখন একবার পড়েছে' সহজে আমরা ছাড়বো না। আজ একটা হেস্তনেস্ত হয়ে যাক।'

জনতা চিৎকার ছাড়ল, 'হ্যাঁ হ্যাঁ, হেস্তনেস্ত। মামার বাড়ি, আলো নেই, জল নেই- রাস্তা নেই, চাকরি নেই, থাকার মধ্যে আছে নির্বাচন আর অপদার্থ মন্ত্রী। যেটা পড়েছে সেটার সাইজ দেখেছিস মাইরি।'

বেসুরো বলছে, বেসুরো।

'আপনারা আমাদের কেন তিরস্কার করছেন ভাই। এ তো আগে যাঁরা ছিলেন তাঁদের কাজ।'

'হ্যাঁ হ্যাঁ, আপনাদের ওই ছলনায় আর ভুলছি না। যেই আসে সেই পেছনটা দেখায়। আমরা আর পেছন দেখতে রাজি নই। আমরা সামনেটা দেখতে চাই। বাস, মিনিবাস, লরি, ঠ্যালা, রিকশা, গাড্ডা, রাস্তায় হাঁটে কার বাপের সাধ্যি। এ ওকে ওভারটেক করছে, ও একে ওভারটেক। মোড়ে মোড়ে পুলিশ বাঁকা-শ্যাম। আর আমরা চাকার তলায় পড়ে মরছি। কেন মশাই! কেন কলকাতার ফুটপাথ দান খয়রাত করে দিয়েছেন? কেন শহরের রাস্তায় সব সময় লরি চলার পারমিশান দিয়েছেন। কেন কেন কেন?'

'এ সব আগের কাজ।'

'চোপ্। আপনাদের কোনও কথা শুনবো না। যত সব ফালতু। কেবল বাতেলা। আমরা যেন ভেসে এসেছি বানের জলে। সারা দেশটাকে মেরে ফাঁক করে দিলো শালা উদয়াস্ত নরক যন্ত্রণা। এর একটা বিহিত চাই।'

'হবে হবে। ধীরে ধীরে হবে।'

'আর কত ধীর মাইরি। হাফ সেঞ্চুরি তো হয়ে গেল।'

'তাহলে তুলতে দেবেন না।'

'না। পারলে আপনাকেও ফেলে দোবো। আমরা এখন ডেসপ্যারেট।'

কে খুঁড়ে গেছে?'

'কোন্ শালা খুঁড়েছে কে জানে? আপনাদের তো অনেক শালা সম্বন্ধী।'

এই সময়টায় আমি ক্যাডারদের অভাব ভীষণ ভাবে বোধ করছি। ক্যাডার ছাড়া দেশ শাসন করা সম্ভব নয়। ধর্মগুরুরা যেমন দীক্ষা দিয়ে শিষ্যসামন্ত তৈরি করেন, রাজনীতিগুরুদেরও তেমনি ক্যাডারের চাষ করা উচিত সবার আগে। এরা আমার দলের হলে বলতো, গর্ত খুঁড়েছিস, বেশ করেছিস, রক্তগঙ্গা বইয়েছিস বেশ করেছিস, কলকাতার ঘুঘু চরিয়েছিস, বেশ করেছিস। গ্রামের মানুষ আধ-মরা, ঠিক করেছিস: সব ধুঁকতে ধুঁকতে খাবি খেতে খেতেও বলত, আহা, বেশ, বেশ, বেশ! কীর্তনের আসর। মূল গায়েন সিল্কের পাঞ্জাবি পরে। গলায়

দুপাট লুতুরপুতুর চাদর। ঘি মাখন খাওয়া শরীর আর দোহাররা সব কৃশকায়, চোখ বসা, চোয়াল ওঠা। ধুঁকতে ধুঁকতে বলছে, 'রাধার কি হইল অন্তরে ব্যাথা।'

একটু বল সঞ্চয় করে বললুম, 'আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি, কাগজ আনুন, তিন ঘণ্টার মধ্যে এই রাস্তা চৌরঙ্গের কাজ শুরু হবে।'

একটু প্রবীণ যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যস্থতায় একটা রফা হল। একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনারা কোন দল? ডান না বাঁ। রাশিয়া না আমেরিকা?'

'আমরা সম্পূর্ণ একটা নতুন দল।'

• 'আচ্ছা! নতুন সাবান। কেমন ফ্যানা হয়? খুব ফ্যানা।'

বাবা! দেশের কি অবস্থা! কেউ গান দিয়ে বলছে হালুয়াবালা। কেউ বলছে সাবান। যাক, দমকল পূর্তমন্ত্রীকে তুলল! কাদাটাদা মেখে সে একরকম হয়েছেন। আড়ালে এনে প্রায় ধমকের সুরে বললুম, 'এখানে মরতে এসে-ছিলেন কেন?'

ভদ্রলোকের প্রায় কাঁদো কাঁদো সুর, 'আর বলেন কেন, আমার বউয়ের ফোল্ডিংছাতা।'

'তার মানে!'

'মানে এই রাস্তার বত্রিশ নম্বর বাড়িতে আমার মিসেসের এক বান্ধবী থাকে। কাল এসেছিল বেড়াতে। ভুলে ফেলে গেছে। আমাকে বললে, তুমি যাবার পথে ছাতাটা টুক করে তুলে নিও।

'আর আপনি মন্ত্রী হয়ে বউয়ের কথায় নেচে নেচে স্ট্যাটাসফ্যাটাস ভুলে ছাতা আনতে ছুটলেন। ওই জন্যে বলে জাত বড়লোক আর লটারি পাওয়া বড়লোক। বুঝলেন, আমাদের জাতমন্ত্রী হতে জীবন ঘুচে যাবে। দেখুন তো আপনাদের জন্যে কি হেনস্তা।'

আমরা গাড়িতে উঠছি। চারপাশে লোকে লোকারণ্য। হাসছে। টিটকিরি দিচ্ছে। সময়টা দুপুর। কিছু অলস বারাঙ্গনা মজা দেখতে এসেছিল। একজন বলে উঠল, 'কি লো সই! শেষে গর্তেই ঢুকে গেল।'

লজ্জায় একেবারে অধোবদন। পাইলটের ওঁয়া ওঁয়া। দমকলের ঘণ্টি। জনগণের হাসি-তামাসা। আমার পাশে পুরমন্ত্রী। বললুম, 'তিনঘণ্টার মধ্যে, রাস্তা বোজাবার কাজ শুরু করতে হবে।'

'আপনিও যেমন, চুক্তির ডেফিনিশান কি? যাহা ভঙ্গ করিতে হয়, তাহাই চুক্তি। যাহা বন্ধ করিতে হয় তাহাই কারখানা, যাহা দখল করিতে হয়, তাহাই ফুটপাথ।'

হাইড্রা এজেন্সির রবিশঙ্কর এলেন। হাতে ব্রিফকেস। মুখে তেমন হাসি নেই।

'আমরা তো আপনাদের মার্কেট রেটিং সার্ভে করালুম। খুবই-বাজে অবস্থা। যাচ্ছেতাই বলা চলে। আপনারা না দিশি বিস্কুট না বিলিতি বিস্কুট।'

'তার মানে?'

'মানে কি উচ্চ সমাজ, কি নিম্ন সমাজ কেউই আপনাদের চাইছে না। এই দেখুন হরিপালে এক ক্ষেত মজুরকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল। এই যে নতুন মন্ত্রিসভা হল, আপনাদের মনে কেমন আশা জাগছে? সঙ্গে সঙ্গে উত্তর, যারাই আসুক সব ব্যাটাই হারামজাদা। শ্রীপুরের এক শিক্ষককে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, নতুন মন্ত্রিসভা। ও তো সব আকাটের দল। বামুনগাছির এক ছাত্রকে জিজ্ঞেস করা হল, বললে, ওল্ড ওয়াইন ইন এক নিউ বটল। কলকাতার এক ব্যবসায়ীকে জিজ্ঞেস করা হল, বললে, মোশা, যে মালই আসুক, আমাদের কবজায়। ব্যবসা আমাদের, রাস্তা আমাদের, কলকাতার বিলকুল প্রপার্টি আমাদের, ফুটপাথ আমাদের, গঙ্গা মাঈ আমাদের, পার্ক আমাদের, সোব-সোব আমাদের।' এক গৃহবধূকে জিজ্ঞেস করা হল। তিনি বললেন, কবে সরষের তেলের দাম পঞ্চাশে ওঠে দেখবো। হাঁড়ি তো প্রায় সিকেয় উঠল। বর্ধমানে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞেস করা হল, তিনিবললেন, এদেশে মন্ত্রী-টন্ত্রী আছে? আইন আদালত আছে। আমি তো জানি, মাস্তান ছাড়া এদেশে কিছু নেই। সার্ভের ফলাফল খুব খারাপ। খুবই খারাপ।'

'আমাদের ইমেজ খারাপ নয়। আমাদের বাজার আগে থেকেই খারাপ করে রেখে গেছে। কিরকম জানেন, যত ভালোই চানাচুর হোক, লোকের ধারণা চানাচুরে অম্বল হয়। যেমন সিফিলিটিক পিতামাতার সন্তান বিকলাঙ্গ হতে পারে, জড়বুদ্ধি সম্পন্ন হতে পারে।'

'সে আপনি যে ভাবেই ব্যাখ্যা করুন; আপনাদের মার্কেট ভালো নয়। যে

কোনওদিন আপনারা পড়ে যাবেন। আমরা আরও সাংঘাতিক খবর পেয়েছি, ধীরে ধীরে সব অচল হয়ে যাবে। ডার্ক ফোর্সেস চারিদিকে মাথা তুলছে। বাজার থেকে অর্ধেক জিনিস উধাও। ল অ্যান্ড অর্ডার নেই বললেই চলে।'

'আপনার মতে আমাদের কি করা উচিত!'

'দেখুন যে দেশের যা। মোহনবাগান, ইস্টবেঙ্গল ছাড়া খেলার কথা ভাবা যায়?'

'না।'

'সেইরকম কংগ্রেস কমিউনিস্ট ছাড়া রাজনীতির কথা ভাবা যায় না। এই যে দেখুন নতুন নতুন সব দল হল, কংগ্রেস (স), বাংলা কংগ্রেস, প্রণব কংগ্রেস, কোনও কিছু ধোপে টিকল? পাবলিক নিল না। পার্টি অনেকটা প্রোডাক্টের মতো। শুকনো মটর শুঁটি, স্যুপ পাউডার, গুঁড়ো পেঁয়াজ, রসুন পাউডার, রসুন গুলি এদেশে চলেনি। এদেশের লোক জলেই জলশৌচ করবে, টিসু পেপার ব্যবহার করবে কেন। আপনারা যে কোনও একটা দলের সঙ্গে মার্জ করে যান।'

'কোনও দলই তো নেই। সব ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। বঙ্কিমচন্দ্রের যেমন উত্তরাধিকারী নেই, বিদ্যাসাগরের ছেলে যেমন বিদ্যাসাগর হলেন না, তেমনি বিধান রায়, জ্যোতি বসু, নেহরু কারোরই আর দ্বিতীয় নেই। কোথায় যাবো! কার কাছে যাবো! বনেদী বাড়ির মতো বনেদী পার্টিও সব নষ্ট হয়ে গেল। মন্দিরে আর মাধব নেই আমরা পোদোর দল শাঁক ফুঁকছি।'

'সেইটাই যদি বুঝে থাকেন, তাহলে শুধু শুধু সময় নষ্ট করছেন কেন। আপনাদের যা অবস্থা চুরিও করতে পারবেন না, দেশসেবাও করতে পারবেন না, কারণ আপনাদের সে সংগঠন নেই। আমরা সাধারণত আমাদের ক্লায়েন্টদের হতাশ করি না; কিন্তু কি করবো, আপনাদের কোন ইমেজ নেই।'

রবিশঙ্কর ব্রিফকেস গুটিয়ে নিয়ে চলে গেলেন। আর তিন দিন পরেই বিধানসভার অধিবেশন শুরু হবে। এই তিনদিনের মধ্যেই সিদ্ধান্তে আসতে হবে। বিরোধীরাও আমাদের মতোই ছত্রভঙ্গ। রাতে আমার স্ত্রীকে বললুম, 'জানো আমি পদত্যাগ করছি।'

বিশ্বাস করলেন না। বললে, 'যাঃ সবেতেই তোমার ইয়ারকি। আমেরিকা থেকে বলমোসিরা আসছে তোমাকে সম্বর্ধনা জানাতে। তোমার মুখ চোখও মুখ্যমন্ত্রীর মতো হয়ে আসছে। পদত্যাগ করবে মানে! আমার অত বড় বড়

চুল কেটে আধ হাত করে দিলুম। সে কি পদত্যাগ করার জন্যে ?,

'বিশ্বাস করো, ভীষণ আত্মগ্লানিতে ভুগছি। এভাবে হয় না।'

'আত্মা ফাত্মা ফেলে দাও। রাজনীতিতে আত্মা নেই। তুমি দেশ দেশ করে অত ভেবো না তো। বিদেশের কথা ভাবো।'

'জানো, আমি আজকাল খেতে বসে চাষবাসের কথা ভাবি। জামাকাপড় পরার সময় টেক্সটাইল মিলের কথা ভাবি। দুধ খাবার সময় হরিণঘাটার কথা ভাবি। আলোর সুইচে হাত দেবার সময় ব্যাণ্ডেলের কথা ভাবি। যা করতে যাই পুরো পটভূমিটা চোখের সামনে ভেসে ওঠে আর আমি কেমন যেন সিক হয়ে পড়ি। কোথাও কোনও কাজ হচ্ছে না। চড়া রোদ দেখলে মনে হয়, এই রে খরা এসে গেল! কালো মেঘ দেখলে মনে হয় বন্যা।'

'তুমি অ্যামেচার, এখনও অ্যামেচার। প্রোফেসনাল হবার চেষ্টা করো।'

ঘুম আর আসে না। একটু তন্দ্রার মতো আসে, ছ্যাঁক করে ভেঙে যায়। ওইটুকুর মধ্যেই ছেঁড়া ছেঁড়া স্বপ্ন। মাস্টারমশাই সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। চোখ দুটো যেন জ্বলছে। হাতে একটা কাগজ। কণ্ঠে তিরস্কার, 'কিছুই করতে পারলে না। আমার নাতনীটা আত্মহত্যা করল।' গঙ্গার ধারে এক বৃদ্ধা বসে আছেন, সামনে একটা ভাঙা অ্যালুমিনিয়ামের থালা। 'এ কি মা! তুমি ভিক্ষা করছ ?' ঝাপসা চশমা পরা চোখ তুলে বললেন, 'ভিক্ষান্ন, প্রায়োপবেশন এই তো এ-দেশের ভাগ্য।'

রাইটার্স বিল্ডিং-এ ঢুকেছি! কেউ কোথাও নেই। খাঁচা লিফ্‌টের কাছে একটি মাত্র আলো জ্বলছে। দাঁড়ানো মাত্রই ওপর থেকে লিফ্‌ট নেমে এল। ধুতি আর শার্ট পরা, লম্বা চওড়া একজন ভদ্রলোক দরজা খুলে ডাকলেন, 'চলে এস, কুইক।' খুব চেনা। খুবই চেনা। ডক্টর রায়। 'আপনি ?' 'তুমি কে ?' 'আমি পলিটিক্যাল পেশেণ্ট।' 'হার্টটা ঠিক রাখো। আজকাল সব হার্টলেস পলিটিকস করে।' আমার সেই শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত ঘরে ঠাণ্ডা মেশিনের শব্দ। যেন কোনও ব্রঙ্কাইটিশের রুগি নিঃশ্বাস ফেলছে। অসম্ভব ঠাণ্ডা। একটি মাত্র আলো জ্বলছে। আমার চেয়ারটা হয়ে গেছে বিশাল বড়। আর তেমনি উঁচু। আকৃতি দেখে ভয় পেয়ে গেলুম। ভয়ে ভয়ে এগোচ্ছি। চেয়ারে কুণ্ডলী পাকিয়ে কি একটা শুয়ে আছে। লাল রঙের বিশাল এক সাপ। আমি কাছে যেতেই সাপটার অলস মাথা উঁচু হল। অবিকল মানুষের মতো দুটো চোখ। হাসছে। লিকলিকে চেরা জিভ বেরিয়ে এল। আবার ঢুকে

গেল। সাপ হাসছে।

ঘুম ভেঙে গেল। ফোন বাজছে।

'হ্যালো।'

ওপাশে একটা চাপা কান্নার শব্দ।

'হ্যালো।'

'আমি মিসেস বুবনা।'

'কি হয়েছে আপনার? কাঁদছেন কেন?'

'কাল রাতে মিস্টার বুবনাকে কে বা কারা খুন করে গেছে।'

'সে কি? আপনি কোথায় ছিলেন?'

'আমি পাশের ঘরে ছিলুম। কিছু টের পাইনি।'

'পুলিসকে ইনফর্ম করেছেন?'

'সবার আগে আপনাকে জানালুম।'

'আপনার কাকে সন্দেহ?'

'ওর ভাইকে সন্দেহ হচ্ছে। গঙ্গাবতার বুবনা।'

'কারণ? খুনের একটা কারণ থাকবে তো!'

'গঙ্গাবতার চাইছে পশ্চিমবাংলার অর্থনীতি, ল অ্যান্ড অর্ডার, প্রশাসন, সব একসঙ্গে ভেঙে পড়ুক। লোকটা নামকরা ব্ল্যাকমার্কেটিয়ার, স্মাগলার। ও সমস্ত ট্রেডারসদের নিয়ে পরশু একটা মিটিং করেছিল। সেই মিটিং হয়েছিল গভীর রাতে পার্ক-এ। সেখানে আপনার ক্যাবিনেটের বেশ কিছু মন্ত্রী ছিল। আমার যতদূর মনে হচ্ছে আপনার বেশ কিছু মন্ত্রী বিক্রি হয়ে গেছে। গঙ্গাবতার কিনে নিয়েছে। আলাদা একটা দলও তৈরি হয়েছে তলায় তলায়।'

'তারা কি করতে চায়?'

'আপনাকে ফেলে দিতে চায়। বিধানসভায় আপনি সাপোর্ট হারিয়েছেন, এই বলে রাজ্যপালের কাছে একটা আবেদন যাচ্ছে। এই নিয়ে আমার স্বামী কাল পর্যন্ত খুব চিন্তিত ছিলেন। গতকাল সকালে আমাদের প্রতিষ্ঠানে ইনকাম ট্যাক্স রেডও হয়ে গেছে। আপনি জানেন না?'

'কই না তো?'

'আমাদের সব নিয়ে চলে গেছে।'

'সে কি মিস্টার বুবনা তো আমাকে একটা ফোন করতে পারতেন!'

'কি করে করবেন? টেলিফোনে হাত দেবার উপায় ছিল না।'

'তা হলে ?'

'তা হলে আর কি, আপনারও কপাল পুড়লো। আমারও কপাল পুড়লো। বুবনা লোকটার খুব প্রেম ছিল। আমাকে বস্তি থেকে রাজপ্রাসাদে তুলে এনেছিল।' মিসেস বুবনার গলা ধরে এল।

'আমি যাবো ?'

'না না। এখনও হয় তো আপনার চান্স আছে, তাও যাবে। আপনি পাওয়ারে থাকলে আমার হয়তো সুবিধে হবে।'

গুম মেরে বসে আছি। কাগজ এল। বুবনার খুনের ব্যাপারটা কাগজ মিস করে গেছে। তার বদলে বিশাল খবর, আগুনে মল্লিকবাজার পুড়ে ছাই হয়ে গেছে। কি রকম হল! আমাকে তো কেউ জানালো না। আমি এই স্টেটের সি. এম.। আমি জানলুম না। খিদিরপুর রোডে গভীর রাতে একটা লরি, কলকাতার এক বিখ্যাত ব্যবসায়ীর গাড়ি চুরমার করে দিয়ে সরে পড়েছে। ব্যবসায়ী ও তাঁর ড্রাইভার দুজনেই মৃত। এ মনে হয় বুবনা কানেকসান। কোথাকার জল কোথায় গড়াচ্ছে রে বাবা!

আমার স্ত্রী বললে, 'কাল রাতে তোমাকে বলেছিলুম ছেড়ো না ; আজ বলছি ছেড়ে দাও। পলিটিকস হল বিগ মানি আর বিগ ইন্টারেস্টের খেলা। ও আমাদের পোষাবে না। আমাদের সেই সাবেক ফরেন বুকস আর পিরিয়ডি-ক্যালসের ব্যবসাই ভালো। আমি সেই অফিসে অফিসে বই আর ম্যাগাজিন দিয়ে বেড়াতুম, তাতে তোমার অনেক শান্তি ছিল। খাচ্ছিল তাঁতী তাঁত বুনে কাল হল তাঁতীর হেলে গরু কিনে।'

আমি হাসলুম। মানুষের লোভ। ইংরেজ আমলে কিছু শৌখীন বাঙালি পলিটিসিয়ান ছিলেন। কেউ আইনজীবী, কেউ বুদ্ধিজীবী। কেউ ধনী জমিদার। সাহস করে দুটো কথা বলতে পারলেই বীর স্বদেশী। ক্লাসে বক্তৃতা আর মাঠে বক্তৃতায় অনেক তফাত। সারা দেশটা তখন ইংরেজের ক্লাসরুম। শাসনযন্ত্রের হাতল তাদের হাতে। আক্রমণের লক্ষ্যস্থল একটাই, ইংরেজশাসন। পকেটমারকে মারার মতো একটা ঘুষি মেরে আসতে পারলেই হয়ে গেল। বিরাট কাজ। জেল খেটে আসতে পারলে তো কথাই নেই। বাঙালি কেন ভারতীয়রা যেই চেয়ারে বসল, দেখা গেল চরিত্রে মাল-মশলা কিছুই নেই। শাসন একটা ধারালো জিনিস। প্রয়োজনে কাটতে হবে। এমুখে, ও মুখে। তখন ছিল একটা শত্রু এখন শত শত্রু। এ দেশ আর কেউ নেবে না ; আমরাই একে শতছিন্ন

করবো, নিঙড়বো, চটকাবো। কেটলিতে যখন জল ফোটে তখন জলের একটিও বিন্দু সুস্থির থাকতে পারে না। এ দেশের জনজীবনেরও সেই একই অবস্থা। প্রতিটি প্রাণীই অস্থির।

ঠিক দশটার সময় রাইটার্সে পেঁৗছে গেলুম। মন্ত্রীদের জন্যে আলাদা যে ভি আই পি লিফ্‌ট হয়েছে, সেই লিফ্‌টে আর গেলুম না। বড় লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়ালুম। এই লিফ্‌ট কাল রাতে আমার স্বপ্নে ডক্টর রায় চালাচ্ছিলেন। ঘরে এসে নিজের চেয়ারটার দিকে তাকিয়ে রইলুম বেশ কিছুক্ষণ। কাল রাতে এই চেয়ারে একটা সাপ শুয়েছিল। চেয়ারটা যেন অল্প অল্প দুলছে। বলতে চাইছে, ছোড়ো মায়া, প্রেমনগরকা।

হঠাৎ পেছন দিক থেকে আমার পি-এ বললেন, 'চেয়ারটায় কোনও গোলমাল আছে স্যার? এনিথিং রং? মিস্ত্রী ডাকবো?'

'কোনও গোলমালই নেই ভারি সুন্দর চেয়ার। কিন্তু বসা যায় না। সাংঘাতিক অস্বস্তি হয়। আনকমফর্টেবল।'

'আপনার চেহারার তুলনায় সামান্য বড়। এই যা।'

চেয়ারে বসার আগে একবার ভালো করে দেখে নিলুম। সত্যিই কিছু শুয়ে আছে কিনা।

'মিঃ সেনশর্মা আপনার জন্যে অপেক্ষা করছেন।'

'পাঠিয়ে দিন।'

ভদ্রলোককে আজ তাজা ফুলকপির মতো দেখাচ্ছে। চেয়ার টেনে বসলেন। বেশ কিন্তু কিন্তু গলায় বললেন, 'চিফ মিনিস্টার স্যার! এই ব্যবসায়ী সম্প্রদায় তো আপনার সঙ্গে খুব একটা কোঅপারেট করছে বলে মনে হয় না।'

'কে.. ? আপনার এই সন্দেহের কারণ?'

'বাজার থেকে অত্যাবশ্যকীয় সমস্ত পণ্য উধাও হয়ে গেছে। তেল নেই। কেরোসিন নেই। ডাল নেই। তিনের চার ভাগ ওষুধ নেই। তরিতরকারি নেই। ডিপোয় দুধ নেই। বেবিফুড নেই। সাবান নেই। কাপড়কাচা সোডা নেই। সবচেয়ে ফানি নুন নেই। ধরা যেতে পারে মোটামুটি সবই নেই।'

'রাজনীতির দাবা খেলায় এটা খুব পুরনো চাল। বেশিদিন স্থায়ী হয় না। পালটা চালে আমরা কিস্তি মাত করে দোব। আগের মিনিস্ট্রিতেও ব্যবসাদাররা এই চাল চেলেছিল।'

'তাদের লোকবল ছিল। ক্যাডারবল ছিল। প্রতিটি বাজারের সামনে ঘণ্টার পর ঘণ্টা স্লোগান দিয়ে, ডেমনস্ট্রেশান করে বিলকুল নর্মাল করে দিয়েছিল। আপনাদের তো কিছুই নেই। লাখ দেড়েক লোকের মিছিল বের করতে পারবেন?'

'জনমানসে এখনও ওই সবের কোনও ইমপ্যাক্ট আছে বলে আপনি মনে করেন? আপনি কি মনে করেন ডেমনস্ট্রেশানে দাম কমে? আপনার সেই দমদম দাওয়াই-এর কথা মনে আছে? কি হয়েছিল মনে আছে?'

'আমি পাবলিক রিলেশানস, পাবলিসিটি লাইনের টপ কনসালট্যাণ্ট, আমার কাছে যে কোনও ক্যামপেনেরই দাম আছে।'

'ক্যামপেন ফ্যামপেন অল বোগাস। য়া এফেকটিভ, তা হল পাইয়ে দেওয়া। পাইয়ে দেওয়ার রাজনীতি।'

বন্ধ ঘরে বসেও শুনতে পাচ্ছি, বাইরে একটা তাণ্ডব হচ্ছে। পি-এ-কে ডাকলুম, 'কি হচ্ছে বাইরে।'

'ও আপনি বোধহয় ভুলে গেছেন স্যার। আজ আপনার কর্মচারীরা কালা দিবস পালন করছে। সব ব্যাজ পরে আপনার ঘরের সামনে এসে স্লোগান দিচ্ছে।'

'দাবি?'

"ওই তো একটাই দাবি, মাইনে বাড়াও। কাজের ঘণ্টা কমাও। পাঁচদিনে সপ্তাহ করো।'

'দু নম্বর ইউনিয়ানের নেতাদের ডেকে পাঠান তো। এক নম্বর দীর্ঘকাল ডাণ্ডা ঘুরিয়েছে। দুইকে এবার মদত দিয়ে দেখা যাক।'

'দুই তো তেমন পাওয়ারফুল নয়।'

'আপনি আপনি কি আর পাওয়ারফুল হয়। ফুল গাছে সার দিতে হয়। হ্যাঁ, মিঃ সেনশর্মা বলুন।'

'কি আর বলবো? আপনাকে তো দেখছি একেবারে জেরবার করে মারলে। ঘরে বাইরে শত্রু। যাক, সেই সম্বর্ধনার একটা প্ল্যান ছকে ফেলেছি।'

'কার সম্বর্ধনা!'

'ভুলে গেলেন? আপনার।'

'নিজেকে নিজে কেউ সম্বর্ধনা দেয়? জনগণ যদি দেয়, যাবো, মালা পরবো।'

'জনগণের দায় পড়েছে! নিজেরাই নিজেকে দেয়। আপনারা বিজ্ঞানীও

নন, গ্রন্থের সাহিত্যিকও নন, সঙ্গীত শিল্পীও নন। শুনুন অনুষ্ঠান হবে সল্ট লেক স্টেডিয়ামে। বম্বের সমস্ত টপ আর্টিস্টকে আনা হবে। একালের লাস্যময়ী নায়িকা ধীরাকুমারী নেচে নেচে আপনাকে মালা পরাবে। মালা পরাবে টপ নায়ক উজ্জ্বলকুমার। সাতজন নায়িকা ও সাতজন নায়ক এক সঙ্গে ব্রেক ড্যান্স দেখাবে। গান গাইবে বিখ্যাত প্লেব্যাক সিঙ্গার জ্বলজ্বলকুমার। এমন একটা অনুষ্ঠানের প্ল্যান করেছি, যা লাস্ট হাণ্ড্রেড ইয়ারসে হয়নি। বাজেট বিশ থেকে তিরিশ লাখ টাকা।'

'কে দেবে ?'

'কেন, পার্টি ইন পাওয়ারকে যাঁরা টাকা দেন, তাঁরাই দেবেন।'

'আমার পেছনে কেউ নেই।'

'পেছনে কেউ না থাকলে তো মারা পড়বেন। আপনাদের পেছনটাই তো সব।'

পি এ এসে জানালেন, গঙ্গাবতার বুবনা এসেছে দেখা করতে। নাম শুনেই বুকের ভেতরটা কেমন করে উঠল। 'মিঃ সেনশর্মা সম্বর্ধনার ব্যাপারটা আমি আপনাকে পরে জানাচ্ছি।'

'থ্যাংকস।'

মিঃ সেনশর্মা বেরিয়ে গেলেন। ঘরে ঢুকলো গঙ্গাবতার। লোকটিকে ভালো করে দেখে নিলুম। ভারি সুন্দর দেখতে সাধারণত এই কমিউনিটির ছেলেদের এত ভালো দেখতে হয় না। মোটা হয়ে একটা কিম্ভূতকিমাকার দেখতে হয়ে যায়।

'নমস্কার।'

'নমস্কার। বসুন।'

'দাদাকে মার্ডার করেছে। শুনেছেন তো ?'

'শুনেছি।'

'আপনাদের কিছু অসুবিধে হয়ে গেল। ভাববেন না, আমি আছি।'

'ভালো কথা ; কিন্তু পুলিস কি আপনাকে ছেড়ে দেবে ?'

'দাদার বাঙালি বউটা কিছু ঝামেলা করবে ; তবে সুবিধে করতে পারবে না।'

'আমার কাছে কেন এলেন ?'

'সাপোর্ট দিতে।'

'শুধু শুধু ?'

'আমাদের বিজনেস কমিউনিটিকে তো চেনেন। আমরা গিভ অ্যান্ড টেকে বিশ্বাস করি। দ্যাট ইজ বিজনেস।'

'কি গিভ করতে হবে?'

'মল্লিকবাজারটা আমাকে লিখে দিতে হবে। আমি ডেভালাপ করবো। ফ্যানসি বাজারের মতো একটা ফরেন গুডসের বাজার করবো। ফুললি এয়ার কণ্ডিশানড। মাল্টিস্টোরিড। অনেক অ্যাপার্টমেণ্ট বেরোবে। আর একটা করতে হবে, প্রাইস কণ্ট্রোল করা চলবে না। কনজিউমারদের নিয়ে আমরা একটু খেলা করবো। অনেকদিন আমরা কিছু করিনি। সেই সেনসাহেবের আমলে যা হয়ে গেছে। আমরা আপনাদের ফাণ্ডে ভালোই দেবো।'

'আপনার কথা শুনতে একদম ভালো লাগছে না। একেবারে না।'

'দাদার কথা তো শুনতে ভালোই লাগছিল।'

'দাদা এইরকম সব সাংঘাতিক প্রস্তাব আনেননি।'

'আপনারা বেশি দিন চালাতে পারবেন না। মওকা যখন এসে গেছে, কুইক কিছু মানি করে নিন। বাঙালিরা খুব বোকা। দুনিয়া মানে টাকা। মানি, মানি। আপনাকে আমি রোলাণ্ড রোডে ফাসক্লাশ ছোট্ট একটা বাংলো দিয়ে দোবো। উইথ লন, অ্যাণ্ড ফ্লাওয়ার গার্ডেন। একটা এরার কণ্ডিশানড গাড়ি দিয়ে দোবো। ব্যাংকে এত টাকা ফিকসড করে দেবো, কি রেস্ট অফ ইওর লাইফ আপনি ক্ষচ খেতে পারবেন। আপনি তো স্বদেশী বন্দেমাতরম নন। লাক ফেভার করেছে, আয়সি চলে এসেছেন। দাদা অবশ্য খুব হেল্প করেছে। এ তো ওনার মিনিস্ট্রি। দাদার অ্যাকাউণ্ট ক্লোজড। এবার আমার অ্যাকাউণ্ট খুলতে চাই। দেশ আপনারও নয়, আমারও নয়। আমরা জাস্ট প্লেয়ার। থোড়া দিন খেলে চলে যাবো প্যাভেলিয়ানে। আমি আপনার ওয়াইফকে বেশ কিছু জুয়েলারি দিয়ে দোবো। ডায়মণ্ড। রুবি। টোপাজ।'

'আপনি আসুন।'

'শুধু হাতে। এম্পটি হ্যাণ্ড!'

'ধরে নিন তাই।'

'আই রিমাইণ্ড ইউ ওই চেয়ারটা আমার ফ্যামিলির। আপনাকে বসতে দিয়েছি। উইকেটের মাথার ওপর বেল থাকে জানেন তো। আপনারা সেই বেল আমরা হলুম ফাস্ট বোলার। কয়েক ওভার খেলার সুযোগ দোবো। ভারতবর্ষ আপনারা চালাচ্ছেন না, চালাচ্ছে বিজনেস হাউস। ডোণ্ট ফরগেট

দ্যাট। ওই চেয়ার আমাদের।'

'আপনি আসুন।'

বুবনা বেরিয়ে যাচ্ছিল। একটা প্রশ্ন ছুঁড়ে দিলুম, 'দাদাকে মারলেন কেন? আপনাদের কমিউনিটিতে তো মার্ডার ছিল না।' বুবনা ঘুরে দাঁড়িয়ে বললে, 'কে বলেছে, আমি মেরেছি। আমরা ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় হিট করি। আমি সতেরবার ফরেন গেছি। আই নো দি আর্ট! মার্ডার যেই করুক, জেনে রাখুন কনভিকটেড হবে দাদার বাঙালি বউ। প্লেন অ্যান্ড সিম্পল। আচ্ছা। গুড বাই।'

বুবনা বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘরে ঢুকলেন চেম্বার অফ কমার্সের সুলক্ষণ জৈন।

'বসুন।'

'আমি খুবই কম সময় নেবো। আমার একটা রিকোয়েস্ট, প্লিজ ডু আস এ ফেভার। আমার কয়েকটা সিক-ইন্ডাস্ট্রিকে এই স্টেট থেকে সরিয়ে নিয়ে যেতে চাই।'

'কেন?'

'এখানে হবে না। আপনাদের তিনটি পাওয়ার প্ল্যান্ট ভেঙে পড়ে গেছে। এক একটা এরিয়ায় ফর্টি এইট আওয়ার্স, ফিফটি টু আওয়ার্স লোডশেডিং। ইনহিউম্যান অবস্থা।'

'কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা পাওয়ার পজিসান ঠিক করে ফেলবো।'

'পারবেন না। পাওয়ার, ট্রান্সপোর্ট, ইরিগেসান খুব সহজেই স্যাবটেজ করা যায়। আর তাই হচ্ছেও। আগেও হয়েছে। এখন আরও বেশি হচ্ছে। আপনি জেনে রাখুন, এই স্টেটের মানুষ, স্টেটের স্বার্থ দেখে না, নিজেদের স্বার্থ দেখে: এখানে কিছু করা যাবে না। প্ল্যান্ট, অ্যান্ড মেশিনারি যেখানে যা আছে আমাদের নিয়ে যাবার অনুমতি দিন, অ্যান্ড ফর দ্যাট আমরা আপনাকে, আই মিন আপনার ছেলেকে ব্যাঙ্গালোরে একটা ইন্ডাস্ট্রি করে দিচ্ছি। রেস্ট অফ হিজ লাইফ…!'

'আই অ্যাম সরি মিঃ জৈন, আমার কোনও ছেলে নেই।'

'সো সরি। বেশ আপনার স্ত্রীকে করে দিচ্ছি।'

ইন্ডাস্ট্রি তুলে নিয়ে যাবার অনুমতি আমি দিতে পারবো না।'

'ডোণ্ট বি এ ফুল!'

'আমরা টেক ওভার করবো।'

'কত জায়গায় কত লস দেবেন! আপনার স্টেট তো ওভার ড্রাফটে চলছে। এরপর কর্মচারীদের মাইনে দেবেন কি করে! আপনি ভেবে দেখুন। তা না হলে সাতটা ইণ্ডাস্ট্রিতে আমরা ক্লোজার ডিক্লেয়ার করবো। তার ফলটা কি হবে বুঝতে পারছেন!'

জৈন চলে গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে আই জিরে ফোন। 'আপনাকে একটা বাজে খবর শোনাই, চকমকুন্দপুরে তিনটে গ্রাম জ্বালিয়ে দিয়েছে। ধরা যেতে পারে মৃতের সংখ্যা শ দুই। শিশু আছে নারী আছে।'

'কারণ।'

'ল্যাণ্ডলর্ডরা জমি দখল করছে। আগের বার যাঁরা বসিয়ে গিয়েছিলেন, সেই মুরুব্বিরা নেই।'

'আপনি কিছু করুন।'

'কি করে করবো, এর মধ্যে তো আপনার মন্ত্রী রয়েছেন।'

'আই সি।'

আবার ফোন। উত্তরবঙ্গের ডি. এম.। কাল রাতে তিস্তার বাঁধ কেটে দিয়েছে। তিন হাজার একর জলের তলায়।'

'বাঃ, শুভ সংবাদ। কিছু একটা করুন।'

'কি করে করবো! এখানে ইরিগেশান ইঞ্জিনিয়াররা গণছুটি নিয়ে বসে আছে।'

'টার্মিনেট অল সার্ভিস, অ্যাপয়েন্ট নিউ ইনজিনিয়ারস।'

ভদ্রলোক হাসলেন। আবার ফোন, 'বডিগার্ডস লাইনে দু দল পুলিসে সশস্ত্র লড়াই। একজন অফিসার সহ তিনজন শেষ।' আবার ফোন, 'দমদমের কাছে রেলের ওভারব্রিজ খুলে পড়ে গেছে। লাইন মালার মতো ঝুলছে।'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম। চেয়ারটার দিকে তাকালুম একবার। দুলছে। যেন বলতে চাইছে হুঁ হুঁ।

আমার কালো অ্যামবাসাডার রাজভবনের গেট পেরিয়ে ঢুকছে। আজ আর আমার পাশে আমার স্ত্রী নেই। আজ আর আমার বুকটা ধক করে উঠলো না। জিভের তলায় সরবিট্রেট রাখতে হল না। চাকার তলায় মোরামের ঘসঘস শব্দ। রাজ্যপালের অফিসে ঢুকে চমকে উঠলুম। আমার সেই গর্তে পড়া পূর্তমন্ত্রী ও

গঙ্গাবতার বুবনা ওয়েটিং রুমের সুদৃশ্য সোফায় বসে আছেন পাশাপাশি। দু তরফের দৃষ্টি পরস্পরের লগ্ন হয়ে থমকে রইল কিছুক্ষণ। বুবনা হঠাৎ তড়াক করে লাফিয়ে উঠে এয়ার ইণ্ডিয়ার মহারাজার ভঙ্গিতে বললেন, 'আইয়ে আইয়ে, মিট আওয়ার নিউ চিফ মিনিস্টার।' বুবনার হাতে লম্বা একটা কাগজ। ওদিকে রাজ্যপাল ঢুকছে ধীর পায়ে, 'ওয়েল কাম', 'ওয়েল কাম'। বুবনার হাতে অনাস্থার চিঠি, দলত্যাগী মন্ত্রীদের লিস্ট। আমার হাতে রেজিগনেশান লেটার। কোনটা আগে জমা পড়বে! রাজ্যপাল দুদিকে দু হাত মেলে বললেন, 'নো প্রবলেম, অই হ্যাভ টু হ্যাণ্ডস।'

ভালো বাসা মোরে ভিকিরি করেছে

ওই যে মোড়ের মাথায় হল্‌দে রঙের বাড়িটা দেখছেন, ওই বাড়িতে আমি থাকি। আমি থাকি, আমার বউ থাকে, আমার এক ছেলে আর মেয়ে থাকে। ছেলে বড় আর মেয়ে ছোট। আমি ইচ্ছে করলে আমার বাড়ির বাইরে একটা মার্বেল ফলক লাগাতে পারি ; তাইতে লেখাতে পারি 'প্ল্যানড্ ফ্যামিলি।'

আমি ইচ্ছে করলে আমার পরিবারের সভ্যসংখ্যা আরো অনেক বাড়াতে পারতুম। সে ক্ষমতা আমার ছিল। সাহসে কুললো না, ফলে, হাম দো, হামারা দো। একটা কথা চুপি চুপি বলে রাখি, এখন যা বাজার পড়েছে, তাতে যে কোনও লোকের তিনটে ছেলে হলে ভাল হয়। একজন মাস্তান হবে, আর একজন হবে নেতা, আর একজন পুলিস। একেবারে আদর্শ পরিবারের কাঠামো। হেসে খেলে রাজত্ব করে যাও। ব্যক্তিগত সম্পত্তির অভাব হলেও জাতীয় সম্পত্তির অভাব নেই। পার্কের রেলিং খুলে বেচে দাও। ট্রেনের কামরা থেকে আলো, পাখা, গদি আপন ভেবে খুলে নিয়ে এসো। চারদিকে নানা রকম কনস্ট্রাকসান হচ্ছে, প্রচুর মালপত্র পড়ে আছে রাস্তাঘাটে। একটু কষ্ট করে তুলে আনো। এনে আবার সেইখানেই ফিরিয়ে দাও। একেই বলে লেনদেন। জমি কেন, বাড়ি কর, গাড়ি কর। ফুরফুরে নেশা কর। এদিক সেদিক যাও। শহরে আবার বাঈজী-কালচার ফিরে আসছে। ওড়াও, ওড়াও, দু হাতে কারেনসি নোট ওড়াও। তা, এই নয়া বাতাসে পাল তুলতে পারিনি আমি। আমার পালে সেই পুরনো বাতাস। ধর্ম নিয়ে, আদর্শ নিয়ে এক বিশ্রী অবস্থা। লোভ আছে, সাহস নেই।

আমি আমার বউকে ভীষণ ভয় পাই। সব আদর্শবাদী স্বামীই পায়, আমি একটু বেশি পাই ; কারণ আমি ঝগড়াঝাটি ভীষণ অপছন্দ করি। আমি মনে করি কোনও ভদ্রলোকের, স্ত্রীর সঙ্গে ঝগড়া করা উচিত নয়। আর স্ত্রী আর হেডমিস্ট্রেসে খুব একটা তফাত নেই। সব স্বামীই স্ত্রীদের ছাত্র। কত কি শেখার আছে! আর সেই শিক্ষা তো স্ত্রীর পাঠশালাতেই হয়। আমার স্ত্রী এই এতদিন পরেও প্রায়ই বলে, 'কবে যে তুমি একটু মানুষ হবে?'

'আমি এখন তাহলে কী?'

স্কুলে শিক্ষকরা চিরকাল বলে এসেছেন, 'এমন সিনসিয়ার গাধা খুব কম দেখা যায়।'

আমার বউ স্পষ্ট মুখের ওপর বলে, 'তুমি একটা অমানুষ।' অর্থাৎ জন্তুর জান্তব গুণাবলী চোলাই করে ঈশ্বর আমাকে মানুষের বোতলে পুরে পৃথিবীতে ঠেলে দিয়েছেন। আর আমার স্ত্রী দয়া করে সেই বোতলটিকে তুলে নিয়েছে। কত বড় উদারতা। এই উদারতার জন্যে চিরকাল আমাকে কৃতজ্ঞ থাকতে হবে। 'সিট ডাউন', বললে বসতে হবে। 'গেট আপ', বললে উঠতে হবে।

আমি আমার ছেলেমেয়েদের কোনওভাবেই জানতে দিতে চাই না, যে আমি প্রেম করে বিয়ে করেছি। প্রেম বাঙালীর রক্তে হেমোগ্লোবিনের মতো মিশে আছে। নারী জাতির প্রতি প্রেম। বিয়ের সময় আমরা যে পণ চাই, বিয়ের পরে বধূ নিগ্রহ করি, কখনও পুড়িয়ে মারি, বা সিলিং-এ ঝুলিয়ে দিই, সেটা স্ত্রীর প্রতি বিদ্বেষ নয়, শ্বশুর মশাইকে ঘৃণা। অধিকাংশ শ্বশুরেই পাকা ব্যবসাদার। কৃপণ। হাত দিয়ে জল গলে না। চোখের চামড়া নেই। ধুরন্ধর প্রকৃতির ব্যক্তি। সুন্দর সুন্দর মেয়ের পিতা হয়ে বিয়ের বাজারে লাঠি ঘোরাতে চান।

আমি একটু বোকা ধরনের উদার প্রকৃতির মানুষ, তাই ঠকে মরেছি। আমার ভায়রাভাই, যে আমার বউয়ের বোনকে বিয়ে করেছে, সে পাকা ছেলে। আমার শ্বশুরমশাইয়ের কানটি মলে কম বাগিয়েছে! ভাবলে মনটা কেমন করে ওঠে! একই বউকে তো দ্বিতীয়বার আর বিয়ে করা যায় না। যা হয়ে গেছে, তা হয়ে গেছে। পস্তে লাভ নেই। ভালবাসার পলস্তারা দিয়ে সব মসৃণ করতে হবে। ভালবাসা জিনিসটা ভোরের শিশিরের মতো। সংসার সূর্যে নিমেষে উবে যায়।

আমার হলুদ রঙের একতলা বাড়ি। সবে হয়েছে। এখনও অনেক কাজ বাকি। এই বাড়িই আমার বাঁশ হয়েছে। আমার জ্ঞানী বউয়ের পরামর্শে, সব বেচেবুচে, ধার দেনা করে তৈরি হয়েছে ইটের খাঁচা। এখন বাজার করার পয়সা জোটে না। ভিখিরির অবস্থা। অফিস থেকে লোন নিয়েছিলুম। কাটতে শুরু করেছে। মাইনে হাফ হয়ে গেছে। অথচ সংসার খরচ কোনও ভাবেই কমানো যাচ্ছে না। এই নিয়ে স্বামী স্ত্রীতে ঘনঘন বাজেট অধিবেশন হয়ে গেছে। কোনও দিক থেকেই কোনও সুরাহা হয়নি। আমরা তো আর স্টেট নই যে মদের ওপর, কি ডিজেলের ওপর, কি সিগারেটের ওপর, কি গমের ওপর ট্যাক্স বসিয়ে দেবো! এ হল ফ্যামিলি। একটাই রাস্তা, খরচ কমানো।

দুধের খরচ কমানো যাবে না। ছেলে মেয়ের হেলথ খারাপ হয়ে যাবে। ওরাই তো আমাদের ভবিষ্যৎ। দেশেরও ভবিষ্যৎ। ঠিক মতো লালনপালন

করতে পারলে কত কি হতে পারে। এদেশে এখনও কেউ আইনস্টাইন হয়নি, রাসেল হয়নি। এদেশে অ্যাব্রাহাম লিংকনেরও খুব প্রয়োজন। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি একেবারে যাচ্ছেতাই। সারা ভারতে রাজনীতির চোলাই তৈরি হচ্ছে। চতুর্দিকে আড়ং ধোলাই শুরু হয়েছে। সারা বিশ্ব হিংসায় ভরে গেছে, একজন যীশু এলে মন্দ হয় না। আমার শিশুটিও যীশু হতে পারে। কে কি হবে, বলা তো যায় না। আমার বউ অবশ্য সন্দেহ করে, 'তোমার মত পিতার সন্তান কত দূর কি করতে পারবে সন্দেহ আছে। গাছ অনুযায়ীই তো ফল হবে।' আমি ভয়ে বলতে পারি না যে, 'তুমি তো জমি। বীজ ধারণ করেছিলে। সেই জমিতেও তো আমার সন্দেহ। বীজের দোষ না জমির দোষ।' সাহস করে বলি না। বললেই দাঙ্গাহাঙ্গামা বেঁধে যাবে। মেয়েদের সঙ্গে ঝগড়ায় আমি পারবো না ; কারণ আমার মেমারি তেমন ভালো নয়। মামলা আর বউয়ের সঙ্গে ঝগড়ায় 'পাস্ট রেফারেন্সের' খুব প্রয়োজন হয়। দশ বছর আগে এক বর্ষার রাতে আমি কি বলেছিলুম, আমার বউয়ের মনে আছে। লিভিং রেফারেন্স ম্যানুয়েল। মাঝে মাঝে মনে হয় মেয়েদের স্মরণশক্তি বেশি, না বিয়ে হলেই স্মরণশক্তি খুলে যায়! আমার তো কালকের কথা আজ মনে থাকে না। টেপের মতো সব ইরেজ হয়ে যায়।

বেশ, দুধ কমানো যাবে না। বোতলের সাদা জল, পলিথিনের ব্যাগে ভরা থলথলে সাদা জলে বাঙালীর ধৃতি, পুষ্টি, মেধা। সারা পরিবারে ভাগ বাঁটোয়ারায় আধকাপ মাথাপিছু পেটে না গেলে মনস্তাত্ত্বিক দুর্বলতা দেখা দেবে। গ্যাসের খরচ কমানো যাবে না। গ্যাস দিয়ে আর গ্যাস নিয়েই তো আমাদের জীবন। চাবি ঘুরিয়ে জ্বালতে জ্বালতেই বেশ কিছুটা বাতাসে পাখা মেলে উড়ে যাবে। সারা বাড়ি খুশবুতে ভরে যাবে। হাতের কাছে সব গুছিয়ে নিয়ে রাঁধতে বসার নির্দেশ থাকলেও সম্ভব হবে না। সেইটাই আমাদের চরিত্র। বিদ্যুতের বিল উত্তরোত্তর বাড়বে বই কমবে না। লোকলৌকিকতা যা ছিল তাই থাকবে। শিক্ষার খরচ দিন দিন বাড়বে। প্রতিটি বিষয়ের জন্যে এক একজন গৃহশিক্ষক। তা না হলে পরীক্ষায় গোল্লা। অশ্রু বিসর্জন করে, নাকে কেঁদে লাভ নেই। যে খেলার যা নিয়ম। খরচ কমাবার কোনও রাস্তা নেই। শুধু বেড়ে যাও, ছেড়ে যাও, উড়িয়ে যাও, পুড়িয়ে যাও।

ছেলেবেলা থেকে শুনে আসছি, ওয়েস্ট নট ওয়ান্ট নট। অপচয় বন্ধ করো, অভাব হবে না ; কিন্তু স্বভাব যাবে কোথায়! মহিলাদের স্বভাব হল, তাঁরা

অন্যকে উপদেশ দেবেন, সেই উপদেশের সিকির সিকি নিজেদের জীবনে পালন করবেন না। আমার স্ত্রী পাশের বাড়ির বউটিকে উপদেশ দেন, 'স্বামী অফিস থেকে ফেরা মাত্রই অমন মেজাজ দেখাও কেন। আগে আসতে দাও, বসতে দাও, শান্ত হয়ে চা-টা খেতে দাও। তারপর যা বলার বলো। বলবে বইকি। স্বামীকে বলবে না তো কাকে বলবে। পৃথিবীতে ওই একটাই তো লোক! জীবন সাথী।'

এই উপদেশ আমি নিজের কানে শুনেছি। কিন্তু আমার বেলায় ঠিক উলটোটাই হয়। আপনি আচরি ধর্ম, এই নীতিবাক্যটি ভদ্রমহিলা হয়তো বহুবার শুনেছেন ; মগজে তেমন ছাপ ফেলেনি। ঢোকার দরজার মুখে একটা পাপোশ আছে। সেইখান থেকেই শুরু হয়। 'কী হোলো। পাপোশটা কী জন্যে রাখা হয়েছে! ছাপ্পান্ন টাকা নগদ দাম দিয়ে কেনা হয়েছে কী কারণে! তোমার হাইজাম্প প্র্যাকটিশ করার জন্যে! ওই নোংরা জুতো নিয়ে ছাগলের মতো লাফিয়ে আমার এমন সুন্দর মোজাইক মেঝেতে দাগ ফেলে দিলে! জানো না মোজেকের মেঝে কী সংঘাতিক সেনসিটিভ। একবার দাগ ধরে গেলে সহজে উঠতে চায় না! অকজ্যালিক অ্যাসিড ঘষতে হয়, মোমপালিশ করতে হয়। আর রাস্তার জুতো নিয়ে ভেতরেই বা আসা কেন? ন্যাস্টি হ্যাবিট!'

আমারও মেজাজ ঠিক থাকে না। জ্যাম ঠেঙিয়ে, ধুলো ঘাম ডিজেলের ধোঁয়া গায়ে মেখে, ঘাড়ে পিঠে সহযাত্রীদের রন্দা খেয়ে, ময়ান দিয়ে ঠাসা লুচির ময়দার তালের মতো বাড়ি ফিরে দরজার মুখ থেকেই শুরু হলে, কার ভাল লাগে। আমার মোজেক। তোমার মোজেক মানে। পুরো প্রোডাকসানটাই তো আমার। চিত্রনাট্য, পরিচালনা, সংগীত, গীতরচনা, সবই তো আমি করেছি। ভাদ্রমাসের রোদে পোস্টাপিসের পিওনের ছাতা মাথায় দিয়ে মিস্ত্রী খাটিয়েছি। নাক দিয়ে সিমেন্ট টেনেছি। পা দিয়ে মশলা দলেছি। জোগাড়ের অভাব হয়েছে যেদিন, ক্যানেস্তারা ক্যানেস্তারা জল ঢেলে ইট ভিজিয়েছি। পয়সা ছিল না ; মোজেক ঘষাবার মেশিন আনতে পারিনি, নিজেই হাঁটুগেড়ে বসে পাথর দিয়ে ঘষে দানা বের করেছি। সেই থেকে আমার হাঁটুতে কড়া, কোমরে সায়াটিকা। ভাদ্রের রোদে পুড়ে জন্ডিস। সেই থেকে চোখ দুটো ঘোলাটে হলুদ। আর এখন, সেই সাধনার পীঠস্থানে জুতোসুদ্ধ পা রেখেছি বলে খাঁতানি খেয়ে মরছি।

বেশ চড়া গলাতেই বলতে হয়, 'জুতো তাহলে রাখবো কোথায়!' মাথায়!'

'মাথায় তো রাখতে বলিনি ; বাইরের সিঁড়ির একপাশে রাখতে পার।'

'তিনদিন আগে আমার নতুন কোলাপুরির একটা কুকুরের মুখে করে নিয়ে গেছে।'

'গাছে তুলে রাখো।'

জমিটা যখন কিনি, তখন সেখানে একটা ফলসা গাছ ছিল। গাছটাকে কায়দা করে বাঁচানো হয়েছে। সেই গাছে জুতোটাকে ঝোলাবার পরামর্শ। গাছ থেকে ফল পাড়ে। ফলের বদলে রোজ সকালে জুতো পাড়বো। বলা যায় না ডাল থেকে একটা সুদৃশ্য সিকা ঝুলিয়ে দিলে। এ তো কায়দার যুগ। রোজ জুতো সিকেয় তুলে বাড়ি ঢুকতে হবে।

আমার স্ত্রীর একটা ম্যানিয়া মতো হয়ে গেছে। ঘুরছে, ফিরছে, ঘাড় কাত পাশ থেকে আলোর বিপরীত দেখছে মেঝেতে দাগ পড়েছে কি না। পড়লেই স্পেস্যাল ন্যাতা দিয়ে, জল দিয়ে, লিকুইড ডিটারজেণ্ট দিয়ে ঘষে ঘষে পরিষ্কার করছে। আমারও রেহাই নেই। বসতে দেখলেই তেলেবেগুনে জ্বলে উঠছে, 'কি বসে বসে বাসি খবরের কাগজ পড়ছ! যাও না, সিঁড়ির ধাপ আর মেঝের স্ক্যার্টিংগুলো একটু পরিষ্কার করো না।'

বাড়ি করার পর একেই তো আমার চেহারাটা অষ্টাবক্র মুনির মতো হয়ে গেছে তার ওপর চব্বিশ ঘণ্টা এই অত্যাচার। দেয়ালে পিঠ রেখে বসা যাবে না। দেয়ালের রঙ চটে যাবে। মাথার পেছন লাগানো যাবে না। ছোপ ধরে যাবে তেলের। বাথরুম থেকে বেরিয়ে পাপোশে পনের মিনিট পা ঘষতে হবে। জল থাকলেই ঝকঝকে মেঝেতে দাগ পড়ে যাবে। কোথা থেকে এক জোড়া ছেঁড়া মোজা জোগাড় করে দিয়েছে, সেই মোজা পরে রোজ সকালে সারা বাড়ির মেঝে পরিষ্কার করো। টুথব্রাশ দিয়ে গ্রিলের ভাঁজ থেকে ধুলো ঝাড়ো। ঘাড় উঁচু করে দ্যাখো সিলিং-এর কোথাও ঝুল ধরেছে কিনা। এই সব করতে করতেই বেলা কাবার। না পড়া হয় সকালের কাগজ। না হয় ভাল করে খাওয়া। কোনওরকমে নাকে মুখে গুঁজে ছোট অফিস। প্রায়ই দাড়ি কামানো হয় না। খোলতাই চেহারায় এক মুখ কাঁচাপাকা দাড়ি। লোকে জিজ্ঞেস করে, কি হয়েছে বলুন তো আপনার?'

'ভাই, বাড়ি হয়েছে।'

'বাড়ি হলে এই রকম হয় বুঝি।'

'অনেকে টেঁসে যায়, আমি তো তবু বেঁচে আছি।'

একদিন সকালে ঢোকার মুখের মেঝেটা খারুয়া দিয়ে মুছছি আর পাশে হেলে হেলে দেখছি দাগ পড়েছে কি না, এমন সময় আমার প্রতিবেশী আশুবাবু এসে জিজ্ঞেস করলেন, 'কি রে বিশুবাবু আছেন?'

আমার নামই বিশুবাবু। ভদ্রলোক চিনতে পারেননি। আমি বললুম, 'বাজার গেছেন।'

'এলে তোমার বাবুকে বোলো দেখা করতে। শুধু বলবে ইনকামট্যাক্স।'

আমি ন্যাতা ফেলে তড়াক করে লাফিয়ে উঠলুম। 'ইনকামট্যাক্স মানে?'

আশুবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'আরে আপনিই তো বিশুবাবু। কি করছিলেন অমন করে, এমন অদ্ভুত পোশাকে?'

'হাউস মেনটিনেনস। মেঝে পালিশ না করে নিজেকে পালিশ করুন। চেহারার একি দশা। পায়ে মোজা পরেছেন কেন? শরীর গোলমাল।'

'না, না এটা আমার স্ত্রীর ব্যবস্থা। মেঝেতে দাগ পড়বে না।'

'কত রঙ্গই জানেন। কত রকমের পাগল আছে এই দুনিয়ায়। যাক, কাজের কথাটা বলে যাই। বাড়ি তো করলেন, ডিক্লেয়ারেশান দিয়েছেন ইনকাম ট্যাকসে?'

'সে আবার কি?'

'সে আবার কি, বুঝিয়ে ছেড়ে দেবে। বাড়ি তো করলেন, টাকাটা এল কোথা থেকে? কত টাকার সম্পত্তি? ঠিক ঠিক জবাব দিতে না পারলে হাতে হ্যারিকেন।'

'কেন, স্ত্রীর কিছু গয়না বেচেছি। ধার দেনা করেছি। কিছু জমেছিল। সব ঢুকিয়ে দিয়েছি ইটের পাঁজায়।'

'দেখে মনে হচ্ছে লাখ দুয়েক গলে গেছে। মোজাইক মেঝে। সেগুন কাঠের জানালা-দরজা। বরফি গ্রিল। কত গয়না বেচলেন মশাই! ধারই বা পেলেন কোথায়। এই বাজারে সংসার চালিয়ে জমেই বা কত?'

'মনে হচ্ছে, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন?'

'সন্দেহ নয়, সাবধান করতে এলুম বন্ধু হিসেবে। ওই যে মোড়ের মাথায় ক্ষীরঅলা বাড়ি করেছে। ওই যে সিলভার গ্রে রঙের বাড়িটা। কোন হিতৈষী বন্ধু একটি চিঠি ছেড়ে দিলে। ব্যাস্‌ কেঁচো খুঁড়তে সাপ।'

'এইরকম চিঠি ছাড়ে না কি?'

'ছাড়বে না? বাঙালীরা কত সমাজসচেতন জানা আছে আপনার। এই

যে হালফিল কালীপুজো গেল ; কত আনন্দ দিয়ে গেল বলুন তো ! ছেলেরা অষ্টপ্রহর গান শোনাবার ব্যবস্থা করেছিল। সারাদিন, সারারাত মুহুর্মুহু বোমা ফাটিয়ে শরীরের রক্তচালন বাড়িয়ে দিয়ে গেল। দু চারজন টেঁসেও গেল মানে মোক্ষলাভ হল। ছোটকথা কানে তোলার উপায় ছিল না। আবগারি বিভাগের রোজগারও বেড়েছিল। সকলেই মা-মাহা করছে। কানখাড়া করে আবার শুনলুম, মা নয় বলছে মাল। ইয়াং জেনারেশন একেবারে টং। বিসর্জনের প্রসেসন যাচ্ছে। একজন ধাক্কা মেরে নর্দমায় ফেলে দেয় আর কি। দেখি কেউ প্রকৃতিস্থ নয়। সকলের মুখেই চুল্লুর গন্ধ। সমাজসচেতন না হলে পারত এসব।'

'আপনিও তো বাড়ি করেছেন ?' ডিক্লেয়ারেশান ফাইল করেছেন ?'

'আমার বাড়ি তো আমি আমার বউয়ের নামে করেছি। চালাক লোকেরা তাই করে।'

আশুবাবু দুর্ভাবনা ঢুকিয়ে দিয়ে চলে গেলেন। এক কাপ পানসে চা নিয়ে দেওয়ানি খাশ'-এ পা ছড়িয়ে বসলুম। আগে একশো টাকা কেজির ফুরফুরে গন্ধঅলা চা নিয়ে বসতুম। সেই চা এখন চল্লিশ টাকায় নেমেছে। না আছে লিকার, না আছে ফ্লেভার। বাড়ি করে 'পপার' হয়ে গেলুম। এখন দুম করে ভারী রকমের কাব্যের অসুখ করলে বিনা চিকিৎসায় মরবে। সামনেই আসছে বিয়ের মাস। গোটা তিনেক নিমন্ত্রণ পত্র আসবেই। বাড়িতে দেবার মতো যা ছিল সবই দেওয়া হয়ে গেছে। মাছের তেলে মাছ ভাজার আর উপায় নেই।

সেই হলুদ বাড়ি থেকে কিছুক্ষণ পরেই অষ্টাবক্র মুনির মতো একটি লোক বেরিয়ে এল। হাতে একটা ঢাউস ব্যাগ। পকেটে দশটি মাত্র টাকা। সেই টাকায় আলু হবে, কপি হবে, মাছ হবে, মাংস হবে। মাথাধরার ওষুধ হবে। গায়ে মাখা সাবান হবে। দাড়ি কামাবার ব্লেড হবে। আমার বউ বলে বাড়ি-অলাকে একটু কষ্ট করতে হয়। ট্যানা পরে ঘুরতে হয়। ভোলামহেশ্বরের কথা ভাবো।

উলটো দিক থেকে বিকট শব্দ করে একটা মটোরবাইক আসছে। দেখেই বুকটা ধক করে উঠল। গ্রিলঅলা এখনও অনেক টাকা পাবে। মোটাসোটা, গাট্টাগোট্টা এক ভদ্রলোক। আমাকে জমিয়ে একটা ঘুসি মারলে আর তিন দিন উঠতে হবে না। আমি সঙ্গে সঙ্গে পেছন ফিরে দাঁড়ালুম। পাওনাদারের কাছে

পেছনও নেই সামনেও নেই। মোটরবাইক ঠিক আমার পেছনে এসে থেমে পড়ল। ভুট্‌ভুট্‌, ভুট্‌ভুট্‌ মধুর শব্দ। সেই শব্দ ছাপিয়ে গলা, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো।'

ঘুরে দাঁড়াতেই হল। ভেবেছিলুম সকালেই পাওনাদারের মুখ আর দেখ্‌বো না। বললুম, 'বাজারে যাচ্ছি। আপনি যান। ওসব এখন আমার স্ত্রীই দেখছেন।'

মোটরবাইক ভটভটিয়ে বাড়ির দিকে ছুটল। কি হবে তা জানি না। মোড়ের কাছাকাছি এসে দেখি একটা সাইকেল ঢুকছে। মরেছে। ইটগোলার মালিক। বেশ ভালই পাওনা। নগদে শুরু করেছিলুম। ধারে ফিনিশ করেছি।

'এই যে বিশুবাবু, আপনার ওখানেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো?'

'চলে যান। সব আমার স্ত্রীর কাছে।'

সাইকেল চলে গেল। মনে পড়ল অল রোড লিডস টু রোম। হরেনের পান বিড়ির দোকানের কাছাকাছি আর এক পাওনাদার। ফটিকবাবু। আমার কনট্র্যাকটর। নীলরঙের শার্টের বুকপকেটটা ডিমভরা ট্যাংরা মাছের পেটের মতো, প্রায় ফাটোফাটো অবস্থা। আমি জানি ওই পকেটে কি আছে। সেই মারাত্মক লোমওঠা কুকুরের মতো মলাটওলা মাঝারি মাপের নোটবুকটা আছে। যার পাতায় পাতায় বর্গমিটার আর ঘনমিটারের হিসাব। আমাদের মতো চিৎ হয়ে শোয়া কুঁজোদের বধ করবার ব্রহ্মাস্ত্র খাতা খুলেই বলবেন, লিনট্যাল, ছাজা, সানশেড, বিম, পিলার, ঢালাই বাবদ, একটু থামবেন, তারপর এমন একটা অঙ্ক বলবেন, শোনামাত্রই শুয়ে পড়তে হবে।

ফটিকবাবু বললেন, 'আপনার কাছেই যাচ্ছি। আজ কিছু দেবেন তো! কিছুটা ক্লিয়ার করুন। আর কতদিন ফেলে রাখবেন?'

একগাল হেসে বললুম, 'যান, বাড়িতে যান না। এখন থেকে সবই আমার স্ত্রী দেখবেন।'

ফটিকবাবু নাচতে নাচতে চলে গেলেন। দু কদম এগোতে না এগোতেই, প্যাটেলের ছেলে। জানলা, দরজা, ফ্রেম, এইসব সাপ্লাই করেছিল। কত দেওয়া হয়েছে, আর কত যে পাবে, আমার কোনও ধারণা নেই। তাকেও হাসিমুখে বাড়িমুখো করে দিলুম।

বাজার প্রায় এসে গেছে। শীতের মুখ, মানসচক্ষে দেখতে পাচ্ছি টাটকা কপি, নতুন আলু, গলদা চিংড়ি। বুকপকেটে ময়লা একটা দশটাকার নোটমাত্র

সম্বল। হাতে বিশাল এক ব্যাগ। প্রথমে কিছু ইটপাটকেল ভরব। তারপর এককিলো আলু, একফালি কুমড়ো, দু বাণ্ডিল নটেশাক কিনে, একজোড়া ফুল কপি হাত দিয়ে ধরব। ধরে আদর করে ছেড়ে দোব। তারপর মাছের বাজার গিয়ে একটা বড়সড় মাছের খুব কাছে গিয়ে, ফিসফিস করে বলব, 'অহো কি সুন্দর।' তারপর তার চিকন শরীরে একটু দীর্ঘশ্বাস মাখিয়ে ফিরে আসব। আসার পথে পঞ্চাশগ্রাম কাঁচালঙ্কা কিনবো। কিনবো টাকায় ছটা পাতি লেবু।

সব শেষ করে বাড়িমুখো হতে গিয়েও থেমে পড়লুম। বাড়িতে তো এখন যাওয়া যাবে না। সেখানে তো চলেছে পাওনাদারদের দক্ষযজ্ঞ। ঘুপচিমতো একটা চায়ের দোকানে ঢুকে এক কাপ চায়ের হুকুম দিলুম। অনেকক্ষণ পরে একটা সিগারেট ধরাবার সুযোগ হল। যখন তখন ফুসফাস সিগারেট খাবার মতো সঙ্গীত আর নেই। ভালো বাসা মোরে ভিকিরি করেছে।

চায়ে চুমুক দিয়ে কাপটা সবে নামিয়েছি, দোকানদারকে পয়সা দিতে দিতে মোটামতো শ্যামবর্ণ এক ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়িটা কোথায়?'

'কে বিশ্বনাথ?' দোকানদার যেন বিরক্ত হলেন।

'নতুন বাড়ি করেছেন। এই কাছাকাছি কোথাও।'

আমি আর থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলুম, 'বিশ্বনাথবাবুর বাড়ি খুঁজছেন কেন?'

'আপনি চেনেন?'

'কেন খুঁজছেন বলুন?'

'আমি ইনকামট্যাকসের লোক।'

সঙ্গে সঙ্গে দোকানদার বললেন, 'জানেন তো বলে দিন না।'

'আমিই সেই অধম। আমার নাম বিশ্বনাথ বোস।'

ভদ্রলোকের মুখ দেখে মনে হল অনেকদিনের এক পলাতক আসামীকে ধরে ফেলেছেন।

'বিশ্বনাথ বোস? চলুন বাড়ি চলুন। কথা আছে।'

বাড়ির বাইরে তখন সব সার দিয়ে বসে আছে। গ্রিলঅলা, কাঠঅলা, ইট-চুন-সুরকিঅলা, কনট্র্যাকটার। তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আমার স্ত্রী। মুখে মোনালিসার হাসি। ইনকামট্যাকসের ভদ্রলোককে সামনে খাড়া করে দিয়ে

বললুম, 'এই নাও, আর একজন। ইনি আরও বড় পাওনাদার, পাওনাদারদের মহেশ্বর, খোদ ইনকামট্যাক্স। যথাবিহিত সম্মানপুরঃসরঃ নিবেদনমিদম।'

আমার স্ত্রী আরও মধুর হেসে বললেন, 'ভালই হয়েছে। এসেছেন। ইনকামের জীবন্ত সব সোর্স এই সামনে লাইন দিয়ে বসে আছেন। আর আমি মা দুর্গা। কেউ আমাকে গ্রিল দিয়েছেন, কেউ দিয়েছেন কাঠ। কেউ দিয়েছেন বাঁশ। কেউ দিয়েছেন চুন সুরকি। এই আপনার সোর্স। সবাই এখন গলায় গামছা দিয়ে পাক মারছেন। আপনিও মারুন।'

আমার সেই মুহূর্তে মনে পড়ল গানের লাইন—ওই দেখা যায় বাড়ি আমার, চৌদিকে মালঞ্চ নয়, পাওনাদারের বেড়া।

পথে বসালেন

ওরে বাবারে বিশ্বকাপ ক্রিকেট এসে গেছে। সারা বিশ্বে এর চেয়ে বড় ঘটনা আর কি আছে। বন্যা, খরা, পতনমুখী ডলার, ধসেপড়া শেয়ারবাজার, উর্ধ্বমুখী পাউন্ড, বেকার সমস্যা, উধাও সরষের তেল, নিমকহারাম নুন, মহার্ঘ আলু, কোনও কিছুই কিছু নয়। ক্রিকেট।

আমার সাদাকালো টিভি মাঝরাতের এক ঘণ্টা আগে তিনবার ঝিলিক মেরে একটা চিরুনির মতো চিত্র বুকে ধারণ করে চোখ মারতে লাগল। সবাই এক বাক্যে বললেন, মায়ের ভোগে। পরের দিন মটোর সাইকেল ভটভটিয়ে বদ্যি এলেন। পেছন দিকের কুঁজ খুলে, ইনস্টেসটাইন পর্যবেক্ষণ করে বললেন, 'পিচকার টিউব খতম হো গিয়া।'

'আমি সংশোধন করে দিলুম, 'পিচকার নেহি, পিকচার।'

তিনি বললেন, 'ওই হল। সারাদিন রাত যে ভাবে পিচকিরির মতো প্রোগ্রাম ছিটোয়। কলকাতা হল তো দিল্লি, দিল্লি গেল তো বাংলাদেশ। নিন অনেক টাকার ধাক্কা। কি করতে চান বলুন?'

সঙ্গে সঙ্গে পরিবার পরিজনের উল্লাসের চিৎকার, 'বলো হ্যারি বিদেয় করো, বিদেয় করো, লে আও কলার।'

আমাদের বাড়িতে যে মহিলা কাজ করে, সে বললে, 'ভগমান যা করেন মঙ্গলের জন্যে। ওই যে সুনীল বাবুর বাড়িতে করাল এনেছে, কি সুন্দর, হলদে মানুষ, সবুজ মানুষ সব নেচে নেচে বেড়াচ্ছে।'

যেখানে যা ছিল সব তুলে, বউয়ের ঝাংটি বেচে দোকানে গেলুম। হরেক রকমের যন্ত্র। 'কি নেবেন, অস্কার, নেলকো, ওয়েস্টন, বি পি এল, পি এইচ এক্স, অজন্তা, ওনিডা। ওই দেখুন সব লাইন লাগিয়ে বসে আছে।'

'দাম?'

'নয়, দশ, বারো, পনের, বাইশ, চব্বিশ, খুচরোটা আর বললুম না।'

'বলতে হবে না, হাটে যা চোট লাগার লেগে গেছে। বলুন কোনটা কেমন? টিভি কেনা নয় তো, বিয়ে করা। একবারই ঢুকবে। মরে বেরোবে।'

ভদ্রলোক বিভিন্ন পাত্রীর গুণাবলী ব্যাখ্যা করতে লাগলেন। এর একটা স্পিকার। ওর দুটো, ওর চারটে। চতুর্মুখ, চারদিকে শব্দ ছড়াবে। বাথরুমে

বসেও চিত্রহার শ‍ুনতে শ‍ুনতে তালে তালে…।'

'সমঝ গিয়া, সমঝ গিয়া।'

'এর মেটাল বডি, ওর মোল্ডেড বডি। শব্দ ভরাট। এটার চ্যাপ্টা, ফ্ল্যাট টিউব, ওর কালো টিউব। এটার সঙ্গে রিমোট কণ্ট্রোল, খাটে বসে কণ্ট্রোল করতে পারবেন। এর রিমোট কণ্ট্রোলের এত শক্তি যে, পাশের বাড়ি থেকে কণ্ট্রোল করতে পারবেন। এটার ভেতর মেমারি ফিট করা। হাত্তপা লাগানো, নিজে নিজেই, চ্যানেল, রঙ সব খ‍ুঁজে নেবে।'

'মান‍ুষের মতো?'

'মান‍ুষের বাবা।'

'তা ঠিক। পরিবারে টিভিই তো সব। বাপ মা ভেসে গেছে।'

'হ্যাঁ এটার স্ক্রিনে চ্যানেল, কালার প্যার্টান নাচানাচি করে।'

ওরই মধ্যে একটিকে তুলে নিয়ে এল‍ুম। সঙ্গে সঙ্গে নাচানে, বন্ধ‍ুবান্ধব প্রতিবেশীরা এসে বলতে লাগলেন, এ কি করলে, এটা আনলে কেন? ওটা আনা উচিত ছিল, যার বিজ্ঞাপনে কাঁচ ফেটে একটা গিরগিটি মান‍ুষ বেরিয়ে আসে।

তিন রাত ঘ‍ুম হল না। দ‍ুশ্চিন্তা, দ‍ুর্ভাবনা, মনোবেদনা, হতাশা, আফশোস। ফুলশয্যা হয়ে গেছে, আর উপায় নেই। ফেরৎ দেওয়া যাবে না। ছটা বেড়ালের সবচেয়ে ডাকব‍ুকোটা একদিন সাহস করে শ্রীদেবীর ম‍ুখে আচমকা থাবা মেরে অ্যান্টি গ্লেয়ার স্ক্রিনে ছোট্ট একটা আঁচড় ফেলে দিয়েছে।

হ‍ুকুম হল, কালার টিভি তো রঙচটা ঘরে থাকতে পারে না। সেই একবার বিয়ের সময় জানালাদরজা, দেয়ালে রঙ পড়েছিল। শেষ কো-অপারেটিভে যে কটা টাকা পড়েছিল, তুলে এনে দেয়ালে অফ হোয়াইট ইমালশান চাপাল‍ুম। ওদিকে শ্রীয‍ুক্ত ডালমিয়া, ইডেনের চেহারা ফেরাচ্ছেন, এদিকে আমি আমার ঘরের। বায়না হল, 'তিনটে গার্ডেন চেয়ার আনতে হবে। একটায় তুমি, একটায় তোমার বাবা, একটায় আমার বাবা। বেশ হাতপা খেলিয়ে বসবে! এক-আধ ঘণ্টার ব্যাপার নয় তো! সকাল পোনে নটা থেকে বেলা সাড়ে চারটে। আর জানালায় একটু ভাল জাতের পর্দা।'

যা কণ্টেস‍ুন্টে জমেছিল, সব শেষ করে, বিশ্বকাপের প্রস্ত‍ুতিপর্ব চুকল। একটু গাঁইগ‍ুঁই করে বলতে গিয়েছিল‍ুম, মেয়ের বিয়ে ছেলের এডুকেশান। এক

দাবড়ানি, 'মেয়ের বিয়ে তোমাকে দিতে হবে না। প্রেম হবে, প্রেম। ছেলের এডুকেশান, ছেলে নিজেই করে নেবে।' সেই প্রথম শুনলাম, চেষ্টার কিছু হয় না, সবই মানুষের ভাগ্য।

দেখতে দেখতে নিম্নচাপের ঝোড়ো বাতাসের মতো ক্রিকেট-ফিভার; ক্রিকেট টিম এসে গেল। পটাপট বই বেরোতে লাগল। খবরের কাগজের ভেতর কাগজ ঢুকল। জ্ঞান বাড়তে লাগল হুহু করে। কাগজ আর ম্যাগাজিনে ছাপা খেলোয়াড়দের ফুলসাইজ প্রিন্ট এ-দেয়ালে, সে-দেয়ালে সাঁটা হয়ে গেল। এ-দেয়ালে হিরো গাওস্কার ও-দেয়ালে হিরো ইমরান। পাশের দেয়ালে কপিল হাঁ। পেছনের দেয়ালে, ভিভ রিচার্ডস আকাশ দেখছেন। মা দুর্গা, মা কালী, নারায়ণ সব ভেসে গেল। মেয়েরা দেখি সময় পেলেই ইমরানের ছবির দিকে গদগদ দৃষ্টি। ইমরানের মতো রমনীমোহন আর নাকি দ্বিতীয় নেই। জ্যোতিষীরা খেলোয়াড়দের কোষ্ঠী নিয়ে বিচারে বসে গেলেন। গাওস্কার বিদায় নেবেন। ইমরানও বেট ছেড়ে দেবেন। দুই উপমহাদেশেই ক্রিকেট-প্রেমীরা হায় হায় করছেন। রেশনের দোকানে রেপসিডের খোঁজে গেলুম, মালিক তেল ভুলে গাওস্কারকে নিয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন 'গাওস্কার না কি ব্যাঙাচির সঙ্গে কথা বলেন না?'

'ব্যাঙাচি? সে আবার কে?'

পরে বুঝলুম বেঙ্গসরকারের কথা বলছেন। ডাক্তারবাবু ব্লাডপ্রেসারের যন্ত্রে ফ্যাঁস ফ্যাঁস করে প্রেসার তোলেন, আর বলেন, 'ইন্ডিয়া পারবে?' প্রেসার ছেড়ে দিয়ে আবার তোলেন, আবার প্রশ্ন করেন, 'অস্ট্রেলিয়া শুনলুম ফুল স্ট্রেংথে আসছে না।' এদিকে রক্ত আটকান হাত টনটনিয়ে আঙুলে প্যারালিসিস হয়ে যাবার দাখিল। আধ ঘণ্টার ফ্যাঁস ফোঁসের পর জিজ্ঞেস করলুম, 'প্রেসার কত দেখলেন?'

ডাক্তারবাবু বললেন, 'প্রেসার তো দেবেই। পাকিস্তান ছেড়ে কথা বলবে। এবারের ওয়ার্লডকাপ ওরাই না নিয়ে যায়।'

'আমি আমার প্রেসারের কথা বলছি। পাকিস্তানের প্রেসার নয়।'

'আপনার আবার প্রেসার কি? অ আপনার প্রেসার দেখছিলুম না! দাঁড়ান।' আবার ফ্যাঁস ফ্যাঁস শুরু হল।

সেলুনে চুল কাটতে গিয়ে ঘাড়ের খানিকটা কপচে গেল। যিনি চুল কাটছিলেন, ভারতের জয়পরাজয় নিয়ে এত ভেবে পড়লেন যে আমার ঘাড়ে ক্ষুরের

এক কোপ বসিয়ে দিলেন না, সেইটাই আমার মহাভাগ্য।

গঙ্গায় স্নান করতে, করতে এক বৃদ্ধা বললেন, 'দেশে আবার সত্যযুগ ফিরে এল।'

'কেন ঠাকুমা ?'

'ওদিকে টেলিভিসানে রামায়ণ শুরু হয়ে গেছে। সুগ্রীব আর বালির ন্যাজ দেখেছ ? অত লড়াই করলে, তাও ধনুকের মতো ওপর দিকে খাড়া হয়েই রইল। খুলে পড়ল না। আর এদিকে কলকাতায় ভীষ্মের নামে কাপ হচ্ছে— ভীষ্মকাপ।'

পাড়ার ছেলেরা এসে বললে, 'দাদা কিছু চাঁদা ছাড়ুন দেশের স্বার্থে।'

'তার মানে ?'

'ক্রিকেট স্বস্ত্যায়ন যজ্ঞ করব আমরা। উদ্দেশ্যটা, গাওস্কারকে কিছুক্ষণ পিচে আটকে রাখা দৈববলে। গুরু আমাদের খেলে ভাল, হেভি রেকর্ড; কিন্তু ওই এক দোষ, হয় শূন্য করবে না হয় সেঞ্চুরি। গোটাকতক ক্যাচ ফসকে দিতে পারলেই মার হাম্বা। সেই যে সেঁটে যাবে, চার আর ছয়ের ফুলঝুরি। আর আমাদের গণেশ আর কার্তিক।'

'সেটা কী ?'

'অ জানেন না বুঝি! গণেশ হলেন কপিলদেব আর শ্রীকান্ত হলেন কার্তিক। গণেশের সব ভাল, প্রোবলেম হল, চল কোদাল চালাই, ভুলে মানের বালাই।'

'তার মানে ?'

'মানে, ওস্তাদ মাঝে মাঝে সব ভুলে যায়, এলোপাথাড়ি এমন ব্যাট চালায়, যেন ঝোপে কাটারি চালাচ্ছে। লাগে তুক, না লাগে তাক। ব্যাটে বলে হল তো ছয়, নয় তো মিডেল ইস্ট্যাম্প উড়ে গেল। আমরা যজ্ঞ করে একটা আকন্দের মূল মাদুলিতে ভরে কপিলদেবের কাছে পাঠিয়ে দোবো।'

'আকন্দের মূল কেন ?'

'আকন্দের আঠা, পিচে একেবারে সেঁটে যাবে। বল একেবারে লাল পান্তুয়ার মতো টপাটপ স্টেডিয়ামে গিয়ে পড়বে। ছয় কেবল ছয়। সব নয়ছয় করে দিয়ে কাপ ঘাড়ে নাচতে নাচতে বেরিয়ে আসবে। শ্যাম্পেনের ফোয়ারারা।'

'তা কত দিতে হবে ?'

'বেশি চাপ দোবো না। একটা হাফ পাত্তি ছেড়ে দিন।'

পঞ্চাশ টাকা পকেটে পুরে দেশহিতৈষীরা হাওয়া হলেন।

কাগজে খবর বেরলো ওয়ার্লডকাপের খেলা দূরদর্শন নাকি দেখাবে না। ভারতসরকার, পাকসরকার, দূরদর্শন কর্তৃপক্ষে জট পাকিয়ে গেছে। মহা কেলেংকারি! আমার আয়োজন ভেস্তে গেল বুঝি। পর্দা, রঙিন টিভি গোল-বাগান চেয়ার। কর্তা ব্যক্তিরা কয়েকদিন মাছ খেলানোর মতো আমাদের খেলিয়ে সিদ্ধান্তে এলেন, খেলা দেখান হবে। সঙ্গে সঙ্গে বাড়িতে সত্যনারায়ণ লেগে গেল। পাঁচ সের দুধের সিন্নি। লক্ষ্মীর ভাঁড় ভেঙে বাতাসা এসে গেল। দর্জি থেকে কাপড়জামা ডেলিভারি নেওয়া হল না পয়সার অভাবে।

অফিসে একটু অস্বস্তি। ছুটি কি ভাবে মিলবে। আমি তো আর মন্ত্রী নই যে টেবিলে টিভি ফেলে দেশসেবা আর ক্রিকেটসেবা একই সঙ্গে চালাবো। রথ দেখা কলাবেচার মতো। অফিস স্কুল নয় যে বগলে রসুন চেপে জ্বর নিয়ে আসব। অথচ ইণ্ডিয়া অস্ট্রেলিয়ার প্রথম খেলাটা দেখা দরকার। ইণ্ডিয়া কি ফর্মে ফিল্ডে আসছে জানা চাই। অফিসের কেউই তেমন ঝেড়ে কাশছে না। সকলেই সকলের দিকে মিটিমিটি তাকাচ্ছে। পুরো ডিপার্টমেণ্ট তো আর খালি করে খেলা দেখা যায় না! একজন বললেন, 'কেন যায় না, ক্রিকেট আগে না অফিস আগে!' আমাদের আবার কাগজের অফিস। 'সবাই ছুটি নিলে কাগজ বেরোবে কি করে?' সহকর্মী চুপসে গেলেন। টেবিলে আঙুল ঠুকতে থাকলেন, তাল দেখে মনে হল, মনে মনে গাইছেন, স্বাধীনতাহীনতায় কে বাঁচিতে চায় রে, কে বাঁচিতে চায়। অফিসে অনেকেই চেয়ারে বসে অজ্ঞান হয়ে যান। ডাক্তার এসে বলেন মাইলড্ স্ট্রোক। এক মাস বেড রেস্ট। সন্দেহ-বাদীরা বলেন, স্ট্রোক নয়, আপওয়ার্ড প্রেসার অফ উইণ্ড। আহা, সেইরকমই একটা হোক না আমার। পুরো পৃথিবী থেকে বিদায় নয়, একবার বিদায় দেমা ঘুরে আসি।

আমার এখন উইণ্ড চাই। মাদ্রাজী দোকানে গিয়ে দুটো বোম্বাই পোট্যাটো চপ খুব খানিকটা চাটনি দিয়ে খেয়ে এলুম। চড়িয়ে দিলুম দু গেলাস জল। অপেক্ষা করে করে বিকেল গড়িয়ে গেল। কোথায় কি! পেটটা কিছুক্ষণ বেলুনের মতো ফুলে রইল। সাতটার সময় সব তলিয়ে গেল। মধ্যবিত্তের হার্ট আর লিভার দুটোই বিলিতি মাল, সহজে টসকায় না। ধরলে বাতে ধরবে, না হয় ক্যানসার!

যা থাকে বরাতে। প্রথম দিনের খেলাটা মেরে দিলুম। কালার টিভির

উদ্বোধন হল বলা চলে। ঘর একেবারে ভরে গেছে। যে জীবনে ক্রিকেটব্যাট চোখে দেখেনি সেও এসে বসেছে। এক ভীষণভক্ত, তিনি মনে মনে জপ করে চলেছেন। আমার হাতে রিমোট কণ্ট্রোল। দুই বৃন্ধ পাশাপাশি বসেছেন। আমার এক প্রতিবেশী, তিনি পুরোহিত, সামনের সারিতে বসেছেন। আদুর গা। পরনে ধুতি। পইতেতে বাঁধা চাবি। চেয়ারের পাশে দুলছে। একটা বাচ্চা বেড়াল থাবা মেরে মেরে সেটাকে শিকার ভেবে কাবু করার চেষ্টা করছে।

বৃন্ধরা থেকে থেকে বলছেন, 'একটু অ্যাডজাস্ট করো, একটু অ্যাডজাস্ট করো। খুব ব্রাইট হয়ে গেছে।'

সঙ্গে সঙ্গে আমার রিমোট কণ্ট্রোল সক্রিয়। গাওস্কর বেশ ভালই পেটাচ্ছেন। তবে শান্তিতে বসার উপায় নেই। অনবরতই সদরে কড়া নড়ে উঠছে। অফিসে না গেলেই বোঝা যায়, সারা দিনে একটা পরিবারে কত ধান্দায় কত লোক আসে। ধূপ নেবেন, বলে এক মহিলা এলেন। স্বামীর কারখানা সাত বছর বন্ধ। ধূপই এখন বাঁচার পথ। সে যেতে না যেতেই এসে গেল বিহারী ফলঅলা। পাওনাদার। মা ধারে আপেল আর সিঙ্গাপুরী কলা খেয়েছেন। সে যেতে না যেতেই এসে গেল, ঝ্যাঁটার কাঠি নেবে মা ঝ্যাঁটার কাটি। তাকে পত্রপাঠ বিদায় করতে না করতেই এসে হাজির হাওড়ার এক আশ্রমের প্রতিনিধি, 'মা আমাদের প্রতি মাসেই কিছু সাহায্য করেন।' তাঁর ব্যবস্থা করে চেয়ারে এসে বসতে না বসতেই আবার কড়া। এবার যেন ডাকাত পড়েছে। আমার গুরুজনেরা বললেন, 'কেন ব্যর্থ চেষ্টা করছ! তোমার বসার উপায় রাখেননি ভগবান! বহুরকমের অশান্তি তৈরি করে রেখেছে। তুমি বরং চেয়ারটা তুলে নিয়ে গিয়ে দেউড়িতেই বোসো। আমাদের একটু শান্তিতে বসতে দাও।'

ভীষণ বিরক্ত হয়ে দরজা খুলতেই দশাসই এক মহিলা। আমার পরিচিতা। একটু বেশি উচ্ছল। ইনস্টলমেণ্টে শাড়ি বিক্রি করেন। মাঝে মধ্যে আমিও একটু প্রশ্রয় দিয়ে ফেলেছি। আমাকে প্রায় ঠেলেই ভেতরে চলে এলেন। আজ আবার একটু বেশি সাজের ঘটা। ভদ্রমহিলার সব কিছুই একটু উঁচু, উঁচু। গলা উঁচু, চলার ধরনও উঁচু, শরীরও উঁচু। ঢুকেই বললেন, 'আব্বাবা, কাজ নেই কম্ম নেই, এক ঘর লোক বসে বসে ক্রিকেট দেখা হচ্ছে, আর গেল গেল চিৎকার।' কথা শেষ করেই হাঁক পাড়লেন, 'বউদি, কই গো, কোথায় গেলে!'

বন্ধুরা সবাই চোখ ফেরালেন। বিরক্ত হয়ে বললেন, 'হু ইজ শি।' আর সেই মুহূর্তে কপিল ক্যাচ তুলে বীরের মতো প্যাভেলিয়ানমুখো হলেন। সবাই বলে উঠলেন, 'হোপলেস। হোপলেস। এই কি একটা ক্যাপটেনের খেলা! মাত্র ছ'রানে আউট!'

এক কপিলসমর্থক প্রতিবাদ করলেন, 'ক্যাপ্টেন হলেই কি সেঞ্চুরি করতে হবে! ক্যাপ্টেনদের মাথায় সব সময় কত দুর্ভাবনা চেপে থাকে জানেন আপনি? এই যে ছয় করেছে, এই আমাদের বাপের ভাগ্যি! লেন হটন কবার লেমডাক হয়েছেন জানেন? জানেন ব্র্যাডম্যান কবার হেঁচকি তুলেছিলেন। ক্রিকেট ইজ ক্রিকেট। কভী আঁধেরা, কভী উজালা।'

হঠাৎ একজন পুরোহিত মশাইকে লক্ষ্য করে ফিসফিস করে উঠলেন, 'মহা অপয়া। উনি থাকলে আমাদের হেরে মরতে হবে। মনে আছে, এ বছর তিনের পল্লির পুজামণ্ডপে আগুন ধরে গিয়েছিল। আরে উনিই তো ছিলেন পুজারী।'

সঙ্গে সঙ্গে একজন উঠে গিয়ে বললেন, 'ঠাকুরমশাই, এবার তো আপনার পুজোর বসার সময় হল!'

'পুজো? আজ আবার কিসের পুজো! আজ আমার বদলি ঠিক করে এসেছি। আমি সেই লাঞ্চের সময় বাড়ি গিয়ে ঝট করে লাঞ্চ সেরে আসব। আমি আসন করে বসেছি, ডোণ্ট ডিস্টার্ব। সেই থেকে ননস্টপ বগলামুখী স্তোত্র আউড়ে চলেছি। তাই তো অতি কষ্টে কপিলের কাছ থেকে ছয় আদায় করতে পেরেছি, নয় তো শূন্যতেই বাবাজীবনকে ফিরতে হত।'

'ঠাকুরমশাই লাঞ্চের সময় তো পেরিয়ে গেছে। বলুন ডিনার।'

'ওই হল আমি এখন কুম্ভক করে কালকে স্তব্ধ করে রেখেছি।'

কালকে আর কতক্ষণ স্তব্ধ করে রাখবেন, ওভারের পর ওভার এগিয়েই চলল। ভারত মাত্র একটা রানের জন্যে কুপোকাত হয়ে গেল। সবাই যেতে যেতে মন্তব্য করে গেলেন, টিভিটা অপয়া. এর আগের ব্ল্যাক অ্যাণ্ড হোয়াইটে ভারত বিশ্বকাপ জিতেছিল। সাংবাদিক সংবাদপত্রের স্তম্ভে লিখলেন, হাউ নট টু উইন। পাকিস্তানের প্রশংসায় সবাই পঞ্চমুখ। শেষ ওভারের শেষ বলে ছয় মেরে ম্যাচ জেতার স্নায়ু তাঁদেরই আছে। অস্ট্রেলিয়া একটা টিম! তারা তো 'আণ্ডারডগ'। আমাদের হকি তো গেছেই। ক্রিকেটটাও গেল। একটা মেয়ে অলিম্পিকে দৌড়বে বলেছিল, পি টি. উষা। তার আবার পায়ের শির টেনে ধরেছে। ভারতীয় ক্রিকেটবীরেরা এখন বিজ্ঞাপনে দাড়ি কামাবেন, ফলের

রস খাবেন, সুদৃশ্য জামা পরে চলমান সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠবেন।

কপিলদেবের ঠোঁটের কাছে মাইক্রোফোন ধরে প্রশ্ন করা হল, 'জেতার ম্যাচটা হারলেন কি করে?'—'ডাট মেরে।' তা অবশ্য বলেননি, বললেন, 'দিস ইজ অল ইন এ ক্রিকেট। একেই বলে ক্রিকেট। এই তো জীবন! যে দিকে তাকাই। বেয়ারা হুইস্কি লে আও।'

বিনিকে জিজ্ঞেস করা হল, 'শূন্যরানে আউট হলেন মশাই। এক সময় কি সুন্দর খেলতেন!'

—'সো, হোয়াট? প্রেমে, রাজনীতিতে আর ক্রিকেটে অসম্ভব বলে কিছু নেই। কপিদা কি করলেন!'

পরের দিন অফিসে গিয়ে উদ্বিগ্ন মুখে একটা ছুটির দরখাস্ত ঠুকে দিলুম, স্ত্রী ভীষণ অসুস্থ। এখন তখন অবস্থা। আরও চারটি দরখাস্ত পড়ল। ছুটি নেবার ওই একই কারণ, স্ত্রী অসুস্থ। ছুটির দপ্তরের বড়বাবু হাসতে হাসতে বললেন, 'বিশ্বকাপ কি রকম ভাইরাস দেখেছেন, ঘরে ঘরে স্ত্রীরা পটাপট অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। আপনার ডিপার্টমেন্টের এক ভদ্রলোক আমার প্রতিবেশী। সকালে তাঁর স্ত্রী আমাদের বাড়িতে এসেছিলেন টেলিফোন করতে। হাসলেন, বসলেন, চা খেলেন, তখন কি জানতুম ভদ্রমহিলা অসুখে মরোমরো।'

ওদিকে পাকিস্তানের বিজয়রথ গড়গড়িয়ে এগিয়ে চলল। শ্রীলংকা কাত। ইংল্যান্ড ফ্ল্যাট। ভারতকে লাহোরে গিয়ে পাকিস্তানের সঙ্গে লড়তে হবে। কি হবে ভাই, বলে কলেজে মেয়েরা একে অন্যের ঘাড়ে গড়িয়ে পড়লেন। শরীরের ওজন কমছে, কি ব্লাডপ্রেসার কমছে বলে মানুষ যত না ভেবে পড়ল রানরেট কমছে বলে তার চেয়ে বেশি ভাবনা। বাজারে সাতসকালে দু'জনে দেখা। প্রশ্ন, 'এখন কত যাচ্ছে?' উত্তর, 'প'য়তাল্লিশ টাকা।'

'ধ্যার মশাই তেলের দাম কে জিজ্ঞেস করছে! তেলের রেট নয়, রানরেট কত যাচ্ছে।'

'পড়েছেন, আপনাদের কপিল গাওস্কারকে কি রকম ঝেড়েছে।'

'ঝেড়েছে না কী! বেশ করেছে। না ব্যাটে, না বলে?'

'আপনি গাওস্কারের কি বোঝেন?'

'আপনি কপিলের কি বোঝেন? এ আপনার গঙ্গাসাগরের কপিল নয়, হরিয়ানার টাইগার'।

'বোম্বে ভার্সাস পাঞ্জাব হচ্ছে।'

'সে খেলা আবার কবে ?'

'করে আবার কী, ভারতের ক্রিকেটের আসল খেলাটাই তো বোম্বে আর পাঞ্জাবে। দেখা যাক সিদ্ধার্থ রায় কি করেন ?'

'শুনেছি ভাল ব্যাটসম্যান। পশ্চিমবাংলায় যখন চিফ মিনিস্টার ছিলেন, চকলেট রঙের গেঞ্জি পরে প্রায়ই মাঠে নেমে পড়তেন।'

'উনি তো এখন খালিস্তানীদের বিরুদ্ধে ব্যাট করছেন, সে তো দীর্ঘ ইনিংস ?'

'কি থেকে কি হয় কেউ বলতে পারে।'

'বাট গাওস্কর ইজ গাওস্কর। গাওস্কর মানেই রেকর্ড। কপিলের কি রেকর্ড আছে মশাই।'

নিউজিল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে গাওস্কর রেকর্ড করলেন। গোটা ম্যাচটাই রেকর্ড। পরপর তিনটে উইকেট নিয়ে বোলারের হ্যাটট্রিক। সারাটা জীবনের মতো তাঁর হয়ে গেল। ওই রেকর্ড ভাঙাও আর খাও। ছবি বাঁধাইয়ের দোকানে কাতারে কাতারে গাওস্কার। কার্ড বোর্ড দিয়ে বাঁধালে পঁচাত্তর, প্লেন পঞ্চাশ।

'লক্ষ্মীবাইণ্ডারের' মালিক বললেন, 'তোমার বাবার ছবিটা বাঁধাই হয়ে আজ এক বছরের ওপর পড়ে আছে; সেটার আগে ডেলিভারি নাও, তারপর না হয়...।'

'হেল উইথ ইওর ফাদার। এটাকে আগে চাঁড়িয়ে দিন। ফাইনালের পর মালাটা আমি কোথায় চড়াবো ?'

আমার সহকর্মী, ক্রিকেটপাগল তানাজীর থেকে থেকে ভাবসমাধি হতে লাগল। ঘোরলাগা মানুষের মতো একবার এদিক যায়, একবার ওদিক যায়। সমবায়িকায় রেপসিড অয়েলের লাইন দাঁড়িয়ে একবার সামনের ভদ্রলোককে বলে, 'গাওস্কর কি করলে দেখেছেন।' একবার পেছনের পেছনের সুন্দরী ভদ্রমহিলাকে বলে, 'এর নাম গাওস্কর। রেকর্ড। সারা জীবনটাই রেকর্ডের মালা। ওয়ান ডে ক্রিকেটে তিনহাজার রানের রেকর্ড।' চোখের দিকে তাকালে ভয় করে। ঠেলে যেন বেরিয়ে আসছে। কাজ করবে কি চেয়ারে চেপে বসানোই যাচ্ছে না। এরই মধ্যে হাজারখানেক টাকার ক্রিকেটের বই কিনেছে। মুড়ি কিনে এনেছিল। ঠোঙায় গাওস্করের ছবি দেখে, মুড়ি খাওয়া মাথায় উঠল। সব ফেলে ঠোঙা খুলে ইস্তিরি করতে বসে গেল। দুদিকে দুটো রেডিও ফিট করে রিলে শোনে। কোনও কমেণ্টস যেন মিস না করে। তানাজীর পাশে বসেন সিনিয়ার

জ্যোতিষদা। তিনি আবার রিলে শুনতে শুনতে কাগজে নোট করেন। রানের সংখ্যা, বলের সংখ্যা, অ্যাভারেজ, আস্কিং রেট। গণিতে পাকা। তাই কোনও কাঁচা কাজ নেই। একদিকে গড়গড় করে প্রুফ দেখছেন, অন্যদিকে খেলার গতি অনুসরণ করছেন।

'সারা ভারত জেনে গেল, ভারত আবার ওয়ার্লডকাপ জিতছে। কারুর ক্ষমতা নেই ভারতকে ঠেকায়। ব্যাটে মার আছে। শুধু চার আর ছয়। শরীরে কুলোলে মাঝে মধ্যে খুচরো এক কি দুই। ভারতের ভল্লেবাজরা এবারের ওয়ার্লডকাপে আঠাশটা ছয় মেরেছেন। যেখানে ইংল্যাণ্ডের ব্যাটধারীরা মেরেছেন মাত্র আটটা। ভারতীয় বোলারদের হাতে বল ঘোরে। বল ছোটে। পৃথিবীর সেরা টিম। আর কি, কাপ আমাদের! পাকিস্তান বিদায় নিয়েছে।

টাকে চুল গজাবার মতো কলকাতার ব্রহ্মতালুর খানিকটা অংশকে খুবসুরত করার খেলা চলেছে। ফুটপাথে রঙ চড়ছে। এক জায়গায় খানিকটা অশ্বকৃত্য পড়েছিল সেটাও রঙ হয়ে গেল। আবর্জনা, তার ওপর দিয়েই বুরুশ চলে গেল। সরাবার কি সারাবার আর সময় নেই। এখানে ওখানে তোরণ খাড়া হল। আগেকার বাবুদের যেমন ধুতি আর পাঞ্জাবির সাদা রঙ মিলত না, অনেকটা সেইরকম। ধুতি লালচে জামা দুধসাদা। কলকাতার ভূষণ অনেকটা সেই ধরণেরই হয়ে রইল। তা থাক। প্রচারেই আমরা তিলোত্তমা করে দেবো।

'সুপার সপার' বলে একটা সাত লাখ টাকার যন্ত্র এসেছে। নিমেষে মাঠ শুকিয়ে দেবার ক্ষমতা রাখে এই অস্ট্রেলিয়ান যন্ত্র। সেই যন্ত্রে চেপে ক্রীড়া মন্ত্রী সারা মাঠে ফুরফুর করে হাওয়া খেতে খেতে ঘুরে বেড়ালেন। সাংবাদিকরা ছবি তুললেন। যন্ত্রের সাক্ষাৎকার নেওয়া হল। যন্ত্র অবশ্য কথা বলল না। বললেন প্রতিনিধি। পিচে দশ বালতি জল ঢেলে যন্ত্র চালান হল। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দ্র। সবাই ধন্য ধন্য করলেন। অনেকেই চাইলেন বৃষ্টি আসুক। যন্ত্রের মহিমা দেখা যাক।

প্রার্থনা শুনলেন বরুণদেব। একটা নিম্নচাপ ঠেলে দিলেন। আকাশ কালো হয়ে এল অশ্রে হাজার দশেক বাড়ি ভেঙে পড়ল। প্রাণ হারালেন কুড়িজন। কলকাতার ক্রিকেট ব্যারনরা পড়ে গেলেন মহা ফাঁপরে। সাত লাখ টাক উসুলের জন্যে বৃষ্টি চাই। বৃষ্টি এদিকে দরমা চ্যাটাই আর পিচবোর্ডের তোরণের চাকচিক্য শেষ করে দিলে। রাস্তার কাদায় পার্কস্ট্রিটে রঙের জেল্লা ছেতরে গেল। প্রবীণা মহিলাকে কি আর অঙ্গরাগে যৌবন ফিরিয়ে দেওয়া যায়।

দু লরি থাশা জঞ্জাল চলেছে আলিপুর রোডের দিকে। চালক মাঝে মাঝে জিজ্ঞেস করছেন, "ডালমিয়া সায়েবের বাড়ি কোনটা ?"

"কোন ডালমিয়া ?"

"ওই যে ক্রিকেটমিয়া।"

"তিনি তো গোয়েঙ্কা !"

"ওই হল। দু লরি মাল ডেলিভারি দিতে হবে।"

"জঞ্জাল ডেলিভারি ! কেন ?"

"এটা আমাদের পৌর-আন্দোলন। হয় টিকিট দাও, না হয় জঞ্জাল নাও।"

টিকিট নিয়ে খাবলাখাবলি শুরু হয়ে গেল। কিছু টিকিট চলে গেল অন্তরালে, চোরাপথে পরে বেরুবে বলে। ক্রিকেট তো শুধু খেলা নয়। বড় ব্যবসা। বিগ বিজনেস। ধর্মের সঙ্গে মিল আছে। ক্রিকেট ধর্ম। গুরুরা আসছেন ভায়া বোম্বে।

সেমিফাইনাল। ভারত বনাম ইংল্যান্ড। কত রানে যে হারবে ইংল্যান্ড ! ভারত যে রকম টপ ফর্মে রয়েছে ! মেরে আর ফেলে ফাটিয়ে দেবে। গাওস্কর তো কেবল ছয় মারবেন। ছয়ের মাঝে হাইফেনের মতো গোটাকতক চার। শর্টরান নেবার আর দরকার কি !

প্রতিবেশীর বাড়িতে মাইফেলের মতো ক্রিকেট দেখার আসর বসেছে। ওই বাড়িতে আর এক গাওস্করের কুঁড়ি ধরেছে। বয়সে তরুণ, কেতায় তরুণের বাবা। সে এখন ড্রেস প্র্যাকটিস করছে। পাড়ার মাঠে খেলতে যাবার আগে তার ড্রেসের কি ঘটা ! যেন লেন হাটন নেট-প্র্যাকটিসে চলেছে। ধবধবে সাদা জামাপ্যান্ট। পায়ে লেগগার্ড। ক্রিকেট হেলমেট নেই, বদলে স্কুটার হেলমেট। ব্যাটটা যে-কায়দায় দোলায়, সারা জীবনে কত সেঞ্চুরি যে করবে ! রাতে ছাদে আলো জেলে, দুটো বাঁশের সঙ্গে বাঁধা আর একটা বাঁশে বল ঝুলিয়ে প্রায় মাঝরাত পর্যন্ত শ্যাডো-প্র্যাকটিস করে। পয়সাঅলা ঘরের ছেলে। অনেক চামচা জুটেছে। দোতলার ঘরে টিভি। তার সামনে জনাচোদ্দ ছেলে। হো হো চিৎকার। কানপাতাই দায়। সে আজ দশ কেজি বুড়িমার চকোলেট বোমা কিনে আসর সাজিয়েছে। ইংল্যান্ডের এক একজন আউট হচ্ছেন আর দোতলা থেকে আসপাশের বাড়িতে বিকট শব্দে বোমা ঝাঁপিয়ে পড়ছে ; সঙ্গে ডাকাতে চিৎকার। সেই চিৎকার মনে হয় বোম্বের মাঠের খেলোয়াড়রাও শুনতে পাচ্ছেন ; কারণ মাঝেমাঝেই তাঁরা অন্যমনস্ক হয়ে পড়ছেন।

ভারত মাঠে নামার সঙ্গে সঙ্গে পরপর গোটা ছয় সাত বোমা ফাটল। ওদের নিজেদের বাড়িরই জানলার কাঁচ ভেঙে পড়ে গেল। গাওস্কার পোজিশান নিলেন। অপর প্রান্তে বোলার বোলিং রান শুরু করেছেন। বুক টিপটিপ করছে। অনেকেরই ঠোঁট বিড়বিড় করছে। মনে হয় বলছেন, জয় বাবা গাওস্কর। তোমাকে বিশ্বাস নেই বাবা। নেগেটিভ, পজেটিভ দুটো রেকর্ডই তোমার হাতের মুঠোয়। চোখ বুজিয়ে ছিলুম। ঘরের সবাই চিৎকার করে উঠলেন, 'পেরেছে। পেরেছে।'

বৃন্দাবনবাবুকে ডাক্তার বলেছেন, একদিনের ক্রিকেটের শেষটা আপনি দেখবেন না। আপনার হার্ট নেবে না। আমারও সেই একই অবস্থা। অধিকাংশ সময় চোখ বুজিয়েই থাকি। হইহই শুনলেই চোখ খুলি। বুঝতে পারি ব্যাটে বলে হয়েছে। গাওস্করের পরের মারটা দেখার জন্যে সাহস করে চোখ খুলেই রেখেছিলুম। সেই মার যাকে বিদেশী সাংবাদিকরা বলেন, 'ফ্যান্টাসটিক'। 'স্পেকটাকুলার'। গাওস্কর ব্যাট তুললেন। বল পায়ের ফাঁক দিয়ে গলে স্টাম্প ছেতরে দিলে। কমেন্টেটার চিৎকার করে উঠলেন, আউট, হি ইজ ডেফিনিটলি বোল্ড আউট। বৃন্দাবনবাবুর কলেজে-পড়া মেয়ে, 'ও গাভাস্কর' বলে গোল গার্ডেন চেয়ার থেকে উল্টে মেঝেতে পড়ে গেল।

কে একজন বললেন, 'যাঃ, বাপের বদলে মেয়ের স্ট্রোক হয়ে গেল। সানস্ট্রোক হার্ট স্ট্রোক নয় ক্রিকেট স্ট্রোক।'

তাকে ধরাধরি করে তুলে বিছানায় শোয়ানো হল।

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'বাপের রক্তেও ক্রিকেট, মেয়ের রক্তেও ক্রিকেট।'

বাঙালির রক্তে যে কি নেই। স্লো-মোশান শুরু হয়েছে। আমাদের স্লো-মোশান যেমন হয়। ব্যাটসম্যান ব্যাট তুললেন। ধীরে বাঁদিকে ঘুরলেন। ক্যামেরা খেলোয়াড়ের পাছায় ফোকাস করে সেইখানেই আটকে রইল। বলের কি হল! কোথায় গেল! কে লুফল, দেখাবার উপায় নেই। গাওস্কর গ্লাভস খুলতে খুলতে প্যাভেলিয়ানে ফিরে আসছেন।

নিতুর হাহাকার, 'এ কি করলে গুরু। তোমার খেলা দেখব বলে, ছুটি পাওনা নেই, তাও ছুটি নিলুম। ছিছি, গুরু, এ কি করলে!'

'কপিলকে লাস্ট মোমেন্টে ল্যাং মেরে বেরিয়ে গেল। ছোট বড় অনেক কথা তুমি বলেছিলে ক্যাপটেন। এইবার ম্যাও সামলাও।'

'কিচ্ছু ভাবনার নেই। ভারতের ক্রিকেট, খেলা-নির্ভর নয় মশাই, ভাগ্য-নির্ভর-

দেখবেন লাস্ট মোমণ্টে একজন সেভিয়ার হয়ে দাঁড়াবে। তা ছাড়া আমাদের কপিলভাই আছে। এসেই বেধড়ক পেটাবে বাঘের বাচ্চার মতো। রানের ভলক্যানো ছুটবে।'

কপিল ভাই এলেন। মহিলারা আদর করে বললেন, 'ওই যে কপলে এসেছে। কপলে। দেখি বাছা শখানেক তুলে দিয়ে যাও তো। এবারে তোমার ব্যাটও গেছে বলও গেছে।'

কপিল ক্রিজে এসে দাঁড়ালেন। হাঁ করে ফ্যালফ্যালে, ভ্যালভ্যালে মুখে, এদিক ওদিক তাকাতে লাগলেন।

'কি খুঁজছেন বলুন তো ?'

'স্ট্যাডিয়াম দেখছেন। দেখছেন কজন ফিল্মস্টার এসেছেন ?'

'না না, বউকে খুঁজছেন। তাঁর ইশারাতেই তো ছয় আর চার হবে। ইনস্পিরেশান।'

প্রথম বলটা কপিল মেরেছেন। সবাই গানের সুরে গেয়ে উঠলেন, 'মেরেছে। মেরেছে। পেরেছে। পেরেছে।' গাওস্কর চলে যাবার পর, দর্শকরা এত হতাশ হয়েছেন, ধরেই নিয়েছেন এঁরা আসবেন আর যাবেন। কপিল আবার সেই ফ্যালফ্যালে মুখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। পেণ্টের কোমরে আঙুল ঢুকিয়ে টানাটানি করছেন।

'কি হয়েছে বলুন তো ?'

'অস্বস্তি হচ্ছে ! মনে হয় নিম্নবেগ।'

'ছারপোকাও হতে পারে।'

"না না। ভীষণ 'মুডি প্লেয়ার'। আজ আর খেলায় তেমন মুড নেই।"

'মুড নেই ! মামার বাড়ি। ভারতকে জেতাতেই হবে। কলকাতা সেজে বসে আছে, আসতেই হবে। পেটাও ভাই পেটাও। একটু হাত খোলো। ভারত আবার জগৎসভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।'

কপিল হাত খুললেন। মার ছক্কা। বল আকাশে। বাউণ্ডারি লাইনের কাছে নামছে। এক জোড়া হাত ধরার জন্যে প্রস্তুত। সবাই মনে মনে বলছেন, মিস্, মিস্টার, মিসেস। বিলিতি থাবা। কমেণ্টেটার চিৎকার করে উঠলেন, 'আউট। কপিল আউট।'

কপিল ফ্যালফ্যালে মুখে এদিকে ওদিকে তাকাচ্ছেন। আমার সাধ না মিটিল, আশা না পুরিল। বৃন্দাবনবাবু হাইকোর্টে প্র্যাকটিস করেন। তিনি

উত্তেজনায় চিৎকার করে উঠলেন, 'ইনজাংশান, ইনজাংশান।'

'ইনজাংশান মানে!'

'এখনও বোম্বে হাইকোর্ট খোলা আছে। সোজা গাড়ি নিয়ে চলে যাও। তিনশো তেত্রিশ ধারায় একটা স্টে-অর্ডার নিয়ে এসে খেলা বন্ধ করে দাও। আবার গোড়া থেকে শুরু করো। স্টেডিয়ামে অতগুলো লোক বসে বসে হায় হায় করছে। এই সামান্য বুদ্ধিটুকু মাথায় আসছে না! দেশে আইন-আদালত রয়েছে কিসের জন্যে! দুর্বলের ওপর সবলের অত্যাচার! সংবিধান বিরোধী!'

'বেআইনি তো কিছু করেনি ইংল্যান্ড।'

'করেছেন আম্পায়ার। এল. বি. ডব্লু মানেই জোচ্চুরি। কপিলের ক্যাচটা বাউন্ডারির বাইরে হয়েছে। আই অ্যাম সিওর অফ ইট। আজ আমি বোম্বেতে থাকলে খেলা বন্ধ করিয়ে দিতুম। একটা গাড়ি ওই ওয়ানখাডে স্টেডিয়াম থেকে বেরিয়ে আসত। সোজা হাইকোর্ট। ম্যাচের বারোটা।'

ভেবে আর লাভ নেই। এদিকে একে একে নিবিছে দেউটি। ভারতীয় খেলোয়াড়দের অন্য কোথাও বড় ধরনের কোনও অ্যাপয়েন্টমেন্ট আছে মনে হয়। সব এলোমেলো। একে একে আসছেন আর উইকেট ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলছেন। কে কত কম রানে আউট হতে পারে তারই যেন কম্পিটিশান চলেছে।

একজন করুণ সুরে বললেন, 'আর কি কোনও আশা নেই ভাই?'

'আর ব্যাটসম্যান কোথায়! সবাই তো বোলার!'

'কেন ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে পাকিস্তান তো পেরেছিল!'

'সে ভাই পাকিস্তান! তাদের কলজের জোর আছে।'

বৃন্দাবনবাবু বললেন, 'টিভি বন্ধ করে দাও। এর আর কোনও আশা নেই। হকি গেল। ফুটবল গেল। ক্রিকেটটাও গেল। ফিনিশড্। এ টিম আর কোনও দিন উঠতে পারবে না।'

শেষ ওভারের শেষ বল। রিলায়েনস কাপ থেকে ভারতের বিদায়। কপিলস ডেভিল্স হয়ে গেল কপিলস ইভিল। সারা পাড়ায় নেমে এল নিস্তব্ধতা। সেই স্তব্ধতা ভঙ্গ করে দুম করে একটা বোমা ফাটল কোথায়!

'কে বোম ফাটায়! চল, চল। দেশের শত্রু। মেরে ক্যালেন্ডার করে দিয়ে আসি।'

প্রবীরবাবুর ছেলে বোম ফাটিয়েছে। 'বেরিয়ে আয় শালা।'

ছেলেটি বেরিয়ে এসে বললে, 'এ বোম সে বোম নয়।'

'তার মানে ?'

'এ হল কালীপুজোর বোম।'

'কালীপুজোর বোম। মার শালাকে। মেরে চিত্রকুট করে দে।'

'ব্যাটাকে বোম মেরে শুয়োর করে দে। ইংল্যাণ্ডের সাপোর্টার।'

ছেলেটা হাসপাতাল চলে গেল। মোড়ে মোড়ে জটলা। এক এক জটলায় এক এক আলোচনা।

'ওই বোম্বের টিভি কোম্পানিই এর মূলে। চার মারলে পাঁচশো, ছয় মারলে হাজার ৷'

'আর ওই নিউজিল্যাণ্ডের সঙ্গে খেলায় গাওস্করের সেঞ্চুরি। কত পেয়েছেন জানিস, ২৫ হাজার।'

'আর লোগো কেলেঙ্কারির কথাটা বলো। ওটা চেপে গেলে চলবে কেন? লোগোর লড়াইয়ে তো দশজন খেলোয়াড় চুক্তি সই করতে চাইছিলেন না।'

'আর বিজ্ঞাপনের কথাটাও বলো। গাওস্করকে তুমি সাতটা কোম্পানির বিজ্ঞাপনে দেখতে পাবে। কপিলদেবকে ছটায়। রোজগার জানো, প্রত্যেকে দশলাখ টাকা কামিয়েছেন।'

'ক্রিকেট আর খেলতে হবে না। বিজ্ঞাপনেই ক্রিকেট খেলতে বলো।'

একটি মেয়ে তার প্রেমিককে বলছে, 'আমার আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না বিশু। মনে হচ্ছে জলে ডুবে আত্মহত্যা করি।'

'কোরো না মাইরি। একে আমি ভারতের শোকে মরছি। তুমি মরে গেলে ডবল শোক সহ্য করতে পারবো না। ক্রিকেট গেছে যাক, আমি তো আছি মানু। সরে এস, এই দুঃখের দিনে তোমার ঠোঁটে ঠোঁট ঠেকাই।'

'ওসব বাহানা ছাড়। কারুর সর্বনাশ। কারুর পোষমাস।'

'বাচ্চা কাঁদলে ললিপপ পায়।'

'আমার ঠোঁটটাকে তোমার ললিপপ হতে দোব না গুরু।'

ডবলডেকার বাসের পেছনে হাতে লেখা বড়বড় পোস্টার পড়ে গেল। ক্রিকণ্ট্রোল বোর্ড ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও। কপিল তুমি সরে যাও। তোমাকে চাইছি না, চাইবো না। আমার পাশের প্রতিবেশী ভারত ফাইন্যালে যাবেই জেনে, দু বোতল হুইস্কি মজুত করেছিলেন, আর বউকে দিয়ে দু কেজি মাংস রাঁধিয়েছিলেন। মাংস গেল রাস্তায়। হুইস্কি চলে গেল পেটে। সারা রাত ভদ্রলোকের আর্তনাদ, 'হায় হায়। ওই অপয়াটার জন্যে আমার সোনার বাংলা

শ্মশান হয়ে গেল রে।' ডুকরে ডুকরে কান্না।

'কে অপয়া!'

'আমি গো, আমি। টিভির সামনে থেকে উঠে গেলেই ছয়। এসে বসলেই আউট। বন্ধুগণ। ও বন্ধুগণ আমাকে জুতিয়ে লাশ করে দাও।'

শেষে গান ধরলেন, 'কি যে করি! উরে বাবারে! কি যে করি! উরে বাবারে!'

সারা রাত মাংস নিয়ে গোটাচারেক কুকুরের চুলোচুলি। বাপের জন্মে ওরকম মাংস খায়নি।

কাতারে কাতারে লোক ছুটছে ইডেনের দিকে। ক্লাবহাউসের সামনে পা ফেলার জায়গা নেই। কাল ফাইন্যাল? এক প্রবীণ বলছেন, 'জিনিসটা করেছে ভাল। তবে কি জানেন, একেই বলে নেপোয় মারে দই। কার আশায় আসর সাজান হল; আর আসছে কারা? বেত দিয়ে গেট করেছে দেখেছেন! একে বলে শিল্প।'

গাড়ি করে একজন ফিল্মস্টার চলেছেন। সমঝদারের চোখ। সবাই শোক ভুলে হইহই করে উঠলেন পুলিসের ঘোড়া ছুটে এল। লম্বা চওড়া বিখ্যাত এক লেখক ঢোলা পাজামা আর গেরুয়া পাঞ্জাবি পরে এগিয়ে আসছেন। আলোকিত ইডেন দেখতে এসেছেন। ফ্যানরা ঠিক ধরে ফেলেছে। বাসের টিকিটের পেছনে অটোগ্রাফ দেবার অনুরোধ। ফাইবার গ্লাসের স্বচ্ছ চাঁদোয়া দেখে এক মহিলার কি উল্লাস? টি ভি সম্প্রসারণের ঘেরাটোপের বাইরে থেকে কৌতূহলী মানুষের উঁকিঝুঁকি। এরই মাঝে বিনয় হারিয়ে গেছেন। সাথী-দের চিৎকার। একজন বললেন, চোপ! একদম চেঁচাবেন না। গর্ভনার রেগে যাবেন।"

সূর্য পশ্চিমে তলিয়ে গেল। সুনীল আকাশ। আবহাওয়া ফিরল ভারতের ভাগ্য ফিরল না। টিকিটের ভাগা দিয়ে সবুজ মাঠে সার সার বসে গেছেন লোভীরা। বাণিজ্য করার আশায় টিকিট ধরেছিলেন সব। এখন ভরা ডুবি। ভারত নেই। টিকিটের চাহিদাও নেই। পাবলিক এক একজনের কাছে যাচ্ছেন আর উঁকি মেরে বলছেন, 'দেখি এই দোকানে কি পাওয়া যাচ্ছে।' বিক্রেতা ক্লান্ত শুকনো মুখে তাকাচ্ছেন। সামনে ইট চাপা দশখানা চারশো টাকা দামের টিকিট। চারশো একশোয় নেমেছে, তবু ক্রেতা নেই। নির্জন জায়গায় একটি ছেলে দাঁড়িয়ে। চোখে পুরু লেনসের চশমা। হাতে ধরে

আছেন একটি মাত্র টিকিট। সকাল থেকে খাড়া। ঠোঁট শুকিয়ে গেছে। চুলে ধুলো। পাশে যেতেই বললেন, 'নেবেন দাদা?'

'কত দাম।'

'চার শো।'

'কমে?'

ছেলেটি কেঁদে ফেলল। ছাত্র। থাকে খড়গপুরে। নতুন সাইকেল বেচে ভারতের বিশ্বজয় দেখবে বলে টিকিট কিনেছিল। খেলা আর দেখতে চায় না। প্রয়োজনীয় সাইকেলটা ফিরে পেতে চায়। পকেটে একটা লজেনস্ ছিল এগিয়ে দিলুম, 'নাও মুখে ফেলে দাও। এক সময় আমি ক্রিকেটফ্যান ছিলুম। বৃহস্পতিবার থেকে ড্যাংগুলি-ফ্যান।'

পাশ দিয়ে একটি দল যেতে যেতে বললে, 'ঠিক হয়েছে। সব ব্যাটাকে পথে বসিয়ে দিয়েছে।'

বিকাশের বিয়ে

বিকাশ আমার বন্ধু। বিকাশ বিয়ে করবে। না করে উপায় নেই। ব্যাঙ্কে ভাল চাকরি পেয়েছে। পরিবারের একটি মাত্র ছেলে। নিজেদের বাড়ি আছে। বাবা মারা গেছেন। মায়ের বয়েস হয়েছে। বিকাশের বিয়ে অবশ্যম্ভাবী। আত্মরক্ষার জন্যেও বিয়ের প্রয়োজন। এদেশে অবিবাহিতা মেয়ের অভাব নেই। সকলেই যে প্রেম করবেন তা-ই বা আশা করা যায় কি করে! মেয়ের বাপ-মাকেই ভাল পাত্র ধরার জন্যে উদ্যোগী হতে হয়। বিকাশের হয়েছে মহা বিপদ। বিকাশ যেন তাজা ফুলকপি। বিকাশ যেন গঙ্গা থেকে সদ্য তোলা একটি ইলিশ মাছ। যাঁরা তাকে চেনেন, জানেন সকলেই তাকে ওই দৃষ্টিতে দেখেন। ঝোলাতে হবে। মেয়ের হাতের ইলিশ করে।

দু'চার কথার পরেই তাঁদের প্রশ্ন ইলিশের তেলের খোঁজে চলে যায়। কড়ায় ছাড়লে বিকাশ কতটা তেল ছাড়বে! ব্যাঙ্কের চাকরি? বাঃ বাঃ। কোন ব্যাঙ্ক? ন্যাশন্যালাইজড? এখন পাচ্ছ কতো? পাকা চাকরি? বেড়ে বেড়ে কোথায় উঠবে? প্রোমোশান আছে? বাঃ বাঃ। তা ছুটিছাটার দিন এসো না একদিন। একটু ফ্রায়েড রাইস, চিকেন। রবীন্দ্র সংগীত নিশ্চয় ভালবাসো। উমা আজকাল ভীষণ ভাল গাইছে। পল্লব সেনের প্রিয় ছাত্রী। তুমি ছবি ভালবাস না, ছবি? মেয়েটার আঁকার হাত দুর্দান্ত। নিজের মেয়ের প্রশংসা করা উচিত নয়। তবু না বলে পারছি না।

বিবাহযোগ্যা বাঙালি মেয়ের মা বাবার, বিশেষ করে মায়েদের যে কি উৎকণ্ঠা আর উদ্বেগের দিন কাটাতে হয় তা আমি জানি; কারণ আমার একটি বোন আছে। আমার মায়ের ঘুম চলে গেছে। এই বুঝি মেয়ে প্রেম করে বসল। এই বুঝি কোনও পাড়াতুতো মাস্তান মেয়ের হাত ধরে হেঁচকা টান মারল। আমার মায়ের যত রকমের উদ্ভট চিন্তা। আমার বাবার জীবন অতিষ্ঠ। বাবা অফিস থেকে ফেরা মাত্রই প্রথম প্রশ্ন, 'কি খোঁজ নিয়েছিলে?'

সারাদিন অজস্র কাজের চাপে বাবার কিছু মনেই নেই, ফলে মিথ্যে বলে কি অভিনয় করে পরিস্থিতি সামাল দিতে পারেন না। পাল্টা প্রশ্ন, 'কি খোঁজ বলো তো?'

ব্যাস লেগে গেল ধুন্ধুমধাড়াক্কা। 'ওই মেয়ে যখন তোমার মুখে চুনকালি মাখাবে তখন বুঝবে। সেইদিন তুমি বুঝবে। সেইদিন তোমার শিক্ষা হবে। কেউ বলবে না তখন আমার মেয়ে। সবাই তোমার নাম করে বলবে, ওমুকের মেয়ে।'

বাবার আর জামাকাপড় ছাড়া হল না, বিশ্রাম হল না, চা খাওয়া হল না। রেগে বেরিয়ে গেলেন। যেতে যেতে বললেন, 'আজ আমি যাকে পাবো তাকেই ধরে আনবো।'

খামোখা মাইল তিনেক অকারণ হেঁটে ধুঁকতে ধুঁকতে ফিরে এলেন রাত দশটায়। এই ভ্রমণের নাম প্রাতভ্রমণ নয়, পাত্র ভ্রমণ। এ তো হল গিয়ে রাগের পাত্র ভ্রমণ। ঠাণ্ডা মাথায় পাত্র-ভ্রমণ অহরহই চলছে। ভাল চাকুরে, অবিবাহিত ছেলেরা ঠিক ধরতে পারে। ভদ্রলোক বা ভদ্রমহিলা মাছ ধরতে বেরিয়েছেন। বগলে অদৃশ্য ছিপ। ছিপের সুতোয় ঝুলছে টোপ-গাঁথা বঁড়শি। মেয়ের গুণের টোপ, বংশপরিচয়ের টোপ, ভালমন্দ দেয়াটেয়ার টোপ। অনেকে আবার একটু বেশি দুঃসাহসী। চোখ দিয়ে দেহ জরিপ করেন, বুকের ছাতি, গলার মাপ। কেউ কেউ আবার কায়দা করে হাতের গুলি মেপে নেন। 'এই তো চাই, ফাইন ইয়াং ম্যান। এই তো চাই। সাহস, কারেজ, হেলথ।' ওপর বাহুটা কথা বলতে বলতে ধরে, তাগার মতো মেপে নিলেন। দেখে নিলেন, কতটা তাগড়া। বিয়ের ধাক্কা, সংসারের ধাক্কা সামলাতে পারবে কি না। ক্ষইতে কতটা সময় নেবে বাবাজীবন। পরে হয়তো একটু উপদেশ যোগ করলেন— 'ব্যায়ামট্যায়াম করো, একটু ভালমন্দ সময়মতো খাও, শরীরম আদ্যম। শরীরটাই সব।'

বাজারের মাছ আর ব্যাগের মাছের যা পার্থক্য। কোনও ক্রমে একটা ব্যাগে ঢুকে গেলে, আর দরদস্তুর নেই। কানকো তুলে তুলে দেখা নেই। বিকাশ সেই কারণেই ব্যাগে ঢুকে পড়তে চায়। ছেলে ভাল। তেমন লোভী নয়। শ্বশুরে মেরে হাণ্ডা চাপতে চায় না। সেরকম বন্ধুও আমার আছে। সোমেন। সে তো প্রায় দফতর খুলে বসেছিল, রাজনৈতিক নেতাদের মতো। পার্টি-অফিস। ঠিক সে খোলেনি। খুলেছিলেন তাঁর পিতা। ছেলের পেছনে ভদ্রলোকের যথেষ্ট ইনভেস্টমেণ্ট ছিল। অভাব সত্ত্বেও ছেলেকে সাংঘাতিকভাবে মানুষ করেছিলেন। ছেলেও সরেস ছিল। শেষে আই. এ. এস হয়ে পাড়া-প্রতিবেশীকে তাক লাগিয়ে দিলে। এম. এ-তে ফার্স্টক্লাস পাবার পরই আমাদের

সঙ্গে ব্যবধান বাড়তে লাগল। আই. এ. এস হবার পর আমাদের কোনও রকমে একটু চিনতে পারত। ভাল পোস্টিং হয়ে যাবার পর পথেঘাটে দেখা হলে, চোখে চোখে তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিত। টর্চলাইট ফেলার মতো। সোমেনের বাবা বলতেন, ছেলে হল হীরে। কত খংজে তোলা হল। তারপর অভিজ্ঞ হাতে কাটাই ছাঁটাই। কম খরচ! তারপর নিলাম। একলাখ বিশ! দেড় লাখ! তিন লাখ! কে হাঁকবে দর! মেয়ের বাবারা।

সোমেন নামক হীরক খণ্ডটি প্রায় তিন লাখে বিকিয়ে গেল। জাহাজ থেকে মাল খালাসের বিজনেস ছিল শ্বশুরমশাইয়ের। বেহালায় বিশাল বাগানবাড়ি। সেই বাগানে আবার ফোয়ারা। মার্বেল পাথরের উলঙ্গ নারী মূর্তি। সোমেনের বাবার সঙ্গে আগেই আলাপ ছিল। বড়লোকের কন্যাটি অসুন্দরী ছিল না; তবে যাদের ঘরে ছ'ছটা গরু থাকে তাদের ছেলেমেয়েরা একটু গায়ে গতরে হবেই। আর বড়লোকেরা একটু মোটাসোটা না হলে মানায় না। মেদ হল অর্থের বিজ্ঞাপন। খেঁকুরে বড়লোক হলেও কেউ বিশ্বাস করবে না। কাগজে বিজ্ঞাপন লাগাতে হবে। বড়লোকের নানা শরীর-লক্ষণ থাকা উচিত। কর্তার পঞ্চাশের পর রক্তে চিনি। চায়ের কাপে আয়েস করে স্যাকারিনের পুঁচকি-ট্যাবলেট ফেলতে ফেলতে বলবেন, একটু বেড়েছে, একশো আশি। অর্থাৎ ওদিকে ব্যাঙ্কে যত বাড়ছে, সেই অনুপাতে এদিকেও বাড়বে। মানি হল হানি। টাকা হল সুগার কিউব। রক্ত তো বটেই। তা না হলে রক্তের চাপ বাড়ে কেন? চল্লিশের পরেই গৃহিণীর বাত। বাতের জন্যেই রাজহংসীর মতো চলন। মেয়েটি সুন্দরী; কিন্তু মোটা। সোমেনের বাবা কোনও রকমে একতলা একটা বাড়ি করেছিলেন। প্ল্যাস্টার আর রঙ ছিল না। বেয়াইমশাই মেয়েকে পাঠাবার আগে একদল কন্ট্রাকটার পাঠালেন। তাঁরা এক মাসে আড়াই তলার একটা ছবি খাড়া করে দিলে। কটক থেকে মালি এসে চারপাশের খোলা জায়গায় ফুল ফুটিয়ে দিলে। দু তিন লরি ফার্নিচার ঢুকে পড়ল হুই হুই করে। তারপর বাজল সানাই। সে কি সুর কালোয়াতি! পাড়া প্রতিবেশীর বুকের চাপা কান্না যেন বাতাসে কাঁপছে। প্রতিবেশীরা কাঁদবেই তো। সোমেনের বাবা ছিলেন সামান্য মানুষ। অবস্থা তেমন ভাল ছিল না। জীবনের প্রথম দিকটায় খুচখাচ ব্যবসা করতেন। শেষটায় করতেন ঘটকালি। সেই মানুষ কিভাবে একটা একতলা বাড়ি করলেন। আধা খেঁচড়া হলেও মাথার ওপর ছাদ তো! সেইটাই তো প্রতিবেশীর কাছে বিশাল এক প্রশ্ন। সেই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গিয়েই তো, নিজেদের প্রশ্ন, আমরা

কেন পারলুম না! যেই মনে হল, আমরা কেন পারলুম না, অমনি ভেতরে শুরু হল শৃগালের কান্না। যাক, সোমেনদের বাড়ি হওয়ার ক্ষত শুকোতে না শুকোতে, সোমেনের এম এতে ফার্স্টক্লাস ফার্স্ট হওয়া। সে যেন পুরনো ক্ষতে নুনের ছিটে। একটা ছেলে চোখের সামনে তরতর করে সৌভাগ্য আর প্রতিপত্তির দিকে এগিয়ে যাবে, এ তো সহজে সহ্য করা যায় না। এর পরের মস্ত আঘাত হল সোমেনের আই. এ এস হওয়া। যাঃ সর্বনাশ! এ ছেলেকে তো শুধু মাত্র ঈশ্বরের কাছে আন্তরিক প্রার্থনায় সাধারণের স্তরে আটকে রাখা গেল না। এ তো অফিসার হবেই। গাড়ি, কোয়ার্টার, মোটা মাইনে, প্রতিপত্তি, ক্ষমতা, সবই তার হাতের মুঠোয়। চিন্তায় চিন্তায় একপাড়া লোক রোগা হয়ে গেল। আমরা তখন সোমেনকে বয়কট করলুম। যে ছেলে অসামাজিক হয়ে যাবে, তার সঙ্গে খাতির রেখে আর লাভ কি? শেষ আঘাত সোমেনের বিয়ে। আমরা নিমন্ত্রিত হওয়া সত্বেও, না গেলুম বরযাত্রী, না গেলুম বউভাতে। যে ছেলে বিয়েতে শ্বশুরকে দোহন করে পণ নেয়, উপহার নেয়, সে একটা নির্লজ্জ লোভী। তার অনুষ্ঠানে যাওয়াটাও পাপ। বড়লোকের আবার না চাইতেই কিছু তাঁবেদার জুটে যায়। সোমেনের পক্ষে অনেকে বলতে লাগলেন, 'শ্বশুরের আছে তাই দিয়েছে, সে তো আর চায়নি।' চেয়েছে কি চায়নি বুঝল কি করে।

বিকাশ বললে, 'সোমেনের মতো আমি চামার নই। একটা পয়সাও আমি নেবো না। তবে হ্যাঁ, আমার একটা সর্ত আছে, মেয়েটি সুন্দর হওয়া চাই। বউ নিয়ে বুক ফুলিয়ে যেন রাস্তায় হাঁটতে পারি।' বিকাশের মা বললেন, 'হ্যাঁ বাবা, ছেলেকে আমি নিলেমে চড়াব না। তবে মেয়ে পক্ষ যদি মেয়েকে ঘর সাজিয়ে দিতে চান, তাহলে আমি রোজগেরে ছেলের অহংকারে অপমান করতে পারবো না। লক্ষ্মী বড় চঞ্চলা। অহংকার একেবারে সহ্য করতে পারেন না।'

শনিবার রবিবার বিকাশের কাজই হল আমাকে নিয়ে মেয়ে দেখতে বেরনো। একটা ব্যাপার লক্ষ্য করছি ছেলেরা যখন বেকার থাকে তখন সে প্রেমিক। প্রেম করে বেড়ায়। যেই সে ভাল চাকরি পেল, অমনি তার প্রেম ঘুচে গেল, তখন তার আটকাঠ বেঁধে, ঠিকুজি, কোষ্ঠী মিলিয়ে বউ আনার তাল। বিকাশের একজন প্রেমিকা ছিল, তাকে আর পাত্তাই দেয় না। আমি জিজ্ঞেস করেছিলুম, ব্যাপারটা কি। প্রথমে বলতেই চায় না, শেষে বললে, 'আমি একটু ভাল মেয়ে চাই। আর এখন আমার চাইবার অধিকারও এসেছে। প্রেমের আবেগে বোকামি করলে আমাকেই পস্তাতে হবে। সারা জীবনের ব্যাপার। সারা জীবন

প্রেমের চশমা পরে একটা মেয়ের দিকে তাকানো সম্ভব নয়। বাস্তব হল অঙ্কের মতো।'

'তোর প্রেমিকাটি তো ভালই দেখতে।'

'ভাল দেখতে হলে কি হবে, ভীষণ ঘামে আর সর্দির ধাত।'

আমি হাঁ করে বিকাশের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলুম। পৃথিবীতে কত রকমের মাল আছে ভগবান!

জিজ্ঞেস করলুম, 'একটা মেয়েকে বাইরের দেখায় তুই রূপটা দেখলি, অন্তরঙ্গ খবর পাবি কি করে! ঘামে কি না, সর্দি হয় কি না! তোকে তাহলে অবজেকটিভ টেস্টের মতো প্রশ্ন-পত্র বিলি করতে হবে রে! তুই কি কি চাস বল তো!'

'অনেক মেয়ে আছে খাওয়াদাওয়ার পর ঢেউ করে গ্যাসের রুগির মতো ঢেঁকুর তোলে।'

'তারপর?'

'সেফটিপিন দিয়ে দাঁত খোঁটে। হাত ধুয়ে আঁচলে হাত মোছে। চিৎকার করে কথা বলে। দুমদুম করে সিঁড়ি ভাঙে। কথা বলার সময় গায়ে ধাক্কা মারে। দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতে পারে না, পা নাচায়। খাওয়ার সময় চ্যাকোর চ্যাকোর শব্দ করে। ঠুকে জিনিস রাখে। চিরুনিতে চুল ওঠে। মাথায় খুসকি হয়। পেটে হুড়হুড় গুড়গুড় শব্দ হয়। জ্বর হলে উঁ আঁ করে। ধনুকের মতো বেঁকে শোয়। হাউ হাউ করে হাই তোলে। নির্জনে নাক খোঁটে। খেতে বসে আঙুল চোষে। দাঁত দিয়ে নখ কাটে।'

'অসম্ভব! তোর বিয়ে হওয়া অসম্ভব। হলেও ডিভোর্স হয়ে যাবে। এই সব ডিফেক্ট একটা মেয়ের খুব কাছে না এলে ধরা যায় না।'

'ধরার চেষ্টা করতে হবে। বউ করব বাজিয়ে। এ তো প্রেম করা নয়, যে মেনে নিতে হবে প্রেমের প্রলেপ দিয়ে।' আমি সব শুনে রাখলুম। মনে মনে হাসলুম। এমন মেয়ে মানুষের বাড়িতে মেলা অসম্ভব। কোমোরটুলিতে অর্ডার দিতে হবে। স্বয়ং মা দুর্গাও হয়তো অসুর মারার সময় ঘেমেছিলেন।

রবিবারের এক বিকেলে আমরা রামরাজাতলায় মেয়ে দেখতে গেলুম। বেশ বড় সাবেক আমলের বাড়ি। গ্যারেজ আছে। বিকাশ ঢুকতে ঢুকতে বললে, 'আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িই আমার শ্বশুরবাড়ি।'

'হলেই ভাল, তবে তোমার যা চাহিদা।'

বৈঠকখানায় আমরা বসলুম। বসতে না বসতেই মেয়ের বাবা সবিনয়ে এসে হাজির। মোটাসোটা এক ভদ্রলোক। ঢোলা পাঞ্জাবি পরিধানে। ভুঁড়িটা সামনে ফুটবলের মতো উঁচু হয়ে আছে। ভদ্রলোক সোফায় বসা মাত্র বিকাশ উঠে দাঁড়াল।

ভদ্রলোক ঘাবড়ে গিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'কি হল আপনার?'

'আমার পছন্দ হল না।' বিকাশের সরাসরি উত্তর।

'কি করে! আপনি তো আমার বোনকে এখনও দেখেননি।'

বিকাশ একটু থতমত খেয়ে গেল। আমরা দু'জনেই ভদ্রলোককে পিতা ভেবেছিলুম।

মেয়ের দাদা বললেন, 'আমার বোনকে আগে দেখুন, তারপর তো পছন্দ অপছন্দ!'

বিকাশ বললে, 'শুধু শুধু আর কষ্ট দিয়ে লাভ নেই। আপনাকে দেখেই আমার ধারণা তৈরি হয়ে গেছে। ধরে নেওয়া যেতে পারে আপনার মতোই হবে। আপনারই স্ত্রী-সংস্করণ।'

ভদ্রলোক বেশ আহত হয়ে বললেন, 'ছিঃ, চেহারা তুলে কথা বলবেন না। ওটা এক ধরনের অসভ্যতা।'

আমি বললুম, 'আমার বন্ধুর কোনও দাবি-দাওয়াও নেই, পছন্দ হলেই পত্রপাঠ কাজ সারবে; তবে ওর একটাই শখ বউ যেন সুন্দরী হয়।'

ভদ্রলোক বললেন, 'আমাকে দেখে আমার বোন সম্পর্কে কোনও ধারণা করলে ভুল করবেন। সে কিন্তু প্রকৃতই সুন্দরী।'

বিকাশ বললে, 'ও ঠিক বুঝিয়ে বলতে পারলে না। আমি শুধু সুন্দরী মেয়েই চাই না, আমি চাই সুন্দরের বংশ।

আপনি আমার শ্যালক হলে পরিচয় দিতে পারব না। লজ্জায় আমার মাথা কাটা যাবে।'

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'গেট আউট। আভি নিকালো হিঁয়াসে।'

আমরা এক দৌড়ে রামরাজাতলার রাস্তায়। ভদ্রলোক এই ভদ্রতাটুকু অন্তত করলেন, যে রাস্তা পর্যন্ত তেড়ে এলেন না। এলে পাবলিক আমাদের পিটিয়ে লাশ করে দিত। বেশ কিছু দূরে একটা চায়ের দোকানে বসে, চা খেতে খেতে বিকাশকে বললুম, 'তাহলে আরও কিছু নতুন সর্ত যোগ হল।'

'হলই তো। একটা পয়সাও যখন নেবো না, তখন বুক ফুলিয়ে মাথা উঁচু

করে বিয়ে করব। অনেকে কি করে জানিস তো, মেয়ের এক একটা ডিফেক্টের জন্যে টাকা দাবি করে। একটু খাটো মাপের, দু হাজার। নাক খেবড়া, পাঁচ হাজার। চাপা রঙ তিন হাজার। সামনের দাঁত উঁচু সাত হাজার। পৃথিবীটা লোভী মানুষে ছেয়ে গেছে। অনেকে দেখবি ওই কারণে ওই রকম মেয়েই খোঁজে। বিয়ে নয় ব্যবসা।'

'তুই মেয়েটিকে না দেখে ওই রকম একটা অভদ্র কাণ্ড করলি কেন?'

'শোন লুঙ্গি পরা শ্বশুর, ভুঁড়িঅলা শালা, দাঁত বড় শাশুড়ী, এই সব আমার চলবে না। আমি যে বাড়ির জামাই হব সে বাড়িতে যেন চাঁদের হাটবাজার হয়।'

'বাড়িতে লুঙ্গি পরা চলবে না?'

'না লুঙ্গি অতি অশ্লীল জিনিস। আমার শ্বশুরকে ড্রেসিং-গাউন পরতে হবে।'

'বেশ ভাই, যা ভাল বোঝো তাই করো।'

'সব সময় একটু দূরে ভবিষ্যতের দিকে তাকাবি। ধর বিয়ের পর আমাদের একটা গ্রুপ ফটো তোলা হল। আমার পাশে হিড়িম্বা, আমার ওপাশে সুর্পনখা, পেছনে ঘটোৎকচ, তার পাশে হিরণ্যকশিপু। কেমন লাগবে!'

বেশ কিছুদিন কেটে যাবার পর শুকচরে আবার একটি মেয়ে দেখতে যাওয়া হল। সেও বেশ সাবেক কালের বাড়ি বনেদী বাড়ি। লোকজন নেই বললেই চলে। বাড়ির আকার আকৃতি দেখলে মনে হয়, শতাব্দীর শুরুতে এই গৃহ ছিল শতকণ্ঠে মুখর। উঠানের পাশে ভেঙে পড়া একটি বাড়ির কাঠামো দেখে মনে হল, এখানে একসময় একটি আস্তাবল ছিল। আমার অনুমান সত্য প্রমাণ করার জন্যে পড়ে আছে কেরাফি গাড়ির দুটি ভাঙা চাকা। বিকাশের কি মনে হচ্ছিল জানি না, আমার মনে ভিড় করে আসছিল অজস্র মুখস্মৃতি। মনে হচ্ছিল আমি যেন ইতিহাসে ঢুকে পড়েছি। আমার ভীষণ ভাল লাগছিল। সামনেই চণ্ডীমণ্ডপ। ভেঙে এলেও, অস্তিত্ব বজায় রেখেছে। পরিচ্ছন্ন। দেয়ালে টাটকা স্বস্তিকা চিহ্ন দেখে বুঝতে পারলুম এখনও পুজোপাঠ হয়। উঠানের একপাশে ফুটে আছে এক ঝাঁক কৃষ্ণকলি আর নয়নতারা। ভীষণ ঘরোয়া ফুল। দেখলেই মনে হয় দুঃখের মধ্যে সুখ ফুটে আছে। যে সব পরিবার, বড় পরিবার ভেঙে গিয়েও নতুন করে বেঁচে আছে, নতুন ভাবে, তাদের সেই অতীত বর্তমানের জমিতে ফুটে থাকে কৃষ্ণকলি হয়ে। বিশাল দরজা, ততোধিক বিশাল উঠান পেরিয়ে আমরা চলেছি। তখনও মানুষজন চোখে পড়েনি।

ভেতরের বাড়িতে সবাই আছেন। দূরে কোথাও একটা গরু পরিতৃপ্ত গলায় ডেকে উঠল। এই ডাক আমার চেনা। এ হল গরবিনী গাভীমাতার ডাক। আমি জাতিস্মর নই, তবু মনে হতে লাগল এই বাড়ি আমার অনেক কালের চেনা।

ভেতর বাড়িতে পা রাখা মাত্রই শীর্ণ চেহারার এক ভদ্রলোক ছুটে এলেন। শীর্ণ কিন্তু সুশ্রী। ভদ্রলোকের পরিধানে পাজামা ও পাঞ্জাবি। মুখে ভারি সুন্দর হাসি। এক মাথা ঘন কালো চুল। ভেতরের বাড়িটা যাকে বলে চক মেলানো বাড়ি, হয়তো সেই বাড়িই ছিল এক সময়। দেখেই মনে হল বাড়িটা ভাগাভাগি হয়ে গেছে। ভদ্রলোক আমাদের নিচের তলার ঘরে নিয়ে এলেন। বিশাল বড় ঘর। শ্বেতপাথরের মেঝে। ঘরে তেমন আসবাব পত্র নেই। কার্পেট ঢাকা একটি চৌকি পাতা। ভদ্রলোক আমাদের বসিয়ে দ্রুতপায়ে ভেতরে চলে গেলেন।

বিকাশকে জিজ্ঞেস করলুম, 'কি মনে হচ্ছে? তোমার ষষ্ঠ অনুভূতি কি বলছে?'

'পড়তি!'

'আর পড়বে না, এখন একটা জায়গায় এসে আটকেছে। আর তোমার তো দাবি-দাওয়া নেই।'

'দাবি না থাক, এই ভাঙা গোয়ালে কে বাসর পাতবে। সাপে কামড়ালে কে বাঁচাবে ভাই। লক্ষ্মীন্দরের বাসর হয়ে যাবে। আমার ষষ্ঠ অনুভূতি বলছে, এই বাড়িতে কম সে কম এক হাজার জাত সাপ আছে।'

বিকাশের কথায় গা জ্বলে গেল। আমাদের সঙ্গে রকে বসে আড্ডা মারতো। চা, চপ খেত। হঠাৎ ভাল একটা চাকরি পেয়ে মাথা বিগড়ে গেছে। ধরা কে সরা জ্ঞান। মনে মনে বললুম—যা ব্যাটা মরগে যা। বিকাশের ওপর আমার একটা ঘৃণা আসছে।

ভদ্রলোক নিজেই একটা ট্রে দু'হাতে নিয়ে ঘরে ঢুকলেন। তার ওপর সাধারণ দুটো কাচের গেলাস। গেলাসে ডাবের জল। ট্রেটা সামনে রেখে সাবধানে গেলাস দুটো আমাদের হাতে তুলে দিলেন। বিকাশ ডাট মারতে শুরু করেছে। গেলাসটা এমন ভাবে নিল, যেন দয়া করছে। কার্পেটের একপাশে রেখে ভারিক্কি গলায় বললে, 'এই সব ফর্মালিটি ছেড়ে, কাজের কাজ সারুন! আমার অনেক কাজ আছে?

ভদ্রলোক সবিনয়ে বললেন, 'নিশ্চয় নিশ্চয়। তবে দূরে থেকে আসছেন, গরমকাল, এখনও কিছু পিতার আমলের নারকেল গাছ আছে। খেয়ে দেখুন, খুব মিষ্টি জল।'

'ও জলটল পরে হবে, দেখাদেখিটা সেরে নিন।'

ভদ্রলোক বিষণ্ণ বিব্রত মুখে ভেতরে চলে গেলেন। আমি বিকাশকে বললুম, 'তোর সঙ্গে আর আমি যাব না কোথাও। এবার তুই ছোটলোকামি শুরু করেছিস।'

'ছোটলোকামির কি আছে! আমার এই রোগা রোগা চেহারার পদ্ধতি বড়লোকদের বিশ্রী লাগে। বিনয়ের আদিখ্যেতা। স্পষ্ট উচ্চারণে নিচু গলার কথা।'

'তা হলে এলি কেন, খামোখা একটা মানুষকে অপমান করার জন্যে।'

'জানবো কি করে?'

একটা চেয়ার নিয়ে ভদ্রলোককে আসতে দেখে এগিয়ে গেলুম ভারি। চেয়ার। একা সামলাতে পারছেন না।

'সরুন আমি নিয়ে যাচ্ছি। আপনি বইছেন কেন! আর কেউ নেই?'

'না, আমাকে সাহায্য করার মতো কেউ নেই। আমার চেহারা দেখে আপনি বুঝতে পারবেন না। আমি খুব খাটতে পারি।'

চেয়ারটাকে জানলার পাশে আমাদের দিকে মুখ করে রাখা হল। কিছু পরেই তিনি পাত্রীকে নিয়ে এলেন। সাজগোজের কোনও ঘটা নেই! ফিকে নীল শাড়ি। হাতাঅলা সাদা ব্লাউজ। চুলে একটা এলো খোঁপা। কপালের মাঝখানে ছোট্ট একটি টিপ।

মেয়েটি নমস্কার করে চেয়ারে বসল। পুরো ব্যাপারটাই অস্বস্তিকর! বোকা বোকা হৃদয়হীন নির্দয় একটা ব্যাপার। দুজোড়া চোখ প্রায় অসহায় একটি মেয়েকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখছে! আমি সেভাবে না দেখলেও বিকাশ অন্তর্ভেদী দৃষ্টিতে দেখছে। মাপজোক করছে। সুন্দরী বউ চাই! ডানা কাটা পরী চাই। লেখাপড়ায়, চাকরিতে বাল্যবন্ধু সোমেন মেরে বেরিয়ে গেছে। হেরে আছে একটা জায়গায় বিয়েতে। পেয়েছে খুব, কিন্তু বউ নিখুঁত সুন্দরী নয়! বিকাশ বউ দিয়ে মেরে বেরিয়ে যাবে।

মেয়েটি মুখ নিচু করে বসে আছে। ভদ্রলোকের মুখের আদলের সঙ্গে মেয়েটির মুখ মেলে। ধারালো অভিজাত মুখ। চাঁপা ফুলের মতো গাত্রবর্ণ।

লম্বা ছিপছিপে বেতসলতার মতো চেহারা। ভারি সুন্দর। বেশ একটা মহিমা আছে। অন্তত আমার চোখে। মেয়েটিকে খুব, নম্র। ভীরু মনে হল। বসে আছে অসহায় অপরাধীর মতো।

ভদ্রলোক বলতে লাগলেন, 'ছেলেবেলায় দিদি আর জামাইবাবু মারা যাবার পর আমার এই ভাগনী আমার কাছেই মানুষ। তখন আমদের সাংঘাতিক দুরবস্থা। তবু আমি আমার কর্তব্য করে গেছি। পড়িয়েছি। গান শিখিয়েছি। সভ্যতা, ভদ্রতা, সংসারের যাবতীয় কাজ শিখিয়েছি। একটাই আমি পারিনি। তা হল ভাল করে খাওয়াতে পারিনি। তার জন্যে দায়ী আমাদের অভাব। আমার রোজগার করার অক্ষমতা। তবে এই গ্যারাণ্টি আমি দিতে পারি, এমন মেয়ে সহজে পাবেন না। দুঃখের সঙ্গে হাত মিলিয়ে বড় হয়েছে। ওদিকে বড় ঘরে সংস্কারও কাজ করেছে। মেয়েটিকে আপনারা গ্রহণ করুণ। আমার শরীর ক্রমশই ভেঙে আসছে।'

বিকাশ ফট করে উঠে পড়ল। একেবারে আচমকা।

ভদ্রলোক অপদস্থ হয়ে বললেন, 'কি হল! আমি কি কোনও অন্যায় করে ফেললুম!'

বিকাশ একেবারে গুলি ছোড়ার মতো করে বললে, 'যে মাল বিজ্ঞাপনের জোরে বিকোতে হয় সে মাল ভাল হয় না।'

মেয়েটি শিউরে উঠল।

ভদ্রলোক বললেন, 'এ কি বলছেন আপনি!'

'ঠিকই বলছি। আপনার ভাগনীর স্ত্রীরোগ আছে।'

আমার পক্ষে সহ্য করা আর সম্ভব হল না। সমস্ত শক্তি এক করে বিকাশের ফোলা ফোলা গালে ঠাস করে এক চড় মারলুম। আর একটা চড় তুলেছিলুম। ভদ্রলোক ছুটে এসে আমার হাত চেপে ধরলেন। উত্তেজনায় কাঁপছেন। বিকাশের নিতম্ব কষে একটা লাথি মারার বাসনা হচ্ছিল। বিকাশ মুখে, অহংকার প্রবল, শরীরে দুর্বল। হন হন করে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেল।

আমি ফিরে তাকালুম। ভীরু মেয়েটির ঠোঁট ভয়ে সাদা হয়ে গেছে। বড় বড় পাতা ঘেরা চোখে জল টলটলে! সেই মুহূর্তে ভেতরের বাড়িতে শাঁখ বেজে উঠল। পুজো হচ্ছে গৃহদেবতার। ঘণ্টা বাজছে টিং টিং করে। আমি পিছোতে পিছোতে চৌকিটার ওপরে গিয়ে বসলুম। আমার ভীষণ একটা তৃপ্তি হয়েছে। একটা অসভ্য একটা ইতরকে আমি আঘাত করতে পেরেছি। অসীম

সুখে আমার মন ভরে গেছে।

আর ঠিক সেই মুহূর্তে যখন শাঁখ আর ঘণ্টা বাজছে পুজোর ঘরে, আমি আমার জীবনের সবচেয়ে সাংঘাতিক একটি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললুম। ভদ্রলোককে বললুম 'আপনি দিন দেখুন আমি বিয়ে করব। আমি বড় চাকরি করি না তবে মানুষ। বিয়ে এখন বড়লোকের ব্যবসা, তবু আমি এই ঝুঁকি নেবো। আমার পিতা এসে পাকা কথা করে যাবেন। হ্যাঁ তার আগে আপনার ভাগনীকে জিজ্ঞেস করুন আমাকে পছন্দ কি না?'

ভদ্রলোক আমার কাঁধে হাত রাখলেন; তখনও হাত কাঁপছে।

মেয়েটি অস্ফুটে বললে, 'আপনাকে আমি চিনি।'

'কি করে।'

'আমি বইয়ে পড়েছি এমন চরিত্রের কথা।'

'আমি বাস্তব নই!'

'কাল বোঝা যাবে।'

মেয়েটি পূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ; তারপর ধীরে ধীরে বেরিয়ে গেল ঘর ছেড়ে।

ভদ্রলোক আবেগের গলায় বললেন 'তুমি বাস্তব হবে তো!'

হাতের প্যাঁচ

ছোট, মাঝারি, বড়, কি গল্প আপনি চান বলুন, পেশদার কলম ঠিক নামিয়ে দেবে। কত স্লিপ? আজকাল তো আর সাহিত্য নেই, আছে স্লিপ। সম্পাদক মহাশয়রা আজকাল আর লেখা চান না। লেখা আজকাল আবার একসঙ্গে আসে না। বড় বড় লেখকরা স্লিপ দিতে থাকেন। সম্পাদক মহাশয়রা প্রশ্ন করেন, 'কাল ক' স্লিপ দিচ্ছেন। অন্তত পাঁচ স্লিপ দিন।' সাহিত্যের জগতে আর ফল-পাকড়ের জগতে বিপ্লব ঘটে গেছে। আগে আম বিক্রি হত, টাকায় পাঁচটা হিসেবে। এখন পনের টাকা কিলো। লিচু বিক্রি হত শ' দরে। লিচুরও এখন কিলো। যুগ পালটে গেছে।

আমি একটা বড় গল্প লেখার বায়না পেয়েছি। চল্লিশ স্লিপ। তার কম বা বেশি নয়। সেদিন সরকারী অফিসে লিফটে উঠেছিলুম। দেখি লেখা রয়েছে সিকস্টিন পার্সনস। প্রশ্ন জাগল, হাতির মতো চেহারার ষোলজন উঠলে কি হবে। নির্দেশ অনুসারে তো ষোলজনই হল। চল্লিশ স্লিপে যদি চল্লিশ হাজার শব্দ হয়ে যায়। সে তো তাহলে উপন্যাসই হয়ে গেল।

বড় গল্প কাকে বলে আমি জানি না। ছোট গল্পকে টেনে বাড়ালেই মনে হয় বড় গল্প হয়। আউর থোড়া হেঁইয়ো, বড় গল্প হইল। উপন্যাস, উপন্যাস একটা ভাব থাকবে। যেমন শীত-শীত ভাব। ছুঁচো আর হাতি। ছুঁচো দেখে এক পণ্ডিত বলেছিলেন, এ হল রাজার হাতি, না খেয়ে খেয়ে এই রকম হয়ে গেছে। আর হাতি দেখে বলেছিলেন, এ ব্যাটা রাজার ছুঁচো, খেয়ে খেয়ে অমন হয়েছে। ছোট গল্প আর বড় গল্প। একই ব্যাপার।

কি গল্প লেখা হবে। প্রেমের গল্প। বিচ্ছিন্নতার গল্প। হতাশার গল্প! রাজনৈতিক গল্প! নাকি ভূতের গল্প! প্রেমের গল্পই চেষ্টা করা যাক। গল্প আর রান্না একেবারে এক জিনিস। নানা উপাদান। নানা মশলা। তারপর আগুনে চাপিয়ে নাড়াচাড়া। যাকে বলে হেলুনি মারা।. বা কষা। মাংস যত কষবে ততই তার প্রাণমাতানো গন্ধ বেরোবে। এক এক রান্নার এক এক উপাদান। প্রেমের গল্পের প্রধান উপাদান হল, একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেমন ডিমের কারির প্রধান উপাদান হল, ডিম আর পেঁয়াজ। মাংসের কালিয়ার প্রধান

উপাদান হল, মাংস আর আলু।

একজন প্রেমিক আর একজন প্রেমিকা। যেন আলু আর পটল, ভাসছে জলে। জল হল সমাজ। এরপর মশলা চাই। তেল চাই, নুন চাই। তা না হলে, তরকারি না হয়ে, হয়ে যাবে আলু সেদ্ধ, পটল সেদ্ধ। শুধু প্রেমিক, প্রেমিকাকে নিয়ে কত দূর যাওয়া যায়। কত কথাই বা বলানো যায়। মিতালি, আমি তোমাকে ভালোবাসি। সোমেন, আমি তোমাকে ভালবাসি। এ ভাবে বেশিক্ষণ চালানো যায় না। তা ছাড়া একালের প্রেমে ভালবাসা শব্দটাই উচ্চারিত হয় না। ন্যাকা ন্যাকা শোনায়। অ্যাকসানের যুগ। ধর তক্তা, মার পেরেকের যুগ। মধ্যযুগের প্রেমে, অনেক হিলি হিলি, বিলি বিলি কাণ্ড হত। পাতার পর পাতা কবিতা। ফুল। কোকিলের ডাক। চাঁদ। সরোবর। বাতাস। দীর্ঘ-শ্বাস। মধ্যযুগের প্রেমে বিরহের ভাগ ছিল বেশি। কারণ, তখন ফ্রি মিকসিং ছিল না। প্রেমিক আর প্রেমিকায় মুখোমুখি দেখা হওয়ার উপায় ছিল না। বারান্দায় প্রেমিকা, ল্যাম্পপোস্টের তলায় প্রেমিক। যমুনায় জল ভরতে চলেছেন প্রেমিকা, গাছের ডালে পা ঝুলিয়ে বাঁশি বাজাচ্ছেন প্রেমিক। নিশি জাগছেন রাই, কবি গাইছেন, তুমি যার আসার আশায় আছো, তার আসার আশা নাই। নট-ঘট শ্যামরায় চলিল আজ মথুরায়। প্রেমের এই ফোঁস ফোঁসানি একালে অচল। দেহাতীত প্রেম কেউ বিশ্বাস করবে না। সমালোচকরা তুলো ধুনে দেবেন। প্রেমের সঙ্গে সেক্স চাই-ই চাই। রূপ বর্ণনায় এখন কবিতাও হয় না। গদ্য-সাহিত্য তো দূরের কথা। 'চুল তার কবেকার'—একটা সময় পর্যন্ত বেশ ছিল। এখন খোলাখুলির যুগ। একালের সিনেমায় জোড়া ঠোঁটের মাঝখানে আর যোজন তিনেকের ব্যবধান থাকে না। চুম্বক আর লোহা-সম কাছাকাছি হওয়া মাত্রই টানাটানি। জোড়াজুড়ি।

আমার উপাদান আমি গুছিয়ে ফেলি। বেকার প্রেমিক, বেকার প্রেমিকা। প্রেমিকের পিতার কারখানায় চলেছে লাগাতার ধর্মঘট। মা বাতের রুগী। যত না কাজ করেন, কোঁত পাড়েন তার চেয়ে বেশি। আর সূর্য ওঠা থেকে, মশারিতে ঢোকা পর্যন্ত ঝগড়া করেন প্রাণ খুলে। প্রেমিকের একজন অবিবাহিতা বোন থাকবে। যুবতী। ম্যাগনাম স্বাস্থ্যের অধিকারী। পথে বেরনো মাত্রই দশ-বিশটা নানা চেহারার, নানা পোশাকের ছেলে পেছন পেছন চলতে থাকে। লেজের বদলে রুমাল নাড়ে। প্রেমিক ভাড়া থাকবে দু কামরার একটি বাড়িতে। একটি ঘর বড়। একটি ঘর ছোট। বাথরুম কমন। সব লেখকই আশা করেন,

তার গল্প নিয়ে সিনেমা হোক। কোন ভালো পরিচালকের হাতে পড়ুক। কাহিনীটিকে প্রথম থেকেই সেই কারণে ক্যামেরার চোখে দেখতে হবে। সিনেরিয়ো করতে করতে এগোতে হবে। সামান্য বাম-বাম ভাব থাকা চাই। ক্যাপিট্যালিস্ট প্রেম নিয়ে হিন্দি বাণিজ্যিক ছায়াছবি হতে পারে। তাতে পয়সা আছে, সম্মান নেই।

আমার এই কাহিনী যখন মুভি-ক্যামেরা ধরবে। তখন শুরুর শটটা হবে এইরকম ঃ

ধোঁয়া। ভলকে ভলকে ধোঁয়া। আকাশে উঠে এলো চুলের মতো খুলে খুলে যাচ্ছে। নরম ধোঁয়া। মধ্যবিত্ত ধোঁয়া। মারোয়াড়ির বেআইনি গুদামে আগুন-লাগা ধোঁয়া নয়। কয়েক জোড়া উনুনের ধোঁয়া একসঙ্গে আকাশে উঠছে। সেই আকাশে উড়ছে বাবু-কলকাতার পায়রা। পায়রা ছাড়া ভালো ছবি হয় না। পায়রা হল প্রতীক। ভালোভাবে লাগদাই করে লাগাতে পারলে একটা কেলেঙ্কারি কাণ্ড হয়ে যায়। পায়রা দিয়ে মৃত্যু খুব সুন্দর বোঝানো যায়। সিনেমার মৃত্যু বড় হাস্যকর। না মরলে মরা কেমন করে মরার মতো হবে? সব কিছুর অভিনয় সম্ভব, মৃত্যুর অভিনয় অসম্ভব। অভিনেতাদের কাছে মৃত্যু একটা কঠিন সাবজেক্ট। মরছি না, অথচ মরতে হচ্ছে। ক্যামেরা সরে গেলেই উঠে বসে, কই রে সিগারেট নিয়ে আয়, নিয়ে আয় জোড়া ওমলেট, ডবল হাফ চা। যে মৃত্যুর পর মানুষকে শ্মশানে গিয়ে চিতায় শুতে হয়, এ মৃত্যু নয়। এ হল গিয়ে পরিচালকের নির্দেশিত মৃত্যু। ক'জন আর মৃত্যুকে সে-ভাবে দেখার সুযোগ পান। মৃত্যু ঘটে নিভৃতে, একান্তে। মৃত্যু মানুষের বড় ব্যক্তিগত ব্যাপার। একান্ত আপনজন শিয়রে বসে থেকেও বুঝতে পারে না, মানুষটা কখন কিভাবে হঠাৎ চলে গেল, তার দেহ-জামাজোড়া ছেড়ে। সেই শ্বাসকষ্ট, সামান্য এক চিলতে বাতাসের জন্যে ভেতরের আকুলি-বিকুলি। দুটো চোখের ঠেলে বেরিয়ে আসা। চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে ঊর্ধ্বনেত্র হলেই কি আর মৃত্যু হল। সেই কারণে সিনেমার মৃত্যু সব একই ধরনের। মাথাটা বালিশ থেকে উঠতে উঠতে ধপাস করে পড়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে আবহ সংগীত। বেহালায় প্যাথসের টান। ক্যামেরা ক্লোজ-আপে অভিনেতার মুখ ধরছে। অভিনেতার তখন অগ্নি-পরীক্ষা। তারস্বরে চিৎকার—'চোখের পাতা পিটপিট করে না যেন, ডাবাড্যাবা ঊর্ধ্বনেত্র।' এই একটা শটই যে কতবার রি-টেক করতে হয়। কখনও পাতা পড়ে যায়, কখনও ড্যাবা কমে আসে, কখনও মৃতের

চোখে জল এসে পড়ে। সেই কারণে মৃত্যুর আজকাল একটা পেটেণ্ট চেহারা হয়েছে সিনেমার পর্দায়। সেকেণ্ড-গ্রেড পরিচালকরা তার বাইরে আসতে পারছেন না। প্রথম সারির পরিচালকরা মৃত্যুকে নিয়ে গেছেন আর্টের পর্যায়ে তাঁরা করেন কি, ক্যামেরাকে ক্লোজ-আপে এনে মৃত্যু-পথ-যাত্রীর মুখটা ধরেন। ছটফট, ছটফট, বালিশে মাথা চালাচালি। দু'হাত কোনও রকমে ওপরে তুলে কারোকে ধরার বা খোঁজার চেষ্টা। অস্ফুটে কারোর নাম ধরে ডাক, 'সুধা! সুধা!' তারপর একপাশে ঘাড় কাত করে এলিয়ে পড়া। কাট্। পরের শট্ ফড়ফড়, ফড়ফড় এক ঝাঁক পায়রা যেন কারোর তাড়া খেয়ে আকাশে উড়ে গিয়ে, বিশাল বৃত্ত রচনা করে উড়তে লাগল। এরপর এক রাউণ্ড আন্তরিক কান্না। কান্নার দৃশ্যে আমাদের অভিনেত্রীদের কোনও জুড়ি নেই। একেবারে ফাটিয়ে দিতে পারেন। যাকে বলে কেঁদে মাত করা; অনেক পরিচালক আবার রেলগাড়ির সাহায্য নেন। সিটি বাজিয়ে হুহু করে ট্রেন চলে গেল দূর থেকে দূরে। বুক কাঁপিয়ে। লোহার রেলে চাকার শব্দ। মন হু হু-করানো সিটি। সব মিলিয়ে এমন একটা এফেক্ট। আত্মা রেলে চেপে পরবাস থেকে চলেছে স্ববাসে। পায়রা দিয়ে জমিদারের লাম্পট্য বোঝানো যায়। চকমেলানো বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে পায়রাদের দানা খাওয়াতে খাওয়াতে বয়স্যকে বলছে, ওই অমুকের স্ত্রীকে তাহলে আজ রাতেই তোলার ব্যবস্থা করো। আবার জোতদারের অত্যাচার বোঝবার জন্যে বেড়াল আর পায়রা একসঙ্গে ব্যবহার করা হয়। বাড়ির চালে লাউ ফলে আছে। তার আড়াল থেকে গুটি গুটি বেরিয়ে আসছে পাঁশুটে রঙের একটা বেড়াল ইয়া এক হুলো। আর অদূরে নিশ্চিন্ত মনে ঠোঁট দিয়ে ডানা পরিষ্কার করছে নিরীহ এক পায়রা। দর্শকের আসনে বসে আতঙ্কে আমাদের শ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে! মানুষের সামগ্রিক নিপীড়ন বোঝাতে ক্রুশবিদ্ধ যীশুতো হামেশাই পর্দায় আসেন।

এখন হল প্রতীকের যুগ। লোগোর যুগ। অলিম্পিক, এশিয়ান গেমস, এক একবার, এক একরকম লোগো। কোনওবার হাতি। কোনওবার ভাল্লুক। কোনওবার গোল গোল চাকা। তা আমার কাহিনীর চিত্ররূপে প্রথমেই থাকবে পর্দাজোড়া নরম, মিষ্টি, ধোঁয়া। তার উপর দুলতে থাকবে টাইটেল। আবহ হিসেবে ব্যবহৃত হবে দমকা কাশির শব্দ, কাকের কর্কশ চিৎকার। ব্যাটারি ডাউন গাড়ির বারে বারে স্টার্ট নেবার চেষ্টায় সেল্‌ফ মারার শব্দ। দুপক্ষের কদর্য ঝগড়ার অস্পষ্ট আওয়াজ। বেতারে প্রভাতী সংগীত। কলতলায় বাসন

ফেলার আচমকা শব্দ। কোন যন্ত্র ব্যবহার করা হবে না। স্রেফ শব্দ। বাজারের কোলাহল। কলের বাঁশি। সব মিলিয়ে তৈরি হবে টাইটেল মিউজিক। আজকাল বিদেশী বইতে এই কায়দাই চলেছে।

এইবার ক্যামেরা ছাদের ভাঙা আলসে বেয়ে, বারান্দার ভাঙা রেলিং বেয়ে নেমে আসবে, শ্যাওলা ধরা চৌকো উঠানে। ক্লোজ আপে তিনটে তোলা উনুন। এই ভাঙা সাবেক বাড়িতে তিনটি পরিবার বাস করে। এখন সমস্যা হল বাড়ি তৈরির মতো গল্পটাকে আমি কিভাবে খাড়া করব। কুস্তির মতো গল্প লেখারও দুটো ধরন আছে—একটা হল, ফ্রি স্টাইল। অর্থাৎ শুরু করে দাও, তারপরে যেখানে যায় যাক। লিখতে লিখতে ভাবো, ভাবতে ভাবতে লেখো। শেষ পর্যন্ত গল্পের চরিত্ররাই লেখকের গলায় দড়ি বেঁধে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে যায়। দিল্লিতে এক বিখ্যাত নামী লেখক বসবাস করতেন। খুব সায়েবী ভাবাপন্ন। তাঁর একটা বিশাল বড় অ্যালসেসিয়ান কুকুর ছিল। রোজ সকালে সেই দুর্বল বুদ্ধিজীবী তাঁর সবল কুকুরটিকে নিয়ে প্রাতঃভ্রমণে বেরোতেন। প্রায়ই দেখা যেত, ব্যাপারটা উল্টে গেছে। কুকুরই বাবুকে নিয়ে বেড়াচ্ছে। টানতে টানতে যেদিকে নিয়ে যাচ্ছে, সেই দিকেই যেতে হচ্ছে। চরিত্র নিয়ে লেখক বেড়াতে বেরিয়েছেন, শেষে চরিত্ররাই লেখককে টানতে থাকে।

আর একটা হল কুস্তি। নিয়ম মেনে। প্রথা মেনে। কম্পোজ করে। স্টাইল রেস্টলিং। প্ল্যান করে লেখা। কার সঙ্গে কি হবে। গল্পের কাঠামোটা পুরো ভেবে নিয়ে, খড় বেঁধে মাটি চড়িয়ে যাও। সাহিত্যে আমরা যাকে গল্প বলি সিনেমায় সেইটাকেই বলে স্টোরি। আমার এই স্টোরি ফ্রি-স্টাইলেই চলুক। আঁতেল গল্প সেইভাবেই এগোয়। আমার যখন যা মনে হবে, তাই নামিয়ে যাবো, তারপর ফিনিশ করে, মেজে-ঘষে ছেড়ে দোবো। যেমন এখন আমার মনে হচ্ছে, গল্পের প্রেমিক, প্রেমিকা এই একই বাড়িতে বসবাস করবে। একটা তোলা উনুন প্রেমিক-পরিবারের, আর একটা তোলা উনুন প্রেমিকা-পরিবারের। এই দুটো উনুনই জীবনের প্রতীক। জীবন জ্বলছে গুমরে গুমরে। যত না পুড়ছে তার চেয়ে বেশি ধোঁয়া ছাড়ছে। এইবার তৃতীয় উনুনটি কার। তৃতীয় উনুনটা অবশ্যই আর একটি পরিবারের, কিন্তু এই কাহিনীতে সেই পরিবারটির কি ভূমিকা হবে?

এই পরিবারটিকেই আগে প্রতিষ্ঠিত করা যাক। বড় বড় সাহিত্যিক আর বাঘা বাঘা সমালোচক ও সমালোচিকাদের সঙ্গে সামান্য মেলামেশা করে একটা

কথা শিখেছি চরিত্রকে, ঘটনাকে 'এশট্যাবলিশ' করা। আধ্যাত্মিক জগতের ভাষায় বলে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। মূর্তিতে প্রাণ প্রতিষ্ঠা। প্রথমত, চরিত্রকে এমনভাবে আঁকতে হবে, যেন বইয়ের পাতা থেকে তার শ্বাসপ্রশ্বাস আমাদের গায়ে এসে লাগে। যেন চিমটি কাটলে, উঃ করে ওঠে। জনৈক প্রখ্যাত প্রতিষ্ঠিত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, আপনার একটি চরিত্র আর একটি চরিত্রকে বলবে, 'সুধা আমার ভীষণ মাথা ধরেছে।' তা সেই কথাটা বলে ফেললেই হয় ; তা না, সুধাময় আসছে রাস্তার একপাশ দিয়ে। কেন একপাশ দিয়ে আসছে, প্রায় এক প্যারা জুড়ে তার ব্যাখ্যা। সুধাময় সাবধানী। তার পিতাও খুব সাবধানী ছিলেন। সুধাময়ের এক বন্ধু, বড়দিনে, পার্ক স্ট্রিটে কথা বলতে বলতে হাঁটতে হাঁটতে, অন্যমনস্ক হয়ে পাশে সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রানওভার হয়ে গিয়েছিল। সে-দৃশ্য সুধাময় আজও ভুলতে পারেনি। রক্তাক্ত, থ্যাঁতলানো একটা দেহ। সুধাময়ের একটা প্রশ্নের পুরো জবাব সমাপ্ত করে যেতে পারেনি। সে হাসছিল। হাসতে হাসতে নিমেষে মারা গেল। ওই একটা ঘটনায় সুধাময়ের পাকাপাকি-ভাবে নার্ভাস ব্রেকডাউন হয়ে গেছে। পেছন থেকে গাড়ির শব্দ এলেই সে লাফিয়ে পাশে সরে যায়। এত পাশে, যে একবার নর্দমায় পড়ে পা ভেঙে তিন মাস বিছানায় পড়েছিল। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সঙ্গে সুধাময় চলতে চলতে বাড়ির দোরগোড়ায় পেঁ‍ৗছে গেল। দেখলে, দূর থেকে একটা হলদে ট্যাকসি আসছে। পেছনের আসনে প্রশান্তর বোন বসে আছে। এয়ার হোস্টেস। ভীষণ অহংকারী। এক সময় সুধাময়ের ছাত্রী ছিল। মেয়েটির খোঁপার দিকে সুধাময়ের দৃষ্টি চলে গেল। সে নিজেকে তিরস্কার করল। মেয়েদের খোঁপা, তাও আবার ছাত্রী, সেই খোঁপার দিকে এই বয়সে নজর চলে যাওয়া খুবেই অন্যায়। ট্যাকসিটা চলে যাবার পর সুধাময় রাস্তার দিকে তাকাল। একটা শালপাতার ঠোঙা উপুড় হয়ে পড়ে আছে। এই প্ল্যাস্টিক আর কাগজের যুগে এই বস্তু এখনও আছে। সুধাময় নিজের সঙ্গে তুলনা করল। তার মতো মিসফিট মানুষের তুল্য এই ঠোঙা এখনও দু' একটা উপুড় হয়ে পড়ে থাকে। ঠোঙাটাকে একটা লাথি মেরে সুধাময় বেশ তৃপ্তি পেল। এই রকম একটা লাথি নিজের নিতম্বে মারতে পারলে সুধাময় খুব খুশি হত। নিজেকে নিজে লাথি মারা যায় না। এইটাই এক দুঃখ। সেই বেড়ালছানাটা একইভাবে বসে আছে দরজার বাইরে, একপাশে। বাড়ি থেকে ভোরবেলা বেরোবার সময় যে-অবস্থায় দেখে গিয়েছিল, ঠিক সেই একই অবস্থায় বসে আছে জড়োসড়ো হয়ে। দাঁতাল শুকরের মতো ভয়ংকর এই

পৃথিবীতে হঠাৎ এসে পড়ে ক্ষুদ্র এই প্রাণীটি যেন স্তম্ভিত হয়ে গেছে। সুধাময়ের খুব ইচ্ছে করছিল অসহায়, ভীত প্রাণীটিকে তুলে ভেতরে নিয়ে যায়। ভয়ে পারলো না। পৃথিবীর ভয়ে নয়। ভয় সুধাকে। যে কোনও রোমশ প্রাণীর কাছাকাছি এলেই সুধার অ্যালার্জি হয়। রাতে হাঁপানির মতো হয়। নিঃসঙ্গ, ভীত বেড়ালটার কথা চিন্তা করতে করতে সুধাময় দোতলায় উঠতে লাগল। সিঁড়ির প্রতিটি ধাপের আগা ভেঙে ভেঙে গেছে। মেরামত অবশ্যই করা উচিত। একটু অন্যমনস্ক হলেই পতন অবধারিত। বহুবার পড়ে যেতে যেতে বেঁচে গেছে। সারাবার সঙ্গতি নেই। সুধাময় সিঁড়িটার নাম রেখেছে সচেতনতা। সুধাময় যৌবনে কবিতা লিখতো। অভ্যাসটা ধরে রাখতে পারলে কবি হিসেবে এতদিনে তার খুব নাম হত। সংসার তার এই প্রতিভাকে জাগাবার বদলে, জল ঢেলে দিলে। সুধাময় বারান্দা পেরিয়ে ঘরে এল। বারান্দায় শেষ বেলার ছায়া নেমে এসেছে। সুধা শুয়েছিল খাটে। কপালে হাত রেখে। সুধাময় সেইদিকে তাকিয়ে বললে, 'তোমার আজও কি জ্বর আসবে ?'

'ওই একই প্রশ্ন নিয়ে, আসার আগেই জ্বরকে বিছানায় বরণ করবো বলে, শুয়ে পড়েছি।'

'আমি তোমাকে আগেও বলেছি, এখনও বলছি, মন থেকে জোর করে অসুখটাকে তাড়াও। তোমার একটা ম্যানিয়া এসে গেছে।' কপাল থেকে হাত সরিয়ে সুধা করুণ চোখে সুধাময়ের দিকে তাকাল। এই ম্যানিয়া শব্দটা শুনলে, তার ভেতরে একটা চাপা ক্রোধ ধিকিয়ে ওঠে। ক্ষতবিক্ষত সুধাময়ের দিকে তাকালে সেই ক্রোধ পরিণত হয় চাপা অভিমানে। দু চোখের পাশ দিয়ে কয়েক ফোঁটা জল গড়িয়ে আসে মাত্র। তার ভেতরের জলও শুকিয়ে আসছে ক্রমশ। সুধা আধবোজা চোখে দেখতে লাগল, সুধাময় পাঞ্জাবিটা খুলে হ্যাঙারে রেখে বারান্দার চেয়ারে গিয়ে বসল। সুধাময় ঠোঁটে একটা সিগারেট লাগাল। সিগারেটের কাগজটা জড়িয়ে গেল ঠোঁটের সঙ্গে। বেশ বুঝতে পারলো শরীর শুকিয়ে আসছে। সিগারেট খুলে নিতে গিয়ে অল্প একটু কাগজ ছিঁড়ে ঠোঁটেই লেগে রইল। সুধাময় দু' তিনবার থুথু করেও কাগজটা ছাড়াতে পারল না। তখন আঙুল দিয়ে ঠোঁট পরিষ্কার করে, জিভ বুলিয়ে ঠোঁট ভিজিয়ে সিগারেট লাগাল। ছেঁড়া অংশ দিয়ে কয়েক কুঁচি তামাক জিভে এসে গেল। সিগারেট খুলে সুধাময় আবার থু থু করল।

সুধা খাট থেকে ক্ষীণ কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল, 'তোমার কি আবার গা

গ্লোচ্ছে। আমি .কিন্তু তোমাকে বারে বারে বলছি, খালি পেটে থেকো না। তোমার পুরনো আলসার। এই সময় তুমি দয়া করে বিছানায় পড়ে যেও না। একটু কিছু মুখে দাও। কিছু না পারো তো, একটা বাতাসা, এক গেলাস জল।'

পর পর তিনটে দেশলাই কাঠি জ্বলল না। একটার বারুদ ঘষতে ঘষতে ক্ষয়ে গেল। একটা ভেঙে দু টুকরো হয়ে গেল। আর একটার বারুদ খুলে জ্বলতে জ্বলতে বারান্দার বাইরে ছিটকে চলে গেল। সুধাময় অবাক হয়ে দেশলাইটার দিকে তাকাল। এই রকম তো হয় না কখনো। সুধাময় সিগারেটটা ছুঁড়ে ফেলে দিল বারান্দার বাইরে। ঘরে এসে খাটের পাশের চেয়ারে বসে পড়ল। ভুরুর মাঝখানের কপালটা দু আঙুলে টিপে ধরে বললে, 'সুধা, মাথাটা আজ ভীষণ ধরেছে। কপালের কাছটা একেবারে ছিঁড়ে যাচ্ছে।'

সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিককে প্রশ্ন করেছিলুম, 'এই একটা কথা বলাতে আপনি কত কাণ্ড করলেন, তাই না?'

'তুমি একটা আকাট মুর্খ! এইটুকু বোধ তোমার এল না, একে বলে বিল্ড-আপ করা। ওয়ার্মিং আপও বলা যায়। একই সঙ্গে কত কি বোঝানো হল। এইটাই হল ক্ল্যাসিকাল স্টাইল। টমাস মান, আঁদ্রে জিদ, এই কায়দায় লিখতেন। গল্পের চরিত্রকে যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। তার ম্যানারস, ম্যানারিজম। চেহারার কোনও বর্ণনা নেই; কিন্তু যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি, একহারা, সাধারণ উচ্চতার একটি লোক। এক সময় রঙ ফর্সা ছিল, এখন তামাটে। সামনের চুল পাতলা হয়ে এসেছে। হাতের শিরা জেগে আছে। চোখ দুটো কোটরে ঢুকে গেছে। লোকটি সামান্য পরিশ্রমেই ঘেমে যায়। চোখ দুটো কোটরাগত হলেও অস্বাভাবিক উজ্জ্বল। চেহারায় একটা আভিজাত্যের ভাব এখনও ফুটে আছে। এই সমাজে লোকটি মিসফিট হলেও, অলস নয়, সংগ্রামী।'

কত কি শেখার আছে, তাই না! আমি তৃতীয় উনুনটিকে আগে এশট্যাবলিশ করি। ক্ল্যাসিক্যাল জার্মান-সাহিত্যিকদের কায়দায়। উনুন দিয়ে যেন মানুষ চেনা যায়। যেমন ছড়ি দিয়ে বাবু। দরজার পাল্লায় একটা ছড়ি ঝুলছে। লোকটির আর ঘরে ঢোকা হল না। বেরিয়ে গেল। অনেকটা পরে ফিরে এল একটা কুড়ুল নিয়ে। বউয়ের বিছানায় মহাজনের মুণ্ডু খুলে পড়ে গেল। সেই রকম অ্যাশট্রেতে পোড়া সিগারেট। স্ত্রীর প্রেমিকার সিগারেট অবৈধ ধোঁয়া ছাড়ে। শ্বশুর মহাশয়ের সিগারেট ছাড়ে তিরিক্ষি ধোঁয়া। বন্ধুর সিগারেটের মজলিশি ধোঁয়া। দারোগার সিগারেটের ধোঁয়ায় রুলের গুঁতো। ছেলের বন্ধুর

সিগারেটের ধোঁয়া কেয়ার ফ্রি। পিতার সিগারেটের ধোঁয়ায় চাপা আতঙ্ক, এরপর জীবনমঞ্চে কোন দৃশ্য আসছে।

তৃতীয় উনুনটা ঢালাই লোহার। মাটির উনুন ধরে মায়ের বুকের স্নেহের আগুন। এই লোহার উনুনে যেন বউ পোড়ানো আগুন। উনুনটার চেহারা যেন গেস্টাপোর মতো। সলিড্ লোহা। গাটা খসখসে। ভেতরের চাপা নিষ্ঠুরতা যেন ফুস্কুড়ির মতো ফুটে উঠেছে। অন্য দুটো উনুনের চেয়ে এই উনুনের আগুন যেন বেশি লাল। প্রথম উনুনটি তুলে নিয়ে গেল সুন্দর স্বাস্থ্যের অধিকারী এক যুবক। প্রখ্যাত সাহিত্যিকের জার্মান কায়দায় যুবক-টিকে একটু এশট্যাবলিশ করা যাক।

ছোট একটি ঘর। সেই ঘরে ইটের পর ইট দিয়ে উঁচু করা একটি চৌপায়া। আধময়লা একটি মশারি। সেই মশারির ভেতর যুবকটি শুয়ে ছিল। সাদা পাজামা আর কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে। ছোট একটা মাথার বালিশ। গামছা জড়ানো। গামছা জড়াবার কারণ, বালিশের খোলে দুটো ফুটো তৈরি হয়েছে। ফুটো হবার কারণ, এই পরিবারে একটা আদুরে বেড়াল আছে। সাদার ওপর হলদে। মুখটা ভারি মিষ্টি। পোখরাজের মতো জ্বল জ্বলে দুটো চোখ। লেজটা চামরের মতো মোটা। লোমে ভর্তি থুপথুপে একটা বেড়াল। বেড়ালটার পেট কোনও সময়ে ঢুকে থাকে না। সব সময় ভরভর্তি। সব সময় হাসিখুশি। হয় খাচ্ছে, না হয় ঘুমোচ্ছে। নাহয় দুর্দান্ত খেলায় মেতে আছে আপনমনে। নানা রকম খেলা আবিষ্কার করার অসাধারণ প্রতিভা আছে বেড়ালটার। চাদরের ঝোলা অংশে ঝুলে ঝুলে খেলে। দেশলাইয়ের খালি প্যাকেট দু' পায়ে পাকা ফুটবলারের মতো ড্রিবল করে। হাওয়াই চটি চারপায়ে আঁকড়ে ধরে চিৎ হয়ে উল্টে পড়ে। কামড়াতে থাকে। কখনও লেজটাকে ধনুকের মতো বাঁকিয়ে অকারণে ঘরময় ছোটাছুটি করে। হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে ঘাড় বাঁকিয়ে পেছনে তাকায়। তারপর আবার দৌড়োয়। তড়াং করে বিছানায় লাফিয়ে উঠে খচমচ, খচমচ এ-পাশে ও-পাশে দৌড়ে চাদরের ঝোলা অংশ বেয়ে ধুপ করে মাটিতে পড়ে। এই বেড়ালটাই বালিশটা ছিঁড়েছে। তার এই অপরাধের জন্যে কেউ অসন্তুষ্ট হয়নি, বরং বেশ গর্বিত। ফুটো দিয়ে তুলো বেরিয়ে আসছিল, তাই যুবকটির মা নতুন একটা গামছা দিয়ে বালিশটা বেঁধে দিয়েছেন। মেয়েকে বলেছেন বালিশে দুটো তাপ্পি মেরে দিস। তার আর সময় হচ্ছে না। এটা তার অবহেলা নয়; সত্যিই সময়ের বড় অভাব। সৃষ্টি সংসারের কাজ, তিন

বাড়িতে টিউশানি, রবীন্দ্রসংগীত শিখতে যাওয়া আর ছোট্ট একটা প্রেম। তার দোষ নেই। সত্যিই সময়ের অভাব।

সমস্ত কিছু ব্যাখ্যা করা উচিত। বেড়ালের অংশটাকে এত বড় করার কারণ, বেড়াল আর বিছানা একটা সংসারকে প্রকাশ করে। উচ্চবিত্ত, ভোগী, স্বার্থপরের সংসারে বিছানা খুব টিপটপ থাকে। বালিশের খুব বাহার। প্রত্যেকের আলাদা আলাদা ঘর। কলেজের কমন রুমের মতো একটা লিভিং রুম। আলাদা খাবার ঘর। সেই সব বাড়িতে বিছানার ওপর চাঁদের হাটবাজার বসে না। সেই সব বাড়িতে বেড়াল ঢোকার উপায় নেই। ঢুকলেই দেখমার। রাতের বেলায় টানটান বিছানায় শয্যাগ্রহণকারী আলতো করে শরীরটা ছেড়ে দেন। চাদর কুঁচকে শয্যার সৌন্দর্য নষ্ট হবার ভয়ে সাবধানে শরীর তুলে পাশ ফেরেন। এই ধরনের অধিকাংশ পরিবারে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক তেমন ভালো থাকে না। বিয়ের তিন বছরের মধ্যে ডিভোর্স না হলে 'সোস্যাল প্রেস্টিজ' বাড়ে না। যে মহিলা যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন ততই তাঁর সম্মান আর ব্যক্তিত্ব বেড়ে যাবে। সোসাইটির ওপর তাঁর একটা গ্রিপ এসে যাবে। তাঁর চুল তত ছোট হবে। জীবনে আর কুলিয়ে উঠতে পারেন না তাই নেড়ার আগের স্তরে এসে থেমে যান। যে পুরুষ যতবার ডিভোর্স করতে পারবেন, ডিভোর্সি মহলে তাঁর আকর্ষণ তত বেড়ে যাবে। মুখে একটা উদাসীনতা। কঠিন একটা পাকা পাকা ভাব। অর্থাৎ স্টিল থেকে টেম্পারড স্টিল। সোনা থেকে পাকা সোনা। আনাড়ি স্বামী আর কি! মেয়েরা নেড়ে চেড়ে একটু ফ্রাই করে ছেড়ে দেয়। ফ্রায়েড হতে হতে ডিপফ্রাই হয়ে ঈশ্বরের কাটলেট। ডিভোর্সিদের একটা বৃত্ত থাকে। বৃত্তাকারে নৃত্য।

এ ছাড়ছে সে ধরছে। সে আবার ছাড়ছে তো ও ধরছে। এই ধরাধরি আর ছাড়াছাড়ি হতে হতে দেখা গেল, সাত আট বছর পরে প্রথমটি আবার প্রথমের কাছে ফিরে এসেছেন। তখন দুজনেই বলছেন.'কি আশ্চর্য মাইরি, শুধু ওয়ালর্ড ইজ রাউন্ড নয়, ম্যারেজ ইজ অলসো রাউন্ড। চলো দাঁত বাঁধিয়ে আসি।'

আর বেড়াল। এরই মধ্যে এই কাহিনীতে দুটো বেড়াল এসে গেছে। প্রথম বেড়ালটি এসেছে উদাহরণে। সেই প্রখ্যাত সাহিত্যিক, সুধাময়কে প্রতিষ্ঠিত করতে গিয়ে অসহায় একটি বেড়ালছানা এনেছেন। পৃথিবী হল গেস্টাপোর পায়ের বুটজুতো আর বেড়াল হল অসহায় জীবন। এ কাহিনীর বেড়াল এই পরিবারের জীবনদর্শন। অভাবের কুমির পরিবারটিকে চিউইংগামের মতো চিবোলেও, মানুষগুলো ফ্যান-ফোন-ফ্রিজ-মারুতিঅলা পরিবারের সদস্যদের মতো

নীচ আর সংকীর্ণ হয়ে যায়নি। ঐশ্বর্যশালীর নাস্তিকতা অথবা ভীত-আস্তিকতা নয়, মেঠো মানুষের সহজ সরল ঈশ্বর-বিশ্বাসে পরিবারটি চালিত। গৃহকর্তার চিৎকার-চেঁচামেচি, তাঁর বাইরের দিক, ভেতরে তুলতুলে সাদা ভাল্লুকের মতো, স্নেহ-ভালবাসা-মমতা-উদারতা ঘাপটি মেরে বসে আছে।

পাজামা আর গেঞ্জি-পরা যুবকটি যদি আমাদের এই কাহিনীর নায়ক হয় তাহলে তার কিছু গুণ থাকা চাই। ছেলেটি সম্প্রতি বাঙলায় এম-এ করেছে। ভীষণ সরল। জগৎ ও জীবন সম্পর্কে সন্দেহবাদী নয়। বাঁচতে ভালবাসে। মানুষের সঙ্গে মিশতে ভালবাসে। অতীতের গল্প তাকে টানে। তার ভবিষ্যৎ হতাশায় ভরা নয়। বয়সের তুলনায় বুদ্ধি পাকেনি। সকলের সব কথাই সে বিশ্বাস করে। ঠকলেও তার জ্ঞান হয় না। ক্ষমাশীল। 'যাক-গে, একটা দুটো লোক ওরকম করতেই পারে'—বলে হেসে উড়িয়ে দেয়। বাবা, মা, বোন, তিনজনকেই সে খুব ভালবাসে। তিনজনের জন্যেই সে জীবন দিতে পারে। তার মৃত্যুভয় নেই। নিজে অসম্ভব কষ্ট করতে পারে। সাজ-পোশাকের কাপ্তেনি তার অসহ্য লাগে, কিন্তু অতিমাত্রায় পরিচ্ছন্ন। সে অলস নয়, কিন্তু ঠেলে না তুললে, ভোরবেলা সে কিছুতেই বিছানা ছেড়ে উঠতে পারে না। ঘুম থেকে ওঠার পরও নিজেকে ক্লান্ত মনে হয়। মনে হয়, সারা রাত সে যেন লড়াই করে উঠল। সে নিজেই বলে 'ডিংডং-ব্যাটল'।

এইবার ছেলেটির একটা সুন্দর নাম রাখা যাক। এমন একটি ছেলের নাম শংকর ছাড়া আর কিছুই ভাবা যায় না। 'নিউমারোলজি' বলে একটা শাস্ত্র আছে। বিজ্ঞানের বাইরে। সেই শাস্ত্র অনুসারে শংকর নামের ছেলেরা ভালো হতে বাধ্য। এই যে শংকরের চরিত্রটা এই রকম হয়ে গেল, এরপর আর প্রেমের গল্প আর হয় না। এই ছেলে কখনও প্রেম করতে পারে না। কারণ শংকর নিজের জামার বুক পকেটে উদ্বোধন থেকে কেনা স্বামী বিবেকানন্দের ছোট্ট একটি ছবি রাখে। সত্যি রাখে। এটা গল্প নয়। মুভি ক্যামেরার বদলে এবার আমি নিজে আসরে নেমে পড়লুম। সেই ঘটনাটির মতো। শংকর আমার গলায় চেন দিয়ে টানছে।

শংকরকে জিজ্ঞেস করেছিলুম, 'তুমি স্বামীজীর ছবি সব সময় বুক পকেটে রাখো কেন? ভণ্ডামি! গলায় গুরুদেবের লকেট ঝুলিয়ে অনেক পরমার্থী দেহার্থী হয়ে বেশ্যালয়ে যায়।'

'সে কে কি করে আমি জানি না। আমার জানার দরকার নেই। আমি

একটা শক্তির স্পর্শ পাই বলে রাখি। একটা আদর্শ আমার হাত ধরে রাখে সব সময়। আমার হতাশা কেটে যায়। স্বামী বিবেকানন্দ হতে পারবো না কোনও দিন ; কিন্তু তাঁর ত্যাগ, বিবেক বৈরাগ্য যদি সামান্য স্পর্শ দিতে পারে আমাকে, এ জীবনে আমার কোনও দুঃখ থাকবে না, হতাশা থাকবে না।'

'কেন তুমি তো ফোর্ড অথবা গেটি কি ওনাসিসের ছবি রাখতে পারো। তুমি একটা ইণ্ডাস্ট্রিয়াল কিংডম গড়ে তুলতে পারো। ত্যাগ তো নেগেটিভ অ্যাপ্রোচ। তুমি জীবনের পজিটিভ-সাইডটা নিচ্ছো না কেন, তার কারণ তোমার অক্ষমতা। ভাবে যা করা যায়, কাজে তা করা যায় না। ধরতে গেলে শক্তি চাই, ছাড়তে গেলে শক্তির প্রয়োজন হয় না। দুর্বলের আলগা হাত থেকে তো সবই খুলে পড়ে যায়। সেইটাকেই ত্যাগ বলা হোক। উড়ো খই গোবিন্দায় নমঃ।'

'ভোগের একটা ব্যাকরণ আছে। সিঁড়ি আছে। ধাপ আছে। ত্যাগের কোনও ব্যাকরণ নেই। ত্যাগ করতে গেলে কি ভীষণ শক্তির প্রয়োজন, আপনার ধারণা নেই। ছেঁড়া, তালি মারা একটা জামা গা থেকে খুলে ছুঁড়ে ফেলে দিতে হলেও মন টেনে ধরে। ভোগ বসে আছে মনের ভেতরে, কাঠকয়লার আগুন জেলে। অহরহ ফুঁ মেরে চলেছে বিষয়ের রোয়ার। আরো চাই, আরো চাই, সদাসর্বদা এই সংকীর্তন চলেছে। এই যা পেলুম, পরমুহূর্তেই তাতে আর মন ভরে না, অন্য কিছু চাই। চাওয়া, পাওয়া না পাওয়া, পুড়ে যাওয়া ছাই। এ এস এইচ। এ এস…এস।'

'আমার কি মনে হয় জানো, ধর্ম, ধার্মিকতা, আধ্যাত্মিকতা, আদর্শ, সংযম, ত্যাগ, বৈরাগ্য, সবই হল দুর্বলের বলিষ্ঠতা। এক ধরনের আত্মতৃপ্তি। তুমি বাংলার এম. এ, তোমার দ্বারা তো আর কিছু করা সম্ভব নয়। স্কুল মাস্টারি জোটানোও শক্ত। তুমি এখন সন্ন্যাসীও হয়ে যেতে পারো। আবার কেউ যদি তোমাকে বলে আমার অসুন্দরী মেয়েটিকে বিয়ে করো, তোমাকে আমি আমার কোম্পানির বিরাট একজন এক্জিকিউটিভ করে দোবো, তাহলেই তোমার মতিগতি বদলে যাবে। ব্যাঙ্গালোরে সাজানো অফিসে গিয়ে বসবে। সাজানো কোয়ার্টার। লাল গাড়ি। স্যুট, টাই, পার্টি, ড্রিংকস। সোসাইটি। কলগার্লস।'

শংকর বললে, ঠিক হচ্ছে না। গতানুগতিক হয়ে যাচ্ছে। দার্শনিক তর্ক-বিতর্কে না গিয়ে, একপাশে বসে নিরাসক্ত হয়ে দেখুন, আমি কি করি। কি ভাবে আমি ফুটে উঠি। ভালো, ক্ষমতাশালী লেখকরা পাকামো না করে জীবনকে অনুসরণ করেন। জীবন সৃষ্টি করেন স্বয়ং ঈশ্বর। এক এক জীবন

এক এক রকম। জন্মানো মাত্রই জীবন-ঘড়ির টিকটিক শুরু হয়ে গেল। সব মানুষেরই ভেতরে একটা ঘড়ি আছে। সেই ঘড়ি ঠিক করে একজন মানুষ মুহূর্তে মুহূর্তে কেমন থাকবে, তার শরীর, তার মানসিক অবস্থা, তার অনুভূতি, তার কর্মতৎপরতা। রোজ সূর্য উঠছে, সূর্য অস্ত যাচ্ছে। জোয়ার আসছে নদীতে ভাটা পড়ছে। বিভিন্ন গতিতে গ্রহ ঘুরছে সূর্যের চারপাশে। কোনও ব্যতিক্রম নেই। সূর্যের গতি, সমুদ্রের জোয়ার ভাটার সঙ্গে জীবনের অনেক কিছুর প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। ভূমিকম্পের সাইক্‌ল আছে, ঋতুচক্র আছে, আবহাওয়ার পরিবর্তনের একটা সাইক্‌ল আছে। মানুষের মন, মগজ, ভালো লাগা, না লাগা, কাজ করার ইচ্ছা, অনিচ্ছা সবই এই ঘড়ির নিয়ন্ত্রণে। যদি পারেন ডক্টর হেরম্যান সোবোদার, দি পিরিয়ডস অফ হিউম্যান লাইফ বইটা পড়ে নেবেন। মানুষ যা ভাবে তাই করে, যা ভাবে না, তা করে না, করলেও জোর করে করে। আর এই ভাবনাটা নিয়ন্ত্রণ করে তার জন্মকালীন ঘড়ি।'

আমার চরিত্রের হাতে মার খেয়ে আমি থেবড়ে বসে পড়লুম।

শংকর যে জায়গাটায় শোয়, তার মাথার কাছে একটা কুলুঙ্গি। সেইখানে একটা টেবিল ঘড়ি। মরচে ধরা। তবে অ্যালার্মের শব্দটা ভারি সাংঘাতিক। সেই শব্দে পুরো বাড়ি জেগে ওঠে। শংকরের একটা হিসেব আছে। অ্যালার্মটা যখন বাজে তখন উনুনটা ধরে আসে। শংকর চৌকি থেকে নেমে, ঘুম চোখে সোজা এগিয়ে যায় বাইরে, যেখানে উনুনটা অল্প অল্প ধোঁয়া ছাড়ছে। উনুনটাকে সোজা তুলে এনে রান্নাঘরে বসিয়ে দেয়। একটু দেরি করলেই তার অধৈর্য মা তুলে আনবেন। মা যাতে ক্রমশ বেঁকে আসছেন। কোমরে স্পণ্ডিলোসিস। শংকর মাকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করে, আর বোনকে ভালবাসে ফুলের মতো। সমস্ত কায়িক পরিশ্রম থেকে দূরে রাখতে চায়। শংকরের মানসিকতা হল সংসারের সমস্ত ঝড়ঝাপ্টা তার ওপর দিয়েই যাক। অনাহার অসুখ, অপমান, যা কিছু অশুভ সব বহে যাক তার ওপর দিয়ে, বাকি সকলে ওরই মধ্যে একটু আড়ালে, একটু সুখে থাকুক। দুঃখটাকে শংকর ভীষণ ভালবাসে। কষ্টে মানুষ পবিত্র হয়, চরিত্রবান হয়। প্রাচুর্যে মানুষ চরিত্রহীন হয়। জীবন একঘেয়ে হয়ে যায়। শংকর নিজের কাজ নিজেই করে নিতে ভালবাসে। গরম, জ্বলন্ত উনুনটাকে রান্নাঘরে পাচার করে দিয়ে, শংকর বিছানা তুলবে। বোন শ্যামলী তাকে সাহায্য করতে চাইলেও শংকর সাহায্য নেবে না। ছেলেবেলায় তার আদর্শবাদী শিক্ষক তার মনে একটি মন্ত্র লিখে দিয়ে গেছেন

চিরতরে, সেলফ্ হেল্প ইজ বেস্ট হেল্প। বিছানা তোলার পর শংকর মুখ ধোবে।

উঠান। কল। জল পড়ছে সরু সুতোর মতো। উঠানটা শ্যাওলা ধরাই হওয়া উচিত ছিল। কিন্তু পরিষ্কার। ঝকঝকে পরিষ্কার। এর জন্যে সমস্ত কৃতিত্বই শংকরের পাওনা। শংকরের মা একবার পা হড়কে পড়ে গিয়েছিলেন টিনের বালতির ওপর। ঈশ্বরে অসীম কৃপা। কোমরটা ভাঙেনি। সামনের একটা দাঁত খুলে পড়ে গিয়েছিল। দাঁতটা একটু নড়বড়েই ছিল। সেই দিন থেকে শংকরের কাজ হয়েছে, পাথর মেরে উঠান পরিষ্কার। বাঙালির মজা হল, নিজেরা ভালো কিছু করবে না। অন্যে কেউ কিছু করলে হাসাহাসি হবে। এই উঠান পরিষ্কার নিয়ে নানা কথা শংকরের কানে আসে। বেকার ছেলে অফুরন্ত সময় কি আর করবে। একটা কিছু তো করতে হবে! এ কথাও কানে এসেছে, শরীরটা পুরুষের হলেও মন আর স্বভাবটা মেয়ে মানুষের। উনুনে কয়লা দিচ্ছে, দুপুরে গুল দিচ্ছে। কলতলায় চাল ধুচ্ছে। শংকর মনে মনে ভাবে—মুখ দিয়েছেন যিনি, বাত দিয়েছেন তিনি।

কলতলায় যাবার সময় শংকর খড়ম পরে। চিৎপুর থেকে খুঁজে খুঁজে এক জোড়া খড়ম কিনে এনেছে। পায়ের তলাটা নোঙরা হয়ে গেলে তার বিশ্রী লাগে। খড়মের খটাস্ খটাস্ শব্দে সকলকে সচকিত করে শংকর কলতলায় গিয়ে দাঁড়াল। শংকর গামছার বদলে ব্যবহার করে একটুকরো সাদা কাপড়। গামছা জিনিসটাকে সে অপছন্দ করে। তোয়ালে বড়লোকের এবং অস্বাস্থ্যকর। শংকর এক মিটার মার্কিন কিনে এনে নিজেই মেশিন চালিয়ে ধার দুটো সেলাই করে নেয়। তার সেই শিক্ষাগুরু বলতেন, লিভ ইন স্টাইল। বাঁচাটা যেন রুচিসম্মত হয়। অঢেল খরচ না-করেও রুচিসম্মত বাঁচা যায়।

বাঙালির জীবন হল, জল আর কল। কলতলা খালি যাবার উপায় নেই। কেউ না কেউ থাকবেই। শংকর খড়ম পায়ে কলতলায় গিয়ে দাঁতে বুরুশ ঘষতে লাগল। আর সেই সময় দ্বিতীয় উনুনটি তুলতে এল আরতি। তীব্র চেহারা। যেমন রঙ, তেমনি ধারালো চোখমুখ। চোখ দুটো যেন ছুরি ছোলা। খুব নাম করা ভাস্কর কেটেছেন। পটলচেরা। মণি দুটো জবল জবল করছে। শংকরের কলতলায় আসা আর আরতির উনুন তুলতে আসা রোজই এক সময় হয়। এই নিয়ে তৃতীয় পরিবারটিতে নানা আলাপ আলোচনা। আরতিদের উনুনটা আকারে বেশ বড়। এক একবারে সের পাঁচেক কয়লা ধরে। আগুনও

হয় তেমনি গনগনে। আরতি একহারা, লম্বা। শংকর রোজই দেখে, আরতি নানাভাবে চেষ্টা করছে উনুনটাকে কায়দা করার। পারছে না। তখন শংকর এগিয়ে গিয়ে বলে, 'দেখি সরুন।' তারপর উনুনটাকে অক্লেশে তুলে নিয়ে গিয়ে বসিয়ে দেয় তাদের রান্নাঘরে। এক মুহূর্ত না দাঁড়িয়ে ফিরে আসে কলতলায়। রোজই আরতি কিছু বলতে চায়। বলা আর হয় না, কারণ শংকর এক মুহূর্ত দাঁড়ায় না। কোনও দিকে তাকায় না। তার মুখে রাশ। গায়ের ওপর সাদা মার্কিনের টুকরো। আরতির জীবনের ঘোরালো একটা ইতিহাস আছে। কে বলেছে বাঙালি ইতিহাস বিমুখ। পারিবারিক ইতিহাস কারোর অজানা থাকে না। কোনও ভাবেই চেপে রাখার উপায় নেই। কোথা দিয়ে ঠিক বেরোবেই বেরোবে। আরতির বাবার আর্থিক অবস্থা একসময় খুবই ভাল ছিল। মধ্য কলকাতায় সুন্দর একটা বাড়ি ছিল। বাড়ির পেছনে লন ছিল, ফুলগাছ ছিল, দোলনা ছিল। একটা গোমড়ামুখো ভকসহল গাড়ি ছিল। আরতিকে দেখলেই বোঝা যায়, আরতির মা খুব সুন্দরী ছিলেন। বিদুষী মহিলা; একটু বিলিতি ভাবাপন্ন। আরতির বাবার বিশাল এক ব্যবসা ছিল। দুই পুরুষের ব্যবসা। পিতামহ ফেঁদেছিলেন, পিতা বাড়িয়েছিলেন। আরতির বাবা আধুনিক করেছিলেন। কারবারটা ছিল এনামেলিং-এর। এনামেলের হাজাররকম জিনিস-পত্র তৈরি হত। রপ্তানি হত বিদেশে। বিশাল কারখানা ছিল ওপারে। গঙ্গার ওই কূলে। রপ্তানির সূত্রে আরতির বাবা বহুবার বিদেশে গেছেন। বিবাহ করেছিলেন এক অতি সম্পন্ন স্টিভেডারের সুন্দরী মেয়েকে। মেয়েটি ইংলিশ মিডিয়ামে লেখাপড়া করে গ্র্যাজুয়েট হয়েছিল। শিক্ষিতা, সুন্দরী মেয়ে অনেকটা মৌচাকের মতো। সব সময়ই সেই চাকে মৌমাছি বিড়বিড় করে। আরতির রাসায়নিক পিতা জীবন আর জগতকে কর্মযোগীর দৃষ্টিতে নিয়েছিলেন। খাটবেন, খুটবেন, অর্থ উপার্জন করবেন. কিছু মানুষের কর্ম-সংস্থান করবেন। দিনের শেষে ফিরে আসবেন সুখী গৃহকোণে। সেই গৃহকোণ অবাঞ্ছিত উপদ্রবে আর সুখী রইল না। তিনি ভেবেছিলেন বাঙালি মেয়ে এক স্বামীতেই সন্তুষ্ট থাকবে। তা আর হল কই! বাড়ি, গাড়ি, বিত্ত, আদর্শবাদী স্বামী, স্বাভাবিক এইসব পাওনার ঊর্ধ্বে একটু হিং-এর গন্ধ। একটু পাপ। একটু বিশ্বাস-ঘাতকতা। একটু লুকোচুরির আকর্ষণ কারো কারো কাছে অনেক বেশি। থ্রম্বোসিস শুধু মানুষের হয় না, ভাগ্যেরও হয়। আরতির যখন তিন-চার বছর বয়েস, আরতির মা গৃহত্যাগ করলেন এক তরুণ পাঞ্জাবী-শিল্পপতির সঙ্গে।

দিল্লিতে তাঁর বিশাল একসপোর্ট-ইম্পোর্টের ব্যবসা। কে জানে ভদ্রমহিলা এখন কেমন আছেন। যৌবন কি ধরা আছে দেহে। থ্রম্বোসিসের প্রথম আক্রমণ। আরতির বাবা করুণাকেতন প্রথম ধাক্কাটা কাটালেন। এলো দ্বিতীয় আঘাত। কারখানায় শুরু হল ধর্মঘট। ভাঙচুর, খুনোখুনি। হল লকআউট। কারখানার ভেতরে জঙ্গল তৈরি হয়ে গেল। যন্ত্রে মরচে ধরে গেল। করোগেটের চাল খুলে খুলে পড়ে গেল। ঝড়ে চিমনি দুমড়ে গেল। পেছনের পাঁচিল ভেঙে মালপত্র চুরি হয়ে গেল। করুণাকেতন বেধড়ক ধোলাই খেয়ে হাসপাতালে পড়ে রইলেন তিনমাস। এদিকে এনামেলের জায়গায় এসে গেল, স্টেনলেস স্টিল, প্ল্যাস্টিক, হিট রেজিসটেণ্ট গ্লাস। পুরো ব্যবসা চৌপাট হয়ে গেল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণীর মতো। বাড়ি গেল, লন গেল, দোলনা গেল, টেনিস কোর্ট গেল। এইবার তিন নম্বর স্ট্রোক। ভাগ্য আর দেহ দুটোই সেই আঘাতে টাইসনের ঘুসি খাওয়া বকসারের মতো লুটিয়ে পড়ল রিং-এ। এক থেকে দশ গুণে গেলেন রেফারি। করুণাকেতন উঠতে পারলেন না। মায়ের দেনা শোধ করছে আরতি। মাসের রোজগার সাতশো টাকা। ব্যাংকে ফিকসড ডিপোজিটের ইণ্টারেস্ট। আরতির দিকে অনেকেরই নজর আছে। সেই সর্বনাশ আর পৌষ মাসের গল্প। মা যার চরিত্রহীনা, সেই মেয়ে কদিন আর ঠিক থাকতে পারে। তিমির বাচ্চা, তিমিই হবে। অনেকেই দাঁতে দাঁত মিশমিশ করে বলে, আঃ, একবার বাগে পেলে হয়। পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ আছে, যাদের দিবারাত্র এক চিন্তা, কখন একটা মেয়েকে ক্যাঁক করে ধরবো। সামনে দিয়ে কোনও মেয়ে চলে গেলে ভাবে এই যাঃ, চলে গেল। চোখে শিকারী বেড়ালের ঘুটঘুটে দৃষ্টি। এদিকে তাকাচ্ছে, ওদিকে তাকাচ্ছে। বন্ধুর বাড়িতে গেছে, বন্ধুর স্ত্রী চা দিতে এসেছে। সেণ্টার টেবিলে চা রাখার জন্যে নিচু হয়েছে, অমনি, বাপ করে উঠল। বন্ধু জিজ্ঞেস করল, কি হল ভাই সন্তু, চা পড়ল গায়ে?' বন্ধুর স্ত্রী জানে কি হয়েছে। তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বুকে আঁচল টেনে দিল। আর মুহূর্তমাত্র দাঁড়াল না। চলে গেল ভেতরে। চলে যাবার পর স্বামীকে জিজ্ঞেস করল, 'জিনিসটা তোমার কোথাকার আমদানি! চোখে আবার খাবো দৃষ্টি! অসভ্য।'

না, এইবার তৃতীয় উনুনটাকে এশট্যাবলিশ করা যাক। রোগা, পাতলা, অ্যানিমিক এক মহিলা, চেহারা দেখে বয়েস বোঝার উপায় নেই। কুড়িও হতে পারে চল্লিশও হতে পারে। ঢালাই উনুন, কয়লাটয়লা পড়ে বিশ, ত্রিশ কেজি

ওজন হয়েছে। অতি কষ্টে হাঁপাতে হাঁপাতে উনুনটাকে ভেতরে নিয়ে গেল। পরক্ষণেই, বাইরের রকে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে একপাশে বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভেতর থেকে দামড়াপানা একটা লোক বেরিয়ে এসে, আকাটের মতো বললে, 'কি, আজ চা-টা হবে? চাটা না খেলে তোমার দেখি গতর আর নড়েই না। যে পুজোর যা নৈবেদ্য। বাবু এখানে বসে হাওয়া খাচ্ছেন। ওদিকে আমার দোকান লাটে উঠুক।'

শঙ্কর এই দৃশ্য রোজই দেখে। দেখে, একটা পেটমোটা যমদূতের মতো লোক, অসুস্থ, ক্ষীণজীবী এক মহিলাকে ক্রীতদাসীর মতো ব্যবহার করছে। কে বলেছে, দেশ স্বাধীন হয়েছে, মানুষ স্বাধীন হয়েছে, শিক্ষা, সংস্কৃতির প্রসার হিন্দুসভ্যতা এক সুপ্রাচীন সভ্যতা। বিশ্বের গৌরব। দামড়া লোকটা কাটা কাপড়ের ব্যবসা করে। হাতিবাগানে স্টল আছে। অনেক রাতে বাড়ি ফেরে নেশা করে। রোজই বৌটাকে ঘরে খিল দিয়ে পেটায়। অন্যেরা প্রতিবাদ করেছিল, ভদ্রলোকের পাড়ায় এ কি ছোটলোকমি। রোজ রাতে চিৎকার, চেঁচামেচি। দামড়া এখন পলিসি পাল্টেছে। বউয়ের মুখে গামছা পুরে পেটায়। আবার রোজ সকালে টেরিকটনের পাঞ্জাবি, চুস্ত পাজামা পরে, মশলা চিবোতে চিবোতে ব্যবসায় যায়। তখন বোঝাই দায়, লোকটা ইতর না লোকটা ভদ্রলোক। তখন সে রতনবাবু। দুটো পয়সার মুখ দেখেছে। রতনবাবু আবার পার্টি করেন। বলা যায় না, দেশের যা অবস্থা হচ্ছে, এই মালই হয় তো মন্ত্রী হয়ে বসবেন। হয় তো শিক্ষামন্ত্রী হবেন।

শঙ্কর ব্রহ্মদৈত্যের মতো খড়ম খটখটিয়ে ঘরে গিয়ে ঢোকে। তার সেই ছোট ঘরে চারখানা থান ইট আছে। সেই ইট চারটে সরিয়ে প্রাণ ভরে ডন মারে। পঞ্চাশটার কম নয়। শখানেক বৈঠক। জানালার গরাদ ধরে ঝুলে থাকে বেশ কিছুক্ষণ। ব্যায়াম হয়ে যাবার পর, পুরো দু মুঠো ছোলা খায়। চারটে বাতাসা দিয়ে। তারপর এক লোটা জল। এরপর সে একটা ব্যাগ বগলে বাজারে যায়। শঙ্কর বেশ গুছিয়ে বাজার করতে পারে। সাতটাকা হল তার বাজেট। মাসে দুশো দশ টাকা। মাছ, মাংস, ডিম খাওয়ার পয়সা নেই। এক প্যাকেট দুধ আসে। দু'বার চা হয়। সকালে একবার, বিকেলে একবার। একটু বেড়াল খায়। যে-টুকু বাঁচে, সেইটুকু সে জোর করে মাকে খাইয়ে দেয়। শঙ্করের বাবার, প্যাকেটের দুধ খাওয়ায় ভীষণ আপত্তি। সংসারের খরচ শঙ্করই কন্ট্রোল করে। মাসে সাতশো টাকার এক পয়সা বেশি খরচ করলে চলবে না। বরং

কিছু বাঁচলে ভাল হয়। তিনশোটাকার মতো বাড়ি ভাড়া। শংকরদের অবস্থাও এক সময় বেশ ভাল ছিল। বাবা হঠাৎ বসে যাওয়ায় সংসারটা দমে গেছে। শংকর ভাবে, তা যাকগে। চিরকাল মানুষের সমান যায় না। জন্মেছি, জলে পড়েছি। সাঁতার কাটতেই হবে। স্রোতের অনুকূলে, স্রোতের বিপরীতে। যখন, যেমন। হাত পা সর্বক্ষণ ছুঁড়তেই হবে। তা না হলেই ভুস। অতল তলে। শংকর যে ভাবে বেঁচে আছে, সেই বাঁচাটাই তার ভীষণ ভালো লাগে। সকালে ছোলার বদলে, ডিম আর টোস্ট হলে তার খুব খারাপ লাগবে। ডাল, ভাত আর যে কোনও একটা তরকারির বেশি অন্য কিছু হলে সে খেতেই পারবে না।

শংকর যেমন শংকরদের সংসার চালায়, আরতি সেইরকম চালায় আরতিদের সংসার শংকর ছেলে, আরতি মেয়ে। শংকর আর আরতি প্রায় একই সময় রাস্তায় নামল। দুজনেরই হাতে ব্যাগ। আরতির ব্যাগটা সুন্দর, শংকরের ব্যাগটা সাদামাটা। আরতির রুচিটা একটু অন্যরকম। তাদের ঘরদোর ওরই মধ্যে বেশ সাজানো গোছানো। প্রতি মাসে কোনও একটা জায়গা থেকে বেশ কিছু টাকা আসে। আমি জানি, কোথা থেকে আসে। আরতির বাবার কিছু টাকা ব্যাংকে ফিকসড করা আছে। সেই সুদে কোনওরকমে চলে যায়। দুজনের সংসার। ঝামেলা তেমন নেই। আরতি জীবনের সুদিন দেখেছে; তাই এই দুর্দিনে সে একটু বিষণ্ণ। রাস্তায় বেরোলে তার বিষণ্ণতা বেশি বোঝা যায়। উদাস দৃষ্টিতে চারপাশে তাকাতে তাকাতে চলে। যেন সে হেঁটে চলেছে জগৎ সংসারের বাইরে দিয়ে।

শংকর রাস্তায় বেরোলেই পাড়ার কয়েকটা বাচ্চা তাকে ঘিরে ধরে। ওরা সব শংকরের বন্ধু। বাচ্চাগুলোকে শংকর ভীষণ ভালবাসে। তাদের সঙ্গে এমন-ভাবে কথা বলে যেন সমবয়সী! খেলার কথা, পড়ার কথা, খাওয়ার কথা। বাড়িতে কিছু তৈরি হলে শংকরের জন্যে নিয়ে আসে পকেটে করে। ঠোঙায় করে। এই বাচ্চাদের সঙ্গে শংকর মাঝে মাঝে চড়ুইভাতি করে। সে বেশ মজা। কেউ নিয়ে এল আলু। কেউ নিয়ে এল ময়দা। কেউ তেল। বনস্পতি। শংকরের সমান ভাগ থাকে। একটা কেরসিন কুকার আছে। অপুদের বাড়ির ছাদে, জমে গেল বনভোজন। শংকর রাঁধে, বাচ্চারা জোগাড়ে। কখনও কখনও শ্যামলী এসে যোগ দেয়, সেদিন রান্নাটা বেশ খোলতাই হয়। শালপাতা। লুচি আলুরদম, শুকনো, শুকনো। শংকর সন্ধেবেলা বাচ্চাগুলোকে এক জায়গায়

করে পড়তে বসায়। তখন তার ভূমিকা শিক্ষকের। এদের কারোরই অবস্থা তেমন ভালো নয়! শংকরের একটাই ভয়, পৃথিবীর প্রতিযোগিতায় ওরা যেন বড়লোকদের কাছে হেরে না যায়! যত সুযোগ ওরাই তো গ্রাস করে নিচ্ছে। ভালো বাড়ি। ভালো স্কুল, ভালো খাওয়া, ভালো পরা। রাস্তা দিয়ে যখন গাড়ি হাঁকিয়ে যায়, তখন ধরাকে সরা জ্ঞান করে। এদের সঙ্গে ট্রেনের এক কামরায় ভ্রমণ করা যায় না। সিনেমা, থিয়েটারে বসা যায় না। রেস্তোরায় ঢোকা যায় না। এদের অর্থের উৎস হল ব্যবসার দুনম্বরী পয়সা। চাকরি হলে বাঁ হাতের কামাই। পয়সার জোরে ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, বিলেত, সুন্দরী স্ত্রী। পৃথিবীর সমস্ত ঝোল এরা নিজেদের কোলেই টানছে। একটা বাচ্চা একবার খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। তার চিকিৎসার জন্যে শংকর সাহায্য সংগ্রহে বেরিয়েছিল। পাড়ার সকলেই সামর্থ্য অনুসারে যে যা পারলেন, দিলেন। পাড়ার বড়লোক শিল্পপতি মানিক ব্রহ্ম বললেন, 'চাঁদা তুলে তুমি কজনের চিকিৎসা করাবে? সারা দেশটাই তো অসুস্থ। এই সব দায়িত্ব হল স্টেটের।' ভুরু কুঁচকে ভদ্রলোক বলেছিলেন, 'আমাদের দেশের সমস্যাটা কি বলো তো, এই রকেটের যুগে আমরা এখনও পড়ে আছি পল্লীমঙ্গলের আইডিয়া নিয়ে। ও-সব বাজে কাজ ছেড়ে দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাবার চেষ্টা করো। কিছু মরবে, কিছু বাঁচবে। যাদের বাঁচার অধিকার নেই, তাদের মরতে দাও। একটা গাছে যত ফল ধরে সবই কি আর বাঁচে, পাকে? কিছু পাখিতে ফেলে দেয় ঠুকরে। কিছু পড়ে যায় ঝড়ে। কিছুতে পোকা লেগে যায়। জীবজগতের এই হল নিয়ম। তুমি কি করবে, আমিই বা কি করব!' মানিক ব্রহ্ম আচ্ছা করে উপদেশ পাম্প করে শংকরকে ছেড়ে দিলেন। এদেশে তিনটে জিনিস খুব সহজে পাওয়া যায়, বিনা পয়সায়। কলের জল, উপদেশ আর গণ ধোলাই।

অপুটাকে দেখতে ভারি সুন্দর; কিন্তু ভাগ্যটা ভীষণ অসুন্দর। তিনবছর বয়েসে বাবাকে হারিয়েছে। ভদ্রলোক হাওড়ার এক ঢালাই কারখানায় কাজ করতেন। সেইখানে এক দুর্ঘটনায় প্রাণ হারান। স্ত্রী, ছেলে, বৃদ্ধা মা আর সাবেককালের একটা একতলা বাড়ি রেখে গেছেন। অপুর মা যে কি-ভাবে সংসার চালান, শংকর তা জানে না। সবাই আশা করেছিলেন, অপুর মা বাড়ি-বাড়ি বাসন মেজে বেড়াবে। অন্তত পাড়ার লোক একজন সুন্দরী, যুবতী ঝি পাবে। সে গুড়ে বালি। অপুর মা আজ সাত-সাতটা বছর ঠিকই চালিয়ে যাচ্ছেন, ভদ্রঘরের বউদের যেমন চালানো উচিত। এই নিয়েও গবেষণার শেষ

নেই। একটা সিদ্ধান্তে এসে এখন সবাই বেশ সন্তুষ্ট, অপুর মা লুকিয়ে দেহ-ব্যবসা করে। আরে ছিঃছিঃ। এই ছিছি শব্দটা বলতে পারায় সকলেরই বেশ কোষ্ঠ-সাফ।

অপু শংকরের হাতে একটা কাগজের মোড়ক দিয়ে বললে, 'মা তিলের নাড়ু করেছিল, তোমার জন্যে নিয়ে এলুম। জিনিষটা কেমন হয়েছে, খেয়ে বলো তো। তুমি তো তিলের নাড়ু ভালবাসো।'

'ভালবাসি মানে! তিলের নাড়ু আমার জীবন। গোলাপের গন্ধ আছে?'

'না গো, গোলাপ আমরা পাবো কোথায়! শোনো না, আমি অনেক অনেক বড় হয়ে, যখন তোমার মতো বড় হয়ে যাবো, তখন তো আমি চাকরি করবো, তখন তোমাকে আমি গোলাপ তিলের নাড়ু খাওয়াবো, প্যাঁড়া খাওয়াবো।'

'বড় হলেই কি আর চাকরি পাওয়া যায় রে অপু। এই তো দেখ না, আমি বড় হয়ে বসে আছি।'

'তুমি চাকরি পাওনি তো, সে বেশ হয়েছে। কেন বলো তো, তুমি চাকরি পেলে, রোজ নটার সময় বেরিয়ে যাবে, আর রাত নটায় ফিরে আসবে, তাহলে আমাদের কি হবে, বলো। তুমি শংকরদা চাকরি কোরো না। তুমি একটা দোকান দাও। আমার মা বলছিল, আমাদের রাস্তার দিকের ঘরের দেয়ালটা ভাঙলে সুন্দর একটা দোকান ঘর হবে। সেখানে, একটা দর্জির দোকান করলে কেমন হয়! তা মা বললে, আমি, তো ছাঁটকাট বেশ ভালই জানি, সঙ্গে একজন পুরুষ মানুষ থাকলে করা যেত। তুমি আজ মায়ের সঙ্গে কথা বলো না শংকরদা। আমার তাহলে টেরিফিক আনন্দ হয়।'

'তোর না অপু কোনও বুদ্ধি নেই, একেবারে গবেট মেরে যাচ্ছিস। অংকে তুই রসগোল্লা পাবি। দোকান করতে গেলে টাকা চাই। অ্যাতো, অ্যাতো টাকা। সেই টাকাটা কোথা থেকে আসবে পাঁঠা!'

'টাকা?' কথা হচ্ছিল রকে বসে। অপু গালে হাত রাখল। শংকর অপুর সেই ভঙ্গিটির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মোড়ক খুলে একটা তিলের নাড়ু মুখে ফেলল। বেশ মুচমুচে। পাকটা বেশ ভালই হয়েছে।

অপু হঠাৎ যেন আশার আলো পেল। গাল থেকে হাত সরিয়ে শংকরের হাঁটুতে একটা চাপড় মেরে বললে, 'নো প্রবলেম। আমরা এ বছর, মা দুর্গার পুজো করবো! বারোয়ারি।'

'হচ্ছে দোকানের কথা, তুই চলে গেলি দুর্গাপুজোয়! তুই কেমন করে

ফার্স্ট-সেকেন্ড হোস। আয়, তোর মাথাটা ওপেন করে দেখি।'

'শোনো না, আমার প্ল্যানটা। তারপর তুমি আমাকে গাধা বলো গাধা, পাঁঠা বলো পাঁঠা। আমরা ঘুরে ঘুরে, ঘুরে ঘুরে অনেক টাকা চাঁদা তুলবো ; তারপর ছোট এতটুকু একটা মূর্তি এনে পুজো করে, বাকি টাকায় দোকান।'

শঙ্কর অপুর মাথায় টাক করে একটা গাঁট্টা মেরে বললে, ওরে আমার চাঁদুরে তারপর গণধোলাই। হাতে হাতকড়া। কোমরে দড়ি। কি প্ল্যানই বের করলে।'

'তা হলেও তুমি একবার আমার মায়ের সঙ্গে কথা বলো। জানো তো, তোমাদের বাড়ির ওই রতনবাবু মাকে খুব জপাচ্ছে। লেডিজ টেলারিং করবে। লোকটা একেবারে দু নম্বরী। যখন তখন আমাদের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। কাল রাতে চুল্লু খেয়ে এসেছিল। আমি কিন্তু একদিন পেছন থেকে ঝেড়ে দোবো। লোকটা কাল রাতে আমার মায়ের গায়ে হাত দেবার চেষ্টা করেছিল। শঙ্করদা তুমি আমার মাকে ভালবাসো তো ?'

'ভীষণ! যারা সৎপথে থেকে লড়াই করে, আমি, তাদের সকলকেই ভালবাসি।'

'মা-ও তোমাকে ভীষণ ভালবাসে। তুমি একটা কিছু করো শঙ্করদা।'

'দাঁড়া, ব্যাপারটা সিরিয়াসলি ভেবে দেখি। আজ দুপুরে তুই আমাকে মিট কর। তারপর দু'জনে মিলে লড়ে যাবো। তুই ভাইরাস কাকে বলে জানিস ?'

'না গো।'

'ভাইরাস এমন রোগ জীবাণু, যা কোনও ওষুধে মরে না। এই রতন-টতন হল সেই ভাইরাস।'

'তিলের নাড়ু কেমন খেলে ?'

'জমে গেছে।'

'মাকে গিয়ে বলতে হবে। মা তোমাকে ভীষণ খাওয়াতে ভালবাসে। বলে, আমার যদি সেরকম অবস্থা হত, তাহলে তোর শঙ্করদাকে আমি রোজ রোজ নানা রকম করে করে খাওয়াতুম। আমার মা কত কি যে করতে জানে।'

'সে আর কি হবে! বেশি বাজে বাজে খাবি না। পেলেও না। ডাল, ভাত একটা যে-কোনও তরকারি। বাকি সব বোগাস। এই নে, এই দুটো নাড়ু তুই খা।'

'আমি তো খেয়েছি।'

'তবু খা। আমি দিচ্ছি।'

শংকর শিশুমহল ছেড়ে উঠে পড়ল। শংকরের কড়া নিয়ম, এইবার সব পড়তে বসবে। সবাই জানে ঠিক মতো লেখা পড়া না করলে শংকরদা তার ভালবাসবে না। তা ছাড়া শংকরদা ওই বড় বাড়ির ছেলেদের দেখিয়ে বলে দিয়েছে, ওদের হারাতে হবে। লেখাপড়ায়, খেলাধুলোয়, শরীর-স্বাস্থ্যে। ওই যে ছাইরঙের বাড়ির ছেলেরা খুব কেতা মেরে, সাদা প্যান্ট, স্পোর্টস গেঞ্জি পরে ক্রিকেট প্র্যাকটিস করতে বেরোয়। ব্যাট, লেগগার্ড, গ্লাভস, টুপি, ওয়াটার বটল, হটবক্সে লাঞ্চ। শংকরদা বলেছে, তোরা কাঠের বল আর দিশি ব্যাটে অনেক বড় খেলোয়াড় হবি। শরীরটাকে আগে ভালো করে পেটা। লোহা তৈরি কর। লোহা। শংকর যা বলে, এরা তাই শোনে। শুধু শোনে না, প্রত্যেকে ভালোভাবে গড়ে উঠছে।

শংকর যখন রাস্তা দিয়ে হাঁটে তখন মনে হয় রাস্তার দু'ধারে আনন্দ ছড়াতে ছড়াতে চলেছে। এ-পাড়ার প্রতিটি মানুষ তাকে ভীষণ ভালবাসে, কারণ শংকর সকলের। শংকরের সেই শিক্ষকমহাশয় অনেক দিন আগে শংকরকে বলেছিলেন, 'দেখ শংকর, ভাগ্য কাকে বলে জানো?'

'গ্রহ।'

'না গ্রহ যাদের ভাগ্য, তারা হল দুর্বল, স্বার্থপর। একটা জিনিস চির-কালের জন্যে জেনে রাখো, সবলের জন্যে, গ্রহ, নক্ষত্র, ঠিকুজী, কোষ্ঠী, পাথর নয়। তুমি আর তোমার পৃথিবী। মাঝখানে কেউ নেই, মাথার ওপরেও কেউ নেই। এই পৃথিবীর সঙ্গে যে-সম্পর্ক তুমি গড়ে তুলবে সেইটাই তোমার ভাগ্য। পৃথিবীর সঙ্গে যদি ভালোবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলতে পারো, তাহলেই তুমি সফল মানুষ। কৃতী পুরুষ। পৃথিবী মানে শুধু মানুষ নয়, জীবজন্তু, প্রকৃতি। আর পৃথিবীর সঙ্গে যদি তোমার ঘৃণার সম্পর্ক হয়, তাহলে অন্যভাবে তুমি যত সফলই হও, পৃথিবী তোমার কাছে আর স্বর্গ থাকবে না, হয়ে যাবে নরক।' শিক্ষকমহাশয় বারে বারে ইংরেজি করে বলেছিলেন, 'ইউ অ্যান্ড ইওর ওয়ার্লড।'

শংকর সেই শিক্ষাটিই মনে প্রাণে গ্রহণ করেছে। প্রথম প্রথম অভ্যাস করতে হয়েছে, এখন স্বভাবে এসে গেছে। এখন সে চেষ্টা না করেও ভালবাসতে পারে। কোনও কারণ ছাড়াই আনন্দে থাকতে পারে, আনন্দ বিলোতে পারে। শংকর যে বাজারে বাজার করে, সেই বাজারের বাইরে চাষীরা এসে বসে। তারা

কিছু শস্তায় আনাজপাতি দেয়। শংকর তাই অকারণে ভেতরের বাজারে ঢোকে না। ভেতরে সব পয়সাঅলা লোকের তাণ্ডব। কেউ অসময়ের কপি কিনছে, কেউ কিনছে টোম্যাটো। কারোর আবার বিট-গাজর না হলে চলে না। বইয়ে পড়েছে, বিট-গাজরে হেলথ ভালো হয়, আর যায় কোথায়। পুলিসের আস্তাবলে ঘোড়া গাজর খাচ্ছে, এদিকে গুপীবাবুও খাবার টেবিলে বসে গাজরের স্যুপ খাচ্ছেন। মুখ চোখ দেখলে করুণা হয়, মনে হয় সতীদাহর বদলে, পতি-দাহ হচ্ছে।

শংকর দূর থেকে দেখলে, ফুলের দোকানের সামনে বেশ যেন একটা গণ্ডগোল মতো হচ্ছে। ছোটখাটো একটা ভিড় জমে গেছে। শংকর দোকানটার পাশ দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, গোলমালটা হচ্ছে আরতির সঙ্গে। ফুলঅলার গলাই বেশি কানে আসছে। শংকর প্রথমে ভেবেছিল নাক গলাবে না। মেয়েদের ব্যাপারে সে মাথা ঘামাতে চায় না। কখন কি হয়ে যায়! মন নয়তো মতিভ্রম। কোনওভাবে একবার খপ্পরে পড়ে গেলেই সংসার। তখন কামিনী-কাঞ্চনের দাসত্ব। মেয়েরা মানুষের সত্তা হরণ করে। নাকে দড়ি বেঁধে সংসারের ঘানিতে জুতে দেয়। এত ভেবেও শংকর না এগিয়ে পারলো না। পাশ থেকে সে আরতির মুখটা দেখতে পেল। ধারালো, অভিজাত একটি মুখ। টিকলো নাক। ঘাড় পর্যন্ত লম্বা রেশমের মতো চুল। আরতিকে বাইরের আলোয় আরও ফর্সা দেখায়। টান টান পাতলা দেহত্বকের ভেতর থেকে রক্তের আভা বেরিয়ে আসে। সাধারণ বাঙালি মেয়ের চেয়ে দীর্ঘকায়। শরীরের কোথাও অপ্রয়োজনীয় মেদ নেই। শংকরের মনে হচ্ছিল, সে যেন শাড়ি পরা একটা জিপসী মেয়েকে পাশ থেকে দেখছে। মুখে ফুটে আছে অসহায় একটা বিরক্তির ভাব। আরতি কথা বলছে খুবই নিচু স্বরে, ফুল-অলা চিৎকার করছে গাঁক গাঁক করে। আরতির বিব্রত আর বিরক্ত মুখ দেখে শংকরের খুব করুণা হল। এই শ্রেণীর মানুষের কাছ থেকে শংকর সরে থাকতেই চায়। অবস্থা থেকে পতন হলেও, আরতিরা ক্যাপিট্যালিস্ট মনোবৃত্তির মানুষ। বাবা ছিলেন শিল্পপতি। বহুলোক কাজ করত তাঁর কারখানায়। তিনি ডাণ্ডা ঘোরাতেন। দুর্ব্যবহার করতেন। ন্যায্য দাবি থেকে তাদের বঞ্চিত করতেন। আজ জার্মানি, কাল প্যারিস করে বেড়াতেন। বিলিতি সুরার সঙ্গে, মোলায়েম চিকেন খেতেন। শ্রমিকের রক্ত শোষণ করতেন।

এই অবধি শুনে চিত্র পরিচালক আর প্রযোজক দুজনেই চিৎকার করে উঠলেন, মারো ফ্ল্যাশব্যাক। লোকটাকে তুলুন বিছানা থেকে। শুরু থেকে

শেষ পর্যন্ত একটা চরিত্র বিছানায় শুয়ে থাকলে চলে। স্রেফ শুয়ে শুয়ে অ
কোঁত পেড়ে পয়সা নিয়ে যাবে। তা ছাড়া স্টোরির এই জায়গায় একটা অ
প্রণয়ের স্কোপ আছে।'

কথা বলছিলেন প্রযোজক। দশটা কোল্ড স্টোরেজের মালিক। চার
পশ্চিম বাঙলায়। সেখানে পা থেকে মাথা পর্যন্ত হরিপাল আর তারকেশ্বরে
আলু। আলুর একেবারে একসপার্ট। কোন আলু কখন পচবে, একবার উঁ
মেরেই বলতে পারেন। এম পিতে দুটো কোল্ড স্টোর। সেখানে শুধু ডিম
ইউ পিতে আপেল। একসময় উচ্চ রক্ত চাপের চিকিৎসা ছিল, শিরা কেটে খানি
রক্ত বের করে দেওয়া। প্রযোজক ভদ্রলোকের তহবিলে কিছু কালো রক্ত জমেছে
সেই রক্ত কিঞ্চিৎ ঝরাবেন। নায়ক-নায়িকাদের সঙ্গে একটু গা ঘষাঘষি করবেন
প্রতিষ্ঠিতরা তেমন পাত্তা দেবেন না। নতুন মুখ আনবেন।

ঠিক তাই। প্রযোজক পরিচালককে বললেন, 'আরতির ক্যারেকটারটা বে
ফুটছে। আপনি কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিন—আমাদের নতুন বাঙলা ছবি
জন্যে নতুন নায়িকা চাই। যাঁদের চেহারা জিপসীদের মতো। কোমর সর
পেছন ভারি, বুক উঁচু, ছবি সহ আবেদন করুন। ফুল সাইজ। সামনে থেকে
পেছন থেকে পাশ থেকে।'

পরিচালক বললেন, 'তারপর আমি প্যাঁদানি খেয়ে মরি। দমদম সেন্ট্রা
জেলে গিয়ে লপসি আর ধোলাই দুটোই একসঙ্গে খাই। নতুন মুখ আজকা
আর পেপার পাবলিসিটি দিয়ে হয় না। দিনকাল বিগড়ে গেছে। ট্যালে
সার্চ করতে হয়। বড় বড় হোটেল রেস্তোরাঁয় রোজ দুপুর থেকে বন্ধ না হও
পর্যন্ত গিয়ে বসে থাকতে হয়। বিশ তিরিশ হাজার খরচ হয় হোক, কিন্তু উ
আসবে একটা নতুন মুখ।'

'আপনার মশাই সবেতেই টাকা ওড়াবার ধান্দা।'

'এই লাইনটাই যে ওড়বার আর ওড়াবার।'

পরিচালক আমাকে বললেন, 'আমার একটা সাজেসান আছে। আপনি ফু
দোকানের বদলে ওটাকে তরমুজের দোকান করে দিন। আমার একটু সুবিধে হয়

'কি আশ্চর্য! আপনার সুবিধে! আরতির আজ একটা ফুলের মাল
প্রয়োজন যে। তার বাবার আজ জন্মদিন। তাছাড়া, এটা কি তরমুজে
সময়। আম চলে গেছে। আপেল ঢুকছে। আঙুর আসছে। কমলালে
পাকছে।'

'আপনাকে সে নিয়ে মাথা ঘামাতে হবে না। আই সে তরমুজ, অ্যান্ড
ার শুড বি তরমুজ। লাল, লাল অজস্র: গোল গোল তরমুজ ডাই হয়ে
। তরমুজ হল সেকস-সিম্বল। আমি আমার ক্যামেরার অ্যাঙ্গল থেকে
ছি। একটা সাইড থেকে ধরছি। কিছু তরমুজ ফোকাসে, কিছু অফ
কাসে। কাঁধকাটা গেঞ্জিপরা তরমুজঅলার চকচকে পুরুষ্ট কাঁধ, বাহু, ঘাড়,
একটা লকেট। চোখ দুটো কমলা ভোগের মতো। ক্যামেরা ধীরে ধীরে
ন করছে।' তরমুজঅলার ছাপকা ছাপকা নীল লুঙ্গি। তার আড়ালে
ভর মতো উরু। ক্যামেরা ঘুরছে, সামনে দাঁড়িপাল্লা, তরমুজ, তরমুজ,
তির বুক। ক্যামেরা আরতির গা চেটে চেটে উঠছে ওপর দিকে। ঘাড়,
া, চিবুক, মুখ, চুল, ব্যাকলাইটে সিল্কের ‧কেশরের মতো, চুল বেয়ে আবার
চ, পিঠ, নিতম্ব, ক্যামেরা ব্যাক করছে, আরতির পুরো শরীর, সামনে তরমুজ,
। ওপাশে তরমুজঅলার অশ্লীল মুখ। ক্যামেরা টপে। আরতির ব্রেস্টলাইন,
কর কাছে মোমপালিশ করা লাল একটা তরমুজ, ফর্সা টুকটুকে হাতে ধরে
ছে। শর্ট ডিজলভ। এক গেলাস লাল তরমুজের সরবত নিয়ে আরতি
গয়ে আসছে, শংকর বসে আছে সোফায়। আরতি স্লো-মোশানে আসছে।
র ম্যাকসি আর চুল বাতাসে উড়ছে। সে স্লো-মোশানে এসে তুলোর মেয়ের
তা শংকরের সোফার হাতলে শরীরে শরীর ঠেকিয়ে বসে পড়ল। বাঁ হাত
করের কাঁধে, ডান হাতে পাতলা গেলাস। গেলাসে লাল তরমুজের সরবত।
খানে একটা গানের স্কোপ। গজল টাইপের গান, ফুরোবার আগে পান
র নাও থ্যাঁতলানো যৌবন। আর কদিনই বা পৃথিবীতে আছি, বলো না
লাদিন। আলাদিন। আলাদিন। এইখানে ইকো লাগাবো। একেবারে
টে যাবে। এদিকে গান আর নাচ চলেছে। ওদিক থেকে মরা মাছের মতো
কিয়ে আছে বৃদ্ধ দুটো চোখ। ইনভ্যালিড বুড়ো বাপ দেখছে মেয়ের রঙ্গ।
রীর পড়ে গেছে। কথা সরে না মুখে; কিন্তু স্মৃতি আর চেতনা দুটোই
জ করছে। ফের এগেন ফ্ল্যাশ-ব্যাক। আরতির মা বাতাসে উড়তে উড়তে
সছে, ব্যালে ড্যানসারের পোশাক পরে। বাংলা ছবিতে ব্যালে আমিই প্রথম
ু করবো। আরতির ডবল রোল। একবার মা, একবার মেয়ে। মেয়েকে
খে বাপের মেয়ের মায়ের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে। এক ঢিলে দু' পাখি।
য়দা করে বুড়োর ললিতা কমপ্লেক্স দেখানো হয়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আর শংকরকে দিয়ে অত ভাবিয়েছেন কেন? সিনেমায়

ভাবনার কোনও স্কোপ নেই, কেবল অ্যাকসান, অ্যাকসান।'

'সে তো আপনার দিক। আমাকে তো গল্পটা আগে ছাপাতে হবে। সাহিত্য একটু জীবনদর্শন, চিন্তাভাবনা, এসব চায়। প্রুস্ত-এর নাম শুনেছেন। সে ভদ্রলোকের লেখায় শুধুই ভাবনা। ভাবতে ভাবতেই শেষ। আগে আমাকে সাহিত্যের কথা ভাবতে হবে। আপনারা তো প্রথমে আমাকে পাঁচশোটি টাকা ছুঁইয়ে সরে পড়বেন, তারপর তো আপনাদের আর টিকির দেখা পাওয়া যাবে না

'ওটা আমাদের লাইনের একটা রীতি। লেখককে বলি দিয়ে আমাদে শুভমহরত হয়। প্রাচীনকালে কি প্রথা ছিল জানেন, ব্রিজ তৈরির সময় নরবলি দেওয়া হত। একটাকে মেরে আরও হাজারটা মৃত্যু ঠেকানো। ব্রিজও বড় কা ফিল্মও বড় কাজ। বিশ, তিরিশ লাখ টাকা গলে যাবে।'

'আপনার বাজেট চল্লিশ, পঞ্চাশ লাখ, আর লেখক বেচারার পাওনা পাঁচশো কি বিচার মাইরি আপনাদের।'

'না, পাঁচশো নয়। আপনাদেরও তো পয়সার খাঁকতি কম নয়। কচলাকচা ধস্তাধস্তি করে সেই হাজার পাঁচেকেই গিয়ে ঠেকে। সেকালে সাহিত্যিক ে আর নেই। তাঁরা সাহিত্যটাই বুঝতেন। আপনারা সাহিত্য বোঝেন না, কেব বোঝেন টাকা আর পুরস্কার। শেম! শেম! সাহিত্য-সেবা করুন। সরস্বতী সেবা। লক্ষ্মীর সেবা নয়। তিন পাতা কি লিখলেন তার ঠিক নেই, আধবোত হুইস্কি উড়ে গেল।'

প্রযোজক বললেন, 'আমি আর একটা জায়গায় সাংঘাতিক রকমের সেক্স রেপ ভায়োলেন্স দেখতে পাচ্ছি। কড়া মশলা। অপুর মা। মধ্যবয়সী এ মহিলা। আট কি ন বছর বয়সের একটা ছেলের মা। সাবেককালের একতল একটা বাড়ি। গাঁথনির ইঁট সব ফাঁক ফাঁক হয়ে গেছে। সেই ইটের ফাঁকে আটকে ঝুলছে সাপের খোলস। তার মানে ভিটেতে বাস্তু সাপ বাস আছে ঘাপটি মেরে সাপের খোলস দেখলেই গা সিরসির করে। সেই সিরসিরে ভাবটা এসট্যাবলিশ করতে হবে। খোলোস দুলছে বাতাসে, বাতাসে দুলছে শাড়ি। প্রতীকী ব্যাপার। সাপ এখনও আছে। ছোবল এখনও মারতে পারে। সিনেমা প্রতীকী শট হল, আপনাদের সাহিত্যের ভাবনা। মহিলার ভরাট শরীর, যাকে বলে রাইপ যৌবন। সুন্দরী তো বটেই। ডিসপেপটিক নয়। স্বামীর মৃত্যু পর অনেক বছর হয়ে গেছে। স্মৃতি ফেডআউট করেছে। শরীর শরীরের ধর্ম পালন করতে চায়। মন আনচান করে। সব শাসন ছিঁড়ে বেরিয়ে যেতে ইচ্ছে

করে। যত রাত বাড়ে শ্বাস ততই দীর্ঘ হয়। জ্বর নয়, জ্বর-জ্বর লাগে।'

'এ তো আপনার সাহিত্য।

'সাহিত্য তো বটেই। এক সময় আমিও লিখতুম মশাই। আলসুতে আমাকে শেষ করে দিয়েছে।'

'সাহিত্য পর্দায় আসবে কি করে। পেছন থেকে কমেন্ট্রি হবে। ভারি গলায় কোনও শ্রেষ্ঠ আবৃত্তিকার পাঠ করে যাবেন, এঁর বগলে থার্মোমিটার দিলে জ্বর উঠবে না, কিন্তু সূর্য পশ্চিম আকাশে নেমে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এঁর জ্বর লাগে। আড়মোড়া ভাঙতে ইচ্ছে করে।'

প্রযোজক চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে এসে আমাকে জড়িয়ে ধরলেন। মুখে হুইস্কির গন্ধ হালকা হয়ে এসেছে। বুকের কাছে বিলিত গন্ধ ছুঁড়েছিলেন, সেই গন্ধে শরীরের গন্ধ মিলে, মানুষের জীবনের বেঁচে থাকার বিচিত্র এক সুবাস তৈরি হয়েছে।

'কি হল মশাই?'

'আপনাকে এখুনি পাঁচশো টাকা অ্যাডভানস করে যাবো; এ স্টোরি আমার চাই।'

'আপনার এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ?'

'উঃ, অসাধারণ একটা কথা আপনি বললেন, আমার গায়ে কাঁটা দিচ্ছে।'

'কি কথা মশাই?'

'ওই যে বগল আর থার্মোমিটার। সুন্দরী এক মহিলা নিজের বগলে নিজে থার্মোমিটার গুঁজছেন। ভাবতে পারেন দৃশ্যটা? আমার মরে যেতে ইচ্ছে করছে। দৃশ্যটা সামনে করিয়ে এখুনি দেখতে ইচ্ছে করছে।'

প্রযোজক উত্তেজনায় চেয়ার মিস করে ধুপ মেঝেতে বসে পড়লেন। সেই অবস্থায় থেকেই বললেন, 'ডিরেক্টার, এই রোলটা কে নেবে? কাকে দেওয়া যায়। সেই যে সেই মহিলা, কি যেন একটা ছবিতে করলেন, বিবাহিতা হয়েও ফটোগ্রাফারের সঙ্গে লড়ালড়ি।'

'বুঝেছি। ভালোই হবে।'

'তুমি তা হলে বুক করে ফেল। যত টাকা লাগে। যদ্দিন আমার আলু আছে, তদ্দিন আমার টাকার অভাব নেই। কোথায় পাওয়া যাবে তাকে?'

'বোম্বাই।'

'তুমি আজই ফ্লাই করো।'

পরিচালক বললেন, 'ফুলটাকে তাহলে তরমুজ করে দিন। আমি একটা বিউটি অ্যান্ড দি বিস্ট ধরনের মারাত্মক শট নিয়ে বাংলার কেন, সারা বিশ্বের চিত্রজগৎকে স্তম্ভিত করে দোবো।'

প্রযোজক বললেন, 'তরমুজের বদলে আলু করলে হয় না। আমার খরচ তা হলে কমে।'

'ধুর মশাই আলুর কোনও গ্ল্যামার নেই। কালার ফিল্মে আলু যায় না। তরমুজ হল ইতালির জিনিস। ইতালি মানে সোফিয়া লোরেন, ব্রিজিৎবার্দো। ডিরেক্টার আমি না আপনি?'

'আমি প্রযোজনা না করলে তোমার পরিচালনা হয় কি করে?'

'আর আমি ভাল ছবি না করে দিলে, আপনার বিদেশ যাওয়া হয় কি করে? আলু করে তো আর ফরেন যাওয়া যায় না।' প্রযোজক একটু দমে গেলেন। ব্রীফকেস খুলে ময়লা ময়লা পাঁচটা একশো টাকার নোট বের করে আমার হাতে দিতে দিতে বললেন, 'আলুর আড়তে নোট এর চেয়ে পরিষ্কার হয় না। আপনি বগল আর থার্মোমিটারটা ঠিক করুন। আর একটা জায়গা আপনি কামাল করে দিয়েছেন, সেটা হল সেলাই মেশিন। উঃ আপনার মাথা মশাই। মাথা না বলে হেড বলাই ভালো।'

'সেলাই মেশিন পেলেন কোথায়।'

'কি আশ্চর্য, এই আপনার হেডের প্রশংসা করলুম। অপুর মা টেলারিং করবে। শংকর জয়েন করবে, এইরকমই তো ঠিক হল।'

'গল্প সেদিকে যায় কিনা দেখি। এখনও তো ফুলের দোকানেই আটকে আছে।'

'যায় মানে! যাওয়াতেই হবে। অপুর মা জোরে জোরে সেলাইকল চালাচ্ছে, শংকর ঠিক উল্টো দিকে মেঝেতে বসে আছে। এইখান থেকেই স্টোরিতে শংকরের পতনের শুরু। দুটো গোল গোল পা আর ভারি উরু মেশিনের তালে তালে নাচছে। শংকরের মনও নাচছে। নামছে, নিচের দিকে নামছে। ক্যাবারে ড্যানসারের পোশাকের মতো আদর্শ খুলে খুলে পড়ে যাচ্ছে।

পরিচালক বললেন, 'বাকিটা আমার হাতে ছেড়ে দিন। এই শটেও আমি ক্র্যাকচার করে দোবো। মেশিনের চাকা ঘুরছে, চাকা ঘুরছে। ক্যামেরা ক্লোজ ফোকাসে ঘুরন্ত চাকা ধরছে। চাকা ধীরে ধীরে থেমে আসছে, আর সেই চাকার ভেতর দিয়ে টাইট-ফোকাসে, দু জোড়া পা, মেঝেতে, জড়াজড়ি, ঘষাঘষি, মহিলার

কলাগাছের কাণ্ডের মতো পায়ের অনেকটা ওপরে শাড়ির কালো ফিতে পাড়। একটা হাত, মাথার পাশে মাথা, আর একটা হাত. একটা বড় কাঁচি, ক্লোজআপে।'

প্রযোজক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দাও। কাঁচিটাকে আরও ক্লোজ-আপে নিয়ে এসো। উল্টো দিকের দরজাটা অল্প ফাঁক হল। একটি কিশোরের মুখ। বড় বড় চোখ। চোখ ভরা বিস্ময়। ছেলেটি আততায়ীর মতো ঢুকছে! পায়ে পায়ে এগোচ্ছে কাঁচিটার দিকে। নিচু হয়ে তুলে নিল কাঁচিটা। তারপর ক্যামেরার ভিসানে একটা তালগোল পাকানো দৃশ্য। একটা হাত উঠল। একটা কাঁচি। ভীষণ একটা চিৎকার। সেলাই মেশিনটা উল্টে পড়ে গেল। শংকর উপুড় হয়ে আছে। তলায় অপুর মা। শঙ্করের পিঠে বড় কাঁচিটার আধখানা ঢুকে আছে। আর রক্ত-ভেজা সেই পিঠে মুখ গুঁজে অপু হাপুস কাঁদছে আর বলছে, শংকরদা, শংকরদা তুমি আমার শংকরদা। আর শঙ্কর ওই অবস্থায় ফ্যাসফেসে গলায় বলছে, অপু, তুই ঠিক করেছিস, তুই ঠিক করেছিস, তোকে কেউ বুঝবে না, তুই পালা। তুই সোজা পালিয়ে যা। তা না হলে তোকে পুলিসে ধরবে। অপু উঠে দাঁড়াল। ভয়ে ভয়ে তাকাল এদিকে, ওদিকে। তারপর হঠাৎ দু' হাতে দরজাটা ঠেলে খুলে, পাগলের মতো ছুটতে লাগল, আর চিৎকার, 'আমি খুন করেছি, আমি খুন করেছি।'

পরিচালক বললেন, 'এইবার আমার হাতে ছেড়ে দিন। লম্বা, সোজা রাস্তা ধরে অপু ছুটছে, ছুটতে ছুটতে অপু হোঁচট খেয়ে ছিটকে পড়ে গেল। বিশাল একটা লরি আসছিল স্পিডে। চাকার সামনে অপুর মাথা। ব্রেক। স্ক্রী-ই-ই-চ শব্দ। অপুর ঘুম ভেঙে গেল। বিছানা! পাশে হাত রাখল। মা নেই। অপু বোঝার চেষ্টা করছে।'

প্রযোজক বললেন, 'আগের শটটাকে স্বপ্ন করে দিলে?'

'তা কি করবো! মাঝ রাস্তায় হিরোকে মেরে দোবো! তাহলে বই তো মার খেয়ে ভূত হয়ে যাবে। চুপ করে শুনুন। এইবার রিয়েল খেলা। অপুর কানে একটা শব্দ আসছে। যেন কোথাও দুটো সাপ ফোঁস ফোঁস করছে। অপু বিছানায় উঠে বসল। ঘর অন্ধকার। একটা মাত্র জানালা খোলা। সেই খোলা জানলায় রাতের আকাশ! দূরে কোথাও একটা কুকুর কাঁদছে। অপু বসে আছে চুপ করে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দটা এখনও কানে আসছে। ক্যামেরা একবার বাড়িটার বাইরে ঘুরে গেল। জনপদ নিদ্রিত। অনেক উঁচু একটা বাড়ির সর্বোচ্চ তলের একটি ঘরে, জোরালো আলো। একটা মানুষের

সিল্যুয়েট। অপুদের বাড়ির ইঁটের ফাঁক থেকে বেরিয়ে আসা হিলহিলে সেই সাপের খোলোসটা বাতাসে দুলছে। পাশের বাড়ির টিভির অ্যাণ্টেনায় প্রায় টাটকা একটা ঘুড়ি বাতাসে বনবন ঘুরছে। তার পাশেই একটা বাড়ির কবজা ভাঙা জানালার পাল্লা যেন ভূতে দোলাচ্ছে। ক্যামেরা আবার ফিরে এল ঘরে। অপু বসে আছে মশারির ভেতরে। সেই ফোঁস ফোঁস শব্দ। অপু মশারি তুলে নেমে এল। অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। খোলার চেষ্টা করল। বাইরে থেকে বন্ধ। তিন-চারবার টানাটানি করল। অপু কাঁদো কাঁদো গলায় ডাকল—মা, ওমা, তুমি কোথায়! অপু বন্ধ দরজার সামনে বসে পড়ল। ফোঁস ফোঁস শব্দটা থেমে গেল। ক্যামেরা চলে এল ঘরের বাইরে। অন্ধকার প্যাসেজে দানবের মতো একটা লোক অপুর মাকে ভাল্লুকের মতো জড়িয়ে ধরে আছে। অপুর মা প্রাণপণ চেষ্টা করছে নিজেকে ছাড়াবার, ছাড়ুন, ছাড়ুন, ছেলেটা উঠে পড়েছে। লোকটা জড়ানো গলায় বলছে, শালাকে একদিন গলা টিপে শেষ করে দোবো শয়তানের বাচ্চা। তোমাকে আমি এখন ছাড়তে পারবো না। অপুর মা লোকটাকে ঠেলে সরাবার চেষ্টা করছে। লোকটা বলছে, তোমাকে আমি দোকান করার জন্যে, পঁচিশ হাজার টাকা দেবো অমনি অমনি। তুমিও মাল ছাড়ো আমিও মাল ছাড়ি। অপুর মা লোকটাকে কামড়ে দিল। লোকটা নেশার ঘোরে অপুর মায়ের গলাটা দু হাতে চেপে ধরল। অপুর মা একটা শব্দ করল। অপু দরজা ঝাঁকাচ্ছে। চিৎকার করছে। লোকটা অন্ধকারে রাস্তায় নামলো। টলতে টলতে এঁকে বেঁকে চলেছে। তিনটে বাড়ি পরে, রকে একটা লোক শুয়েছিল। সে মাথার চাদর সরিয়ে লোকটাকে দেখে নিল। কানে আসছে কিশোরের গলার মা, মা ডাক। দরজা ঝাঁকাবার শব্দ। শব্দের পর শব্দ। দরজা, জানলা খোলার শব্দ। সারা পাড়া জেগে উঠেছে। অপুদের বাড়ির সামনে ভিড় জমে গেছে। তিনটি সাহসী ছেলে ভেতরে ঢুকছে। ক্যামেরা ফলো করছে। তিনধাপ সিঁড়ি। দালান। একজনের পায়ে লেগে একটা বোতল ছিটকে চলে গেল। সে বলে উঠল শালা। সে আরও দু ধাপ এগিয়ে কিসে লেগে হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেল। পড়ে পড়েই সে চিৎকার করতে লাগলো, মার্ডার, মার্ডার। যে দু'জন পেছনে ছিল, তারা ওরেব্বাবারে বলে ছুটে বাইরে চলে গেল। অপু সমানে মা, মা, করে যাচ্ছে। কাট! পুলিসের জিপ আসছে। শেষ রাত। তিন চারজন লাফিয়ে নেমে পড়ল। টর্চের আলো। সকলে ঢুকে গেল ভেতরে। ক্যামেরা অনুসরণ করছে। টর্চের

আলো গিয়ে পড়ল অপুর মায়ের মুখে। মহিলাকে গলা টিপে হত্যা করা হয়েছে। কিছু দূরে গড়াগড়ি যাচ্ছে একটা হুইস্কির বোতল। পড়ে আছে একটা গ্যাস-লাইটার। দালানের আলোটা জ্বালা হয়েছে। সঙ্গে আছে টর্চের আলো। পুলিশ আতিপাতি করে জায়গাটা খুঁজছে। পড়ে আছে সিগারেটের টুকরো। একটা মিনিবাসের টিকিট। দলাপাকানো একটা রুমাল। নতুন, বড় একটা মোমবাতি। আরতির মায়ের হাতের মুঠোয় কয়েক গাছা চুল। পুলিসের অফিসার লাশ তুললেন না। খড়ির গুঁড়ো ছড়িয়ে গোটা জায়গাটা বেষ্টন করে দিলেন। একজন পাহারায় রইল। অফিসার জনসাধারণের দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন, 'এ বাড়িতে আর কে আছে?'

'এর একটা ছোট ছেলে আছে স্যার, ওই ঘরে পুরে বাইরে থেকে চাবি বন্ধ করে দিয়েছে।' 'চাবি নয় স্যার ছিটকিনি।' ক্যামেরা সঙ্গে সঙ্গে দরজায়। সাবেক কালের দরজা। বাঘের মুখ কোঁদা। রঙ চটে গেলেও বোঝাই যায় ভীষণ পোক্ত। একটা জায়গায় খড়ি দিয়ে বড় বড় করে লেখা, অপু। দরজা খোলা হল। ক্যামেরা পুলিসের দু' পায়ের ফাঁক দিয়ে ঘরের ভেতরে নজর করল। জানালা দিয়ে ভোরের আলো আসছে। ফুলের মতো একটি কিশোর মেঝেতে বসে আছে হামাগুড়ি দিয়ে। কাট। পুলিশ বেরিয়ে আসছে। তাদের মাঝখানে অপু। বাইরে অনেক লোক। তার মাঝে একটা দাড়ি-গোঁফ-অলা শক্ত-সমর্থ পাগল। সে হাহা করে হাসছে, তালি বাজাচ্ছে, আর বলছে, 'কে করেছে খুনখারাবি, সবই আমি বলতে পারি, কে করেছে খুনখারাবি।' সবাই তাকে দূর দূর করছে—'বেরো ব্যাটা পণ্ডা পাগলা।' পাগল ছাড়া বাঙলা ছবি জমে না। মনে আছে সেই পাগল ধীরাজ ভট্টাচার্য, আই ক্যান ফোরটেল ইওর ফিউচার। কি অসাধারণ অভিনয়, এক পাগলেই পয়সা উসুল।'

আমি সেই ময়লা ময়লা একশো টাকার নোট পাঁচটা বের করে প্রযোজক ভদ্রলোকের হাতে দিয়ে বললুম, 'এই নিন আপনারা দুজনে হাফাহাফি ভাগ করে নিন, স্টোরি তো আপনারাই করে ফেলেছেন।'

'আহা! রাগ করছেন কেন। একেই বলে তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। আপনাদের ওরিজিন্যাল স্টোরির তো শেষ পর্যন্ত ওই অবস্থাই হয়, মলাট আর ক্ষুদে ক্ষুদে অক্ষরে পর্দার গায়ে একটা নাম, এই তো শেষ পরিণতি। ফিল্ম সাহিত্য নয়, ফিল্ম হল ইণ্ডাস্ট্রি। পয়সা ঢালেগা, পয়সা তোলেগা। আপনাদের সাহিত্য হল অক্ষর সাজাবেন আর নাম কিনবেন। মবলগ

যা পাচ্ছেন পকেটে ভরে ফেলন, কাজে লেগে যান। বাকিটা আমরা ফ্ল্যাশব্যাক করে ড্রিমে সেকস ভরে নামিয়ে দোবো। লিখতে বসার সময় স্লাইট একটু ঢুকু করে নেবেন, দেখবেন অটোমেটিক মাল বেরিয়ে আসবে। পেটে ডিজেল না ঢুকলে লেখার অটোমোবিল চলবে কিসে!'

দুই মাল বেরিয়ে গেলেন। আমি পয়মাল বসে রইলুম হাঁ করে! ফুলের দোকানের সামনে আমার শংকর আর আরতি দাঁড়িয়ে। আমার স্বর্গীয় কিশোর অপু এইবার স্কুলে যাবে। তার মা পরিষ্কার সাদা হাফ প্যান্টের ভেতর গুঁজে দিচ্ছে সাদা জামা। অমন দেবীর মতো মায়ের দিকে আমি আর ভালোভাবে তাকাতে পারছি না। বিশ্রী একটা পাপবোধ আসছে। সত্যিই কি শংকরকে তিনি দেহের ফাঁদে ফেলবেন? রতন হালদারের পক্ষে অবশ্য সবই সম্ভব। পৃথিবীতে বেশ কিছু গাছ আর প্রাণী আছে, যারা অকারণে গরল ছড়ায়। অনেক বিকল্প খাদ্য থাকা সত্ত্বেও মানুষ নিরীহ মুরগীর পালক ছাড়ায় চড় চড় করে। নিজের সুন্দরী স্ত্রী ফেলে বেশ্যালয়ে গিয়ে ধুমসো মেয়েছেলের গোদা পায়ের লাথি খায় পয়সা খরচ করে। এই যেমন কারণাসক্ত, ব্যবসাদার দুজন, আমার চোখ দুটো ঘোলা করে দিয়ে গেল। যেন আমার জন্ডিস হয়ে গেল! শংকর রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ ভাবাশ্রিত। পরোপকারী। প্রকৃতিপ্রেমী। বিশ্বপ্রেমী। যার জীবনের আদর্শই হল নিঃস্বার্থ সেবা, তাকে কেমন করে আমি অপুর মায়ের পায়ের সামনে বসাই। লোক দুটো কি সাংঘাতিক বদ! কি বিশ্রী রুচি-বিকৃতি নিয়ে সমাজে বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মেশিনের সামনে আমার শংকরের মতো ছেলেকে বসতে হবে। সে বসে বসে দেখবে দুটো পুতুল পা নাচছে। আমিও এক মহাপাপী। যে বই আমার পড়া উচিত নয়, সাইকোলজি, সেই বই পড়ে জেনেছি, সেলাই মেশিনে পা দিয়ে চালাতে চালাতে, মেয়েদের এক ধরনের দৈহিক উত্তেজনা হয়, তখন তাদের পা আরও দ্রুত চলতে থাকে। যে কারণে মেয়েদের পা-মেশিন চালানো বারণ। শংকরকে বসে বসে এই দৃশ্য দেখতে হবে। দেখতে দেখতে উত্তেজিত হতে হবে। তার উচ্চ মানস-ভূমি থেকে ধপাস করে পড়ে যেতে হবে। এক ভদ্রমহিলা খোলা গায়ে বগলে থার্মোমিটার লাগাচ্ছেন। সেখানেও সেক্স। এরপর কোনও মহিলা দাঁতে টুথব্রাশ ঘষছেন, সেখানেও সেক্স। দেখার কি দৃষ্টি! আমার নিজেরই ভয় লাগছে এই পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে।

শংকর এগিয়ে গেল ভিড় সরিয়ে। ঝগড়া শুনতে অথবা মিটমাট করতে

নয়, ভিড় জমেছে আরতিকে দেখতে। এমন রূপসী মেয়ে এ-তল্লাটে নেই। এই লোকগুলোকেই বা আমি কি বলবো। সব বয়েসেরই মানুষ আছে। আরতিকে চোখ দিয়ে গিলছে। কেউ চোখ দিয়ে কোমর ধরেছে, কেউ ধরেছে নিতম্ব, কেউ চেষ্টা করছে বুকটাকে ভাল করে দেখার, যেন কার্ডিয়োলজিস্ট। কেউ তার ফুরফুরে, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা, বাদামি চুলের দিক থেকে নজর সরাতে পারছে না।

ফুলঅলা শংকরের পরিচিত। খুবই পরিচিত। একসময় দুজনে জুভিনাইল ক্লাবে ফুটবল খেলত। শংকরকে সামনে দেখে ছেলেটা একটু থতমত খেয়ে গেল। শংকর বললে, 'এ-সব কি হচ্ছে, মানিক? জানিস, তুই কার সঙ্গে কথা বলছিস?'

'মাইরি বলছি শংকরদা আমি দু'টাকা ফেরত দিয়েছি। মাইরি বলছি।'

আরতি তেজালো গলায় বললে, 'দু-টাকা ফেতর দিলে, টাকা দুটো আমার হাতেই থাকত। টাকা দুটো নিশ্চয় আমি গিলে ফেলিনি! সব কেনার পর আমার হাতে শেষ একটা পাঁচটাকার নোট ছিল। মালার দাম তিনটাকা। দুটো টাকা গেল কোথায়।'

শংকর বললে, 'মানিক তোর ভুল হচ্ছে। এইরকম ভুল হতেই পারে। তোমাকে ঠকিয়ে দুটো টাকা নেবার মতো মহিলা ইনি নন।'

'ভুল তো ওনারও হতে পারে।'

'হলে টাকাটা ওঁর হাতেই থাকত; কারণ ওঁর বুক পকেট নেই।'

কথা বলতে বলতে শংকরের নজর চলে গেল ছোট একটা বালতির দিকে। ছোট্ট অ্যালুমিনিয়ামের বালতি। সেই বালতিতে রয়েছে এক গুচ্ছ গোলাপ ফুল। সেই ফুলগুলোর পাশে, জলে একটা কি ভাসছে। শংকর বললে, 'ওটা কি?' তারপর আরতির পাশ দিয়ে হাত বাড়িয়ে নিজেই তুললে। আধভেজা একটা দু'টাকার নোট।

'মানিক এটা কি? দেখেছিস, কিভাবে ভুল বোঝাবুঝি হয়। টাকাটা এখানে পড়ে গেছে। তোর দেখা উচিত ছিল। তা না করে, তুই সমানে গলাবাজি করে যাচ্ছিস।'

মানিক হাত জোড় করে বললে, 'দিদি, আপনি আমাকে ক্ষমা করবেন।'

'আপনি আমাকে অনেক যা-তা কথা বলেছেন। শংকরদা এসে না পড়লে আপনি এই এতগুলো মানুষের সামনে জোচ্চর প্রমাণ করে ছাড়তেন। আমার

টাকা আর মানসম্মান দুটোই যেত।'

'এই দেখুন দিদি, আমি কান মলছি। ব্যবসাদার জাতটাই বহুত...।'

শংকর বললে, 'মানিক, আর না।'

আর একটু হলেই মানিকের মুখ ফসকে একটা গালাগাল বেরিয়ে আসত।

শংকর বললে, 'যান, এবার আপনি সোজা বাড়ি চলে যান।'

আরতির ভেতর সুন্দর একটা ছেলেমানুষী ভাব আছে। যখন হাসে, গালে একটা টোল পড়ে। ভুরুর কাছটা, ঠিক নাকের ওপরের জায়গায় অদ্ভুত একটা ভাঁজ পড়ে। যার কোনও তুলনা হয় না। আরতির এই হাসি দেখলে শংকর অবশ হয়ে পড়ে। তার মনে একসঙ্গে অনেক দরজা খুলে যায়। অনেক আলো জ্বলে ওঠে। নানা রঙের কাঁচ বসানো জানালায় রোদ পড়লে যে বর্ণসুষমা হয়, তার মনেও সেইরকম একটা রঙ খেলা করে। সুন্দরী কোনও নর্তকী পায়ে ঘুঙুর বেঁধে নাচতে থাকে। ভীষণ একটা টানাপোড়েন চলতে থাকে ভেতরে। এক মন বলে, ছিঃ ছিঃ, আর এক মন বলতে থাকে, এইটাই তো স্বাভাবিক! শংকর যখন নোট তোলার জন্যে হাত বাড়াচ্ছিল তখন আরতির অনাবৃত কোমরে হাত ছুঁয়ে গিয়েছিল। মসৃণ, ভিজেভিজে। সারা শরীরে যেন বিদ্যুৎ খেলে গিয়েছিল। সেই অনুভূতিটা শংকর কিছুতেই ভুলতে পারছে না। তার কেঁদে ফেলতে ইচ্ছে করছে।

আরতি সেই অদ্ভুত হাসি হেসে বললে, 'আপনি যাবেন না?'

'আমার তো সবে শুরু হল।'

'আমি যদি আপনার সঙ্গে থাকি, তাহলে রাগ করবেন?'

'আমাকে কোনও দিন রাগতে দেখেছেন। আপনার কষ্ট হবে।'

'আমাকে তুমি বলতে কি আপনার খুব কষ্ট হবে?'

শংকর হেসে ফেলল। তার মনে হচ্ছে, নেশা হয়ে গেছে। কিছু আর ভাবতে পারছে না। শীতের সকালে স্নান করে রোদে দাঁড়ালে যে-রকম একটা সুখ সুখ ভাব হয়, সেইরকম একটা সুখ-বোধ হচ্ছে। শংকর আর আপত্তি করতে পারল না। আরতিকে পাশে নিয়ে চাষীরা যেদিকে বসে সেইদিকে যেতে যেতে বললে, 'চলো তোমাকে শস্তার বাজারটা চিনিয়ে দি। দাম কম, টাটকা জিনিস।'

'আমার না অনেক অনেক বাজার করতে ইচ্ছে করে একসঙ্গে। ব্যাগ ভর্তি, ঝুড়ি ভর্তি বাজার।'

'আমারও করে, তবে আমার বাজেট সাত টাকা। বেশ ভালই বাবা, বেশি বাজার মানে বেশি বোঝা।'

'আমার বাজেট মাত্র পাঁচ টাকা, তবে আমি একসঙ্গে তিন দিনের বাজার করি।'

'তোমার বেঁচে থাকতে কেমন লাগে, আরতি ?'

'যখন আমাদের অনেক কিছু ছিল, তখন খুব একঘেয়ে লাগত ; এখন কিন্তু বেশ উত্তেজনা পাই। এই মনে হচ্ছে, বাবার কি হবে! বাবার কিছু হলে আমার কি হবে! আজ গেলে কাল কি হবে, এই ফুরিয়ে গেল কেরোসিন তেল, কে লাইন দেবে। কে যাবে ব্যাংকে ইণ্টারেস্ট তুলতে। আপনি বোধহয় জানেন না, আমাদের আবার অনেকদিনের পুরনো একটা মামলা আছে। তার জন্যে প্রায়ই উকিলের বাড়ি ছুটতে হয়। মামলাটা বেশ মজার। আমাদের ছোট্ট একটা বাগানবাড়ি আছে বারাসতে। সেই বাড়ির কেয়ারটেকার ছিলেন বাবার এক বন্ধু। তিনি বাবার এই অসহায় অবস্থার সুযোগ নিয়ে বাড়িটার দখল ছাড়ছেন না। আমি কেস ঠুকে দিয়েছে। কেসটা যদি জিততে পারি তাহলে আমাদের কষ্ট অনেকটা কমবে। যেভাবে আছি সে ভাবে থাকা যায় না। তারপর ওই রতন হালদার। এগর্জিবিসনিস্ট।'

'সে আবার কি ?'

'সে আপনাকে আমি মুখে বলতে পারবো না। যেদিন ধরে জুতোপেটা করবো সেদিন বুঝতে পারবে। আচ্ছা আপনি আমাকে দেখলে অমন মুখ ফিরিয়ে নিতেন কেন ? কথা বললে, হুঁ হাঁ করে পালিয়ে যেতেন ?'

'সত্যি কথা বলবো, আমার মধ্যে একটু ভণ্ডামি আছে, পাকামিও বলতে পারো। বেকার মানুষ তো, তাই কাজের না পেয়ে নানারকম স্বপ্ন দেখি। সন্ন্যাসী হব, বিরাট সমাজসেবক হব, বন্যাত্রাণে নৌকো নিয়ে ভেসে পড়বো, দণ্ড-কমণ্ডলু নিয়ে চলে যাবো কৈলাস। এই সব মাথায় ঢোকার ফলে মেয়েদের ভীষণ ভয় পাই। যদি কোনওভাব আটকে যাই। নিজের খাবার যোগাড় নেই, তার ওপর সংসার!'

'মেয়েরা কি পুরুষজীবনের বাধা ?'

'সংসারজীবনের নয়, সন্ন্যাসজীবনের বাধা তো বটেই।'

'সন্ন্যাসী কেন হবেন ? সংসারে কোনও কাজ নেই! এই যে আপনি এক গাদা বাচ্চাকে মানুষ করছেন,সারা পাড়াকে আনন্দে মাতিয়ে রেখেছেন,এটা কাজ নয় ?

'কি বলবো বলো ? আমার ভাল লাগে। এখন ধরো আমি যদি সেজেগুজে

পক্ষীরাজ মার্কা হয়ে প্রেম করি, আমার এই মনটা হারিয়ে যাবে। আর একটা সত্য কথা বলবো, রাগ করবে না, বলো ?'

'নির্ভয়ে বলুন।'

'তোমাকে আমি ভয় পাই। তুমি এত সুন্দরী, আর তোমার এমন সুন্দর ভাব, তোমাকে দেখলেই আমার ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ভালবাসতে।'

আরতি শংকরের হাতটা মুঠোয় ধরেই ছেড়ে দিল। ছেড়ে দিয়ে বললে, 'আমিও আপনাকে ভীষণ ভালবাসি আপনার গুণের জন্যে।'

কথায় কথায় বাজার হয়ে গেল। শংকর আজ আর তার সাত টাকার সীমার মধ্যে নিজেকে ধরে রাখতে পারলো না। ছিটকে বেরিয়ে গেল। অনেক দিন পরে বাজারে শোলা-কচু এসেছে। শংকরের ভীষণ প্রিয়। ছাঁকা তেলে শোলাকচু ঝুরো করে কেটে ভাজলে ফুলে উঠে যা অসাধারণ স্বাদ হয়!

শংকর বললে, 'তুমি তো একা! তাই ইচ্ছে থাকলেও অনেক কিছু রাঁধতে পারো না। আমার মা আছে বোন আছে। ভীষণ ভালো রাঁধেন আমার মা। তোমাকে আজ আমি দুটো রান্না খাওয়াবো। খাবে তো।'

'নিশ্চয় খাবো। তাহলে আজ আমি বাবার স্যুপটা করবো, আর কিছু করব না। আমার তৈরি স্যুপ খুব খারাপ হয় না। আপনি একটু টেস্ট করবেন ?'

'না গো আমি তো একা কিছু খেতে পারি না। সকলকে দিতে গেলে তুমি কুলোতে পারবে না। আর একদিন হবে।'

দু'জনে বাড়ি ফিরে এসে অবাক! আরতিদের ঘরের সামনে ছোটখাটো একটা জমায়েত। শংকরের মা ঘরের ভেতরে। শ্যামলী বাইরে যাবার জামাকাপড় পরেও বেরোতে পারেনি। আরতিদের ঘর থেকে বেরিয়ে আসছে। হাতে একটা ভিজে তোয়ালে। শংকর মাকে জিজ্ঞেস করল, 'কি হয়েছে, মা ?'

'ঘরে একটা শব্দ হল। এই তোরা আসার এক মুহূর্ত আগে। ছুটে এসে দেখি এই ব্যাপার।'

করুণাকেতন পড়ে আছেন মেঝেতে। চিৎ হয়ে। চোখ দুটো উর্ধে স্থির। শ্বাস প্রশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ। আরতি রোজ সকালে সাতটার মধ্যে বাবাকে সাজিয়েগুজিয়ে দেয়। এক মাথা পাকা চুল। ভিজে তোয়ালে দিয়ে মুছে, পাউডার ছড়িয়ে, সামনে সিঁথি করে আঁচড়ে দেয়। একদিন অন্তর আরতি নিজেই সুন্দর করে দাড়ি কামিয়ে দেয়। আজ ছিল দাড়ি কামাবার দিন। ফর্সা দুটো গাল চকচক করছে। করুণাকেতনের ঠোঁটের পাশ দিয়ে জলের মতো

একটু কিছু গড়িয়েছে।

শংকর করুণাকেতনের পাশে হাঁটু মুড়ে বসে বুকে কান পাতল। তারপর ডানহাতটা তুলে নিয়ে নাড়ী টিপে ধরল। একসময় হাতটা ধীরে ধীরে নামিয়ে রাখল। মুখ তুলে তাকাল। প্রথমেই চোখে পড়ল আরতির মুখ। অসাধারণ দুটো চোখ। একেই বলে কাজললতা চোখ। দুটো অপরাজিতা ফুলের পাপড়ি। শংকর এমন চোখ কখনও দেখেনি। এমন নাক সে দেখেনি। যেন অ্যালফ্যানসো আমের আঁটি স্টেনসিলকাটার দিয়ে কেটে তৈরি করেছেন ভগবান স্বয়ং।

শংকর হাঁটু ভাঙা অবস্থা থেকে উঠে দাঁড়াল মাথা নিচু করে। দুহাত জোড় করে নমস্কার করল। বুঝিয়ে দিল, করুণাকেতন চলে গেছেন। সঙ্গে সঙ্গে আরতি শংকরের চওড়া বুকে মাথা গুঁজে দিল। শংকরের মা এগিয়ে এসে আরতির মাথার পেছনে হাত রেখে অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। শংকরের একটা হাত আরতির কাঁধে। আর একটা হাত মায়ের পিঠে। তার দু হাতে দু' রকমের অনুভূতি।

করুণাকেতনকে ধরে বিছানায় তোলা হল। ভদ্রলোক পড়ে যাবার সময় বিছানার চাদরটা খামচে ধরার চেষ্টা করেছিলেন। খাটের ধারে একটা বেড়া ছিল, দুপাশে দুটো ছিটকিনি দিয়ে আটকানো যায়। সেই বেড়াটা কি করে খুলে গেল কে জানে। আরতি জন্মদিনের মালাটা মৃত্যুদিনের মালা করে বাবার বুকে পেতে দিল। আরতি খুব শক্ত মেয়ে। ভেতরে ভাঙলেও বাইরে ভাঙেনি। তার চেহারা যেমন ধারালো, মন আর চরিত্রও সেইরকম ধারালো। শংকরের মা আর বোন যতটা ভেঙেছে আরতি ততটা বিচলিত হয়নি। সে জানে, আজ থেকে সে সম্পূর্ণ একা।

শংকর পথে নেমে এল। তার শিশুবাহিনী স্কুলে। পাশে কেউ না থাকলে শংকর তেমন জোর পায় না। বড় কেউ হলে চলবে না। ছোটরাই তার শক্তি। তাদের সঙ্গে বকবক করতে করতেই সে পথ খুঁজে পায়। শংকর তার পরিচিত ডাক্তারবাবুকে ডেকে নিয়ে এল। করুণাকেতনকে যে ডাক্তারবাবু দেখতেন, তিনি কয়েক সপ্তাহের জন্যে ফরেনে গেছেন।

করুণাকেতন যখন ঘরে ফেরার জন্যে পথে নামলেন, তখন দিন শেষ হয়ে এসেছে। শংকরের শিশুবাহিনী এসে গেছে। মানী লোকের যেভাবে যাওয়া উচিত শংকর ঠিক সেইভাবেই ব্যবস্থা করেছে। ফুলে ফুলে সাজানো পালঙ্ক।

শিশুবাহিনীকে সে এখন থেকেই মানুষের যাওয়াটা দেখাতে চায়। যাওয়ার পথ চেনা থাকলে হাঁটতে অসুবিধে হয় না। অপু ফিসফিস করে বললে, 'তুমি যে বলেছিলে বড়লোকের কোনও সাহায্যে লাগবে না, তাহলে ?'

'এরা বড়লোক নয়, মানীলোক, জ্ঞানী, গুণী, বিজ্ঞানী। জিনিসটা বুঝতে শেখ। আর একমাস পরে তোর গোঁফ বেরোবে গবেট।'

অপুর হাতে খইয়ের ঠোঙা। অপু এই প্রথম শ্মশানে চলেছে। শ্যামল একবার ঘুরে এসেছে। তিনমাস আগে শ্যামলের বাবা আন্ত্রিকে মারা গেছেন। করুণাকেতন চোখে চশমা পরে, আরামে শুয়ে আছেন। মানুষের শেষ যাত্রাটা বেশ আরামেই হয়। রোগযন্ত্রণা চলে গেছে। এই মহানিদ্রায় যদি মহাস্বপ্ন থাকে, সে স্বপ্ন আর ভেঙে যাবার ভয় নেই। শঙ্করের ডাকে, শঙ্করের সমবয়সী আরও চারপাঁচজন নেমে এসেছে করুণাকেতনকে কাঁধ দেবার জন্যে। মানুষটির জীবন যখন ধনেজনে ভরপুর ছিল তখন বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজনের অভাব ছিল না। ফ্ল্যাশব্যাকে করুণাকেতনের জীবন আমি দেখতে পাচ্ছি। তাঁর ইণ্ডাস্ট্রি, গাড়ি-বাড়ি, ঝাড়লণ্ঠন লাগানো বিশাল খাওয়ার ঘর, খানা-টেবিল। দিন রাত অতিথিঅভ্যাগতের আনাগোনা। সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। শিফনের শাড়ি। বিলিতি সুগন্ধ। অনেক রঙিন বেলুনের গুচ্ছ। তারপর সব একে একে ফাটতে শুরু করল। ঝুলে রইল নিজের জীবনের সরু একটি সুতো।

প্রায় ছ'ফুট লম্বা শঙ্কর। কোমরে কোঁচার গাঁট বেঁধে দিশি একটা ধুতি পরেছে একটু উঁচু করে। তার ওপর সাদা ধবধবে একটা গেঞ্জি। চাঁপা ফুলের মতো গায়ের রঙ। এক মাথা রেশমের মতো চুল। ডান কাঁধে লাল একটা গামছা পাট করা। তার ওপরে খাটের একটা দিক। শঙ্করের পাশে আরতি। সামনে, পেছনে শঙ্করের শিশুবাহিনী। কারোর হাতে এক গোছা জ্বলন্ত ধূপ। কেউ ছড়াচ্ছে ফুল। কেউ ছড়াচ্ছে খই আর পয়সা। শবযাত্রা সুগম্ভীর কবিতার মতো এগিয়ে চলেছে শ্মশানের দিকে। যে শাড়ি পরে আরতি সকালে বাজারে গিয়েছিল। সেই শাড়িটাই পরে আছে। আজ আর দুটি পরিবারেই হাঁড়ি চড়েনি। শঙ্কর আজ আরতিকে মায়ের হাতের ঝিঙে-পোস্ত আর শোলাকচু ভাজা খাওয়াতে চেয়েছিল। ভাগ্যের কি পরিহাস। প্রতিটি মানুষ এক একটি ঘড়ি। জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই সেই ঘড়ি চলতে থাকে টিকটিক করে। দমে ক'বছরের পাক মারা আছে তা একমাত্র ঈশ্বরই জানেন। আরতি পায়ে পায়ে সামনের দিকে এগোলেও, মনে মনে সে চলেছে পেছন দিকে। যাকে তার স্পষ্ট

মনে আছে। বিচিত্র এক মহিলা। রূপটাই ছিল। গুণ বলে কিছুই ছিল না। ভীষণ অর্থলোভী উচ্ছৃংখল, দুর্দান্ত এক মহিলা। রূপের গর্বে, বাপের বাড়ির ঐশ্বর্যের গর্বে একেবারে মটমট করত। কতদিন সে দেখেছে, বাবা, গভীর রাতে, একা একটা আর্মচেয়ারে বাগানের দিকের বারান্দায় অফিসের জামাকাপড় পরেই বসে আছেন চুপচাপ। পাইপের ধোঁয়া আর নিবছে না। সারা বাড়ি তামাকের গন্ধে থমথম করছে। বসার ঘরে সাদা কাঁচের ডোমে একটি মাত্র দুঃখী দুঃখী আলো জ্বলছে। মা কোথায় কেউ জানে না। করুণাকেতনের সেই ছবিটাই লেগে আছে আরতির মনে। নিঃসঙ্গ, পরিত্যক্ত একটা মানুষ। বাবার টাকাতেই মা স্ফূর্তি করত। বাবার টাকাতেই হীরের আংটি, নাকছাবি, দুল। করুণা-কেতন ছিলেন কাজ পাগলা মানুষ। সত্যেন বোসের সেরা ছাত্র।

শ্মশান-চিতায় শোয়ানো হল করুণাকেতনকে। চেহারার এতকালের রুগ্নভাব কেটে যেন ফুলের মতো ফুটে উঠেছেন। আমি শুধু শংকর আর আরতিকে দেখছি। কে বলবে, এরা একই পরিবারের ভাইবোন নয়। দু'জনেই মাথায় প্রায় সমান সমান। শংকরের কিশোরবাহিনীর কিশোররা একটা বেদীতে পাশাপাশি বসে, বড় বড়, নিষ্পাপ চোখে সব দেখছে। দুটো চিতা জ্বলছে লাফিয়ে লাফিয়ে। একটাতে এক যুবক অন্যটায় একজন মহিলা। মহিলার দশ-বারো বছরের ছেলেটি হাতে একটা বাঁশের টুকরো ধরে উবু হয়ে বসে আছে জ্বলন্ত চিতার অদূরে। এক বৃদ্ধ বারে বারে ছেলেটিকে বলছেন, 'নিমু সরে বোস। চিতা থেকে কাঠ গড়িয়ে পড়লে পুড়ে যাবি।' ছেলেটি সেই কথায় বৃদ্ধের দিকে তাকাচ্ছে, কিন্তু সরছে না। তার চোখের দৃষ্টি স্থির। যেন বরফের দু ফালি চোখ।

শংকরই করুণাকেতনের অনাবৃত দেহে ঘৃত-মার্জনা করল। নিম্নাঙ্গের খণ্ড বস্ত্রটি টেনে নেওয়া হল। এইবার মুখাগ্নি। কাঠের পরে কাঠ। তার ওপর করুণাকেতন। তার ওপর কাঠ। করুণাকেতনের মুখটি কেবল বেরিয়ে আছে। সেই মুখের ঠোঁট দুটিতে আগুন স্পর্শ করাতে হবে। আরতির হাতে ধরা জ্বলন্ত পাটকাঠি কাঁপছে। শংকরই মুখাগ্নি করল। আরতি শংকরের কনুইয়ের কাছটা স্পর্শ করে রইল। এইবার চিতার ডান পাশে আগুন ছোঁয়াতেই চিতা জ্বলে উঠল দাউ দাউ করে। করুণাকেতনের দেহ কালো হয়ে উঠছে। আগুনের হাহা হাসি কাঠের গুঁড়ির ফাঁকে ফাঁকে। করুণাকেতনের মাথার তলায় জ্বলন্ত কাঠে বালিশ। মুখটা তখনও অবিকৃত। ওই নিটোল, গোল মাথাটিতে কত

পরিকল্পনা ছিল, কত আশা ছিল, ছিল সুখের সন্ধান। একটু পরেই ফেটে যাবে ফটাস করে। তিন চার ঘণ্টা পরে এক মুঠো ছাই। সেই ছাইয়ের নাম করুণাকেতন। কর্মকাণ্ডের মধ্যে পড়ে রইল, আকাশের তলায় একটা চিমনি। যার মাথাটা আশ্বিনের ঝড়ে মচকে গিয়ে বাতাসে দোল খায়। ভাঙা এক জোড়া গেট। অস্পষ্ট একটা নেমপ্লেট। একখণ্ড জংলা জমি। একটা মরচে ধরা বয়লার।

শংকর, আরতি আর তার কিশোরদের নিয়ে গঙ্গার ধারে এসে বসল। আরতি এইবার ভাঙতে শুরু করেছে। শঙ্করের বুকে মাথা রেখে ভেতরে ভেতরে ফুলছে। সকালে আরতির কোমরে হাত ঘষে যাওয়ায় শংকরের ভেতরে একটা বেসুর বেজেছিল। এখনকার এই ঘনিষ্ঠতায় তার কিছুই মনে হচ্ছে না। মনে হচ্ছে, একই প্রাণ এই দেহে, আর ওই দেহে। এই দেহের নাম শংকর বলে তার ভেতরে আগুন ততটা জ্বলছে না। মৃত্যুকে মৃত্যু বলে মনে হচ্ছে। ওই দেহের নাম আরতি, তাই চিতাটা ভেতরেও জ্বলছে। মৃত্যুকে মনে হচ্ছে বিয়োগ, শংকরের চিবুকটা ডুবে আছে আরতির চুলে।

অন্ধকার জলধারা সামনে তরতর করছে। ওপারে মিটমিট করছে ঘুম জড়ানো আলোর চোখ। স্লিক স্লিক করে ভেসে যাচ্ছে জেলে ডিঙি। কে একজন চিৎকার করে বললে, জোয়ার আসছে। তিনটে নৌকো সঙ্গে সঙ্গে তীর থেকে সরে গেল মাঝগঙ্গায়। বিশাল একটা জেটি এগিয়ে গেছে জলের দিকে। যেন নদীর বুকে স্টেথিসকোপ বসাবে।

অপু হঠাৎ বললে, 'শংকরদা, ওই ওনার খুব কষ্ট হচ্ছে না?'

'না রে! ওটা তো দেহ, পুড়ছে। ওতে প্রাণ নেই। তোর জামা প্যাণ্ট খুলে পুড়িয়ে দিলে কষ্ট হবে?'

'তাহলে সব কষ্ট প্রাণে?'

'ধরে নে তাই।'

'প্রাণটা কোথায় গেল? প্রাণ কেমন করে আসে, কেমন করে যায়?'

'তোদের ছাদের ঘুলঘুলিতে পাখি কেমন করে আসে, কেমন করে যায়।'

শংকর হঠাৎ তার সুরেলা ভরাট গলায় গেয়ে উঠল—'এসব পাখি এমনি করে উড়ে বেড়ায় ঘরে ঘরে। একদিন উড়বে সাধের ময়না।' আরতির মাথা ধীরে ধীরে পড়ে যাচ্ছে নিচের দিকে। ক্লান্তিতে, মানসিক বিপর্যয়ে মেয়েটা ঘুমিয়ে পড়ল। আরতির মাথা নেমে এল শংকরের কোলে। শংকরের নাকে এসে

লাগল আগুনের গন্ধ। শংকর আবার গান ধরল। প্রায় শেষ রাতে এক পাত্র ছাই হাতে ফিরে এল শ্মশানযাত্রীরা। শেষ রাতে শ্মশানঘাটে গঙ্গাস্নান। আরতি জীবনে গঙ্গার জলে পা দেয়নি। জলে নামতে ভয় পাচ্ছিল। শংকর বলেছিল, 'আমার কাঁধে হাত রাখো, তোমার কোনও ভয় নেই। আমি তোমাকে ধরছি।' আরতির কোমরের কাছটা সাবধানে ধরে পিছল পাড় বেয়ে দু'জনে নেমে গেল জলে। গেরুয়া রঙের গঙ্গার জল। কনকনে শীতল। আরতি প্রথমটা ভয়ে শংকরকে এমন ভাবে জড়িয়ে ধরেছিল, যেন সে ডুবে যাচ্ছে। এইমাত্র এতগুলো মৃত্যু পাশাপাশি দেখেও আরতির প্রাণভয় গেল না। প্রাণভয় কারোরই যেতে চায় না। জলে ভিজে শাড়ি জড়িয়ে যাচ্ছিল। স্রোতের টানে খুলে যাচ্ছিল আঁচল। আরতির বুকের কাছে দুলছিল লাল পাথর বসানো একটা হার। শংকর বলেছিল, 'হার সামলে। দেখো, খুলে চলে না যায়।' বলেই তার মনে হয়েছিল, পৃথিবীটা হল বিষয় আর বিষয়ীর। ছোটখাটো লাভক্ষতির চিন্তাটাই আগে আসে। শংকর মনে মনে গেয়ে উঠেছিল, শ্যানপাগল বাঁচিক আগল কাজ হবে না অমন হলে। শংকর বাচ্চাগুলোকে আর জলে নামতে দেয়নি। তাদের গায়ে জল ছিটিয়ে দিল। আশ্চর্য, একটা বাচ্চারও ঘুম পায়নি। সব কটা সমান উৎসাহে বড়দের সঙ্গে লেগে আছে। ঘটি ঘটি জল এনে চিতায় ঢেলেছে। কেবল সবকটাকেই একটু বিষণ্ণ আর মনমরা দেখাচ্ছে। শংকর এইটাই চেয়েছিল। শংকর আরতি দুজনে যখন পাশাপাশি ভিজে কাপড়ে হেঁটে চলেছে তখনই আমার মন বলছিল, এমনি ভাবে বাকিটা জীবন তারা পাশাপাশিই হাঁটবে।

পরিচালক ভদ্রলোক এইবার একাই এলেন, 'শুনুন আলুঅলা টাকা দিচ্ছে বলে, তার কথাই বেদবাক্য হবে, এমন ভাববেন না। অর্থ দিয়ে সাহিত্য কেনা যায় না। আর আমি ডিরেক্টার, আমারও একটা ফিউচার আছে। আপনি শুধু একটা কাজ করুন, করুণাকেতনের চিতাটা আরও একটু পরে নেবান। সূর্যোদয় হয়েছে, চিতায় পড়ল প্রথম জল। হু হু ধোঁয়া। সূর্যের প্রথম আলো। বাচ্চাগুলো হাঁ করে, বিস্ময় ভরা চোখে তাকিয়ে আছে উর্ধ্বগামী ধোঁয়ার কুণ্ডলির দিকে। তারপর শংকর আর আরতির রোমান্টিক স্নানের দৃশ্য। সকালের রোদ। গঙ্গার জলে চুরচুর ঢেউ। দিনের প্রথম আলোর সুন্দরী আলেয়া...।'

'আজ্ঞে আলেয়া নয় আরতি।'

'আরে মশাই ওই হল। হোয়াট ইজ ইন এ নেম। আপনাদের বড় উপন্যাসে

পাত্রপাত্রীর নাম পাকা ক্রিমিন্যালদের মতো ছত্রিশবার পাল্টে যায়, মনে রাখতে পারেন না। শেষে নোট দিতে হয়, শঙ্কর ওরফে শোভন, ওরফে বরেন। ওরফে মিলন। আমার কথা হল, সব কাহিনীরই একজন নায়ক, একজন নায়িকা আর এক পিস ভিলেন থাকে। নায়ক শঙ্কর নায়িকা নিশ্চয় আরতি আর ভিলেন হল গিয়ে ওই রতন হালদার। এখন ভিলেনের কাজ কী? সেটা অবশ্যই মনে আছে? ভিলেনের কাজ হল নায়ক নায়িকার মিলনে বাধা দেওয়া। এখন আগেরটা বলি। শিফন পরা নায়িকাকে ভিজিয়েছেন। উত্তম করেছেন। তার আগে নায়কের কোলে শুইয়েছেন, অতি উত্তম। গানের সিকোয়েন্স এনেছেন। বেশ করেছেন। আমার মনের মতো হয়েছে, তবে ওসব মন্ননা মার্কা গান, একালে অচল। ওখানে একটা মডার্ন লোকসংগীত বসাতে হবে। সে অবশ্য আপনার কাজ নয়। গীতিকার করবেন। কথা হল, রাজকাপুর মশাই জলে ভেজা-নায়িকা পেলে কি করতেন? আপনি অমন একটা সিকোয়েন্স অমাবস্যার অন্ধকারে ফেলে দিলেন। ভিজেকাপড়ে আরতি উঠে আসছে। শঙ্কর তার কোমর ধরে আছে। আরতি উঠছে। সামনে। আরতি হাঁটছে ক্যামেরা পেছনে। সূর্যের আলো সামনে থেকে চার্জ করছে, সানগান। এদিকে ব্যাক-লাইট। শঙ্কর আর আরতি সামনে এগিয়ে চলেছে। আহীর ভাঁয়রোতে একটা গান জাগো, জীবন জাগো, যৌবন জাগো। নার্গিস, রাজকাপুর যেন নতুন করে ফিরে এল। চিত্রজগতে শুরু হল নতুন পুরনো যুগ।'

'শ্মশানে সেকস? জিনিসটা বড় দৃষ্টিকটু।'

'ধুর মশাই। পাবলিক তো এইটাই চায়। তা ছাড়া, সমালোচকরা এর ভেতর থেকে কত বড় একটা মিনিং পাবে জানেন। চিতা, মানে জীবনের শেষ পরিণতি। সেই চিতার সামনে মিলন। সামনে উদিত সূর্য। জীবনের পথ। পেছনে একদল কিশোর। নবজীবন। নবযুগের প্রতীক। তার মানে মৃত্যুর কাছে জীবন জয়ী। উল্টে গেল, কথাটা হবে জীবনের কাছে মৃত্যু পরাজিত। কত বড় ফিলজফি একবার ভাবুন। নেতারা যেমন বলেন, আমিও আপনাকে সেইরকম বলি, আপনাদের হাত শক্ত করার জন্যে আমাদের হাত শক্ত করুন। এরপর আপনি ভিলেনটাকে একটু ফিল্ডে নামান। ভিলেন ছাড়া স্টোরি জমে! কে মশাই পয়সা খরচ করে শুধু চিতা জ্বলা দেখতে যাবে? একটা জিনিস নতুন এনেছেন, ভালোই করেছেন, এগজিবিশানিজম। জিনিসটাকে কায়দা করে কাজে লাগান। আরে মশাই মহাভারতের সেই দৃশ্যটার কথা একবার চিন্তা

করুন, ফ্যান্টাস্টিক। দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ হবে। দুর্যোধন বসে আছে, আরও সব বসে আছে কৌরব পক্ষীয়রা। দুর্যোধন সিল্কের লুঙ্গি তুলে উরু বের করে চাপড় মেরে বলছে, এসো সুন্দরী, এসো. বোসো এইখানে। মাই ডারলিং উঃ, এগ্জিবিশানিজমের কি অসাধারণ প্রয়োগ। শুনুন মশাই এদেশে অরিজিন্যাল বলে কিছুই নেই, সবই কপি। স্টোরি কপি, মিউজিক কপি, বিজ্ঞাপন কপি। অরিজিনাল হয় বিলেতে। আপনি মহাভারত থেকে ঝট করে ঝেড়ে দিন। মেয়েটার বাপটাকে মেরেছেন। মেয়েটা এখন ওপেন টু অল। রতন ব্যাটাকে দু'পাত্তর গিলিয়ে ঠেলে দিন মেয়েটার ঘরে। পরনে লুঙি, উদোম গা। মুখে সিগারেট। চেয়ারে গিয়ে বসল। মেয়েটা কিছু বলতে পারছে না। ভদ্র, শিক্ষিতা মেয়ে। রতন হাটুর ওপর লুঙি তুলে এলিয়ে বসে আছে। চোখ নাচাচ্ছে। মিটিমিটি হাসছে। মুখে চুকচুক শব্দ করছে। যেন বেড়ালকে ডাকছে দুধ খেতে।'

'কোনও কারণ ছাড়া ঘরে ঢুকে পড়বে? মামার বাড়ি নাকি?'

'ফিল্মের গোটাটাই তো মামারবাড়ি। আমার ওই সিচুয়েশানটা চাই, আপনি এবার মাথা খাটান। সেদিনেই তো বলেছি, তোমার আছে সুর, আর আমার আছে ভাষা। মনের কোণে আছে যত দুষ্টুমির বাসা।'

ভদ্রলোক পুকুরে চার ফেলে বিদায় নিলেন। করুণাকেতন যে খাটে এতকাল শুয়েছিলেন সেই খাটটি শূন্য। যেন বিশাল একটি হাহাকারের মতো ঘর জুড়ে পড়ে আছে। ঘরের কোণে ওপাশে একটা প্রদীপ জ্বলছে। আরতি বসে আছে চেয়ারে। সামনে টেবিল। টেবিলে জ্বলছে ল্যাম্প। রাত প্রায় আটটা সাড়ে আটটা হবে। প্রদীপটা জেবলে রেখে গেছেন শঙ্করের মা। করুণা-কেতন যতদিন ছিলেন, শঙ্করের মা বড় একটা আসতেন না। পঙ্গু হয়ে মানুষটি পড়ে থাকলেও তাঁকে ঘিরে ছিল অহঙ্কারের একটা বলয়। সেই কথায় বলে, 'মরা হাতি লাখ টাকা।' এখন শঙ্করের মা অসহায় মেয়েটাকে অসম্ভব ভালবেসে ফেলেছেন। এমন জীবন তিনি দেখেননি, মৃত্যুর পর একজনও এল না পাশে দাঁড়াতে। আত্মীয়-স্বজন অবশ্যই আছে। বড় বংশের ছেলে ছিলেন করুণা-কেতন। বড়রা বোধহয় এইরকম নিঃসঙ্গই হয়। শঙ্করের মা সারাদিনে বহুবার এই ঘরে চলে আসেন। এসে খাটের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন চুপ করে। এই বয়সে মৃত্যুর প্রতি মানুষের স্বাভাবিক একটা কৌতূহল জন্মায়। কি অদ্ভুত, এই ছিল, এই নেই। শঙ্করের মা আরতিকে মেয়ের মতো গ্রহণ করেছেন।

আরতি আলো জেবলে তাকে লেখা বাবার পুরনো চিঠি পড়ছে। আরতি যখন রাজস্থানের স্কুলে পড়ত, সেই সময়কার চিঠি। তখন বাড়ির অবস্থায় রমরমা। রাজস্থানের সেই স্কুলে, রাইডিং, শুটিং সবই শেখাত। আরতি অতীতে চলে গেছে। এদিকে রতন হালদার গুটিগুটি ঢুকছে। সর্বনাশ করেছে। লুঙি, গেঞ্জি পরেনি অবশ্য। বেশ ভদ্র সাজ গোজ। আজ বৃহস্পতিবার। মদ মনে হয় খায়নি। আজ তো ড্রাই-ডে। পা অবশ্য টলছে না। রতন দরজার সামনে দাঁড়িয়ে একবার কাশল। আরতি চিঠিতে এত বিভোর, শুনতেই পেল না। তখন রতন বললে,

'আসতে পারি দিদি ?'

'কে ?' চমকে চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল আরতি। দরজার সামনে এসে রতনকে দেখে ভয়ে পেয়ে গেল। তবু ভদ্রতা। বললে, 'আসুন, আসুন।'

'দিদি, আমি খারাপ লোক। আমার খুব বদনাম। অশিক্ষিত। ছোট ব্যবসা করি। মাল খাই। বউ পেটাই। আমার ভেতরে যাওয়া উচিত হবে না। আপনার পিতা মারা গেছেন। আমি মাদ্রাজ গিয়েছিলুম। আজ ফিরেছি। খবরটা শুনে আমার ভীষণ মন খারাপ হয়ে গেছে। আপনার মতো বয়সে আমিও আমার পিতাকে হারিয়েছিলুম। পিতার মৃত্যু কত দুঃখের, আমি জানি। বাবা তারকেশ্বর আপনাকে ভালো রাখুন। আমি আপনার জন্যে খুব ভালো দোকানের মিষ্টি আর কিছু ফল এনেছি। আর একটা মালা এনেছি, আপনার পিতার ছবিতে পরাবার জন্যে। আমি খুব শুদ্ধভাবে এনেছি। আজ আমি কোনও নেশাভাঙও করিনি।'

আরতি লক্ষ্য করল, রতন হালদারের চোখে জল এসে গেছে। আরতি অবাক হয়ে গেল।

'যাবো ? যদি কেউ কিছু ভাবে ?'

'ভাবে, ভাববে। আপনি আসুন।'

জমিদারের ঘরে যে-ভাবে প্রজা ঢোকে, রতন সেই ভাবে ভয়ে ভয়ে, চোরের মতো ঢুকে মেঝেতে বসতে যাচ্ছিল। আরতি বললে, 'ও কি করছেন ? চেয়ারে বসুন। চেয়ারে।'

রতন জড়ো সড়ো হয়ে চেয়ারে বসল। মালার প্যাকেটটা আরতির হাতে দিয়ে বললে, 'ছবিতে পরিয়ে দেবেন ?'

'আপনি পরিয়ে দিন না।'

'আমি ছবি ছোঁবো ?'

'কেন ছোঁবেন না। ছুঁলে কি হবে ?'

'আমাকে সবাই চরিত্রহীন বলে তো। তবে বিশ্বাস করুন, আমার চরিত্রে কোনও দোষ নেই। আমি একটু মদ খাই। সে আমার নিজের রোজগারে খাই। না খেলে আমার জীবনের অনেক দুঃখ ভুলতে পারবো না বলে খাই। বউকে আমি যেমন পেটাই আমার বউও তেমনি আমাকে ক্যাত ক্যাত করে লাথি মারে। কি মুখ! যেন নালা-নর্দমা। আবার কি বলে জানেন, বিয়ের আগে প্রফেসারের সঙ্গে প্রেম করতো। কত দুঃখ দেখুন, আজও আমাদের কোনও ছেলেপুলে হল না। কি বলে জানেন! আমি মদ খাই বলে হচ্ছে না। তাহলে তো বিলেতে কারোর ছেলেপুলে হত না।'

হঠাৎ রতন হালদার নিজের দু' কান ধরে জিভ কেটে বললে, 'ছিঃ ছিঃ, আপনার সামনে এসব আমি কি কথা বলছি! অশিক্ষিত হলে যা হয়।'

রতন হালদার খাটের ওপর বালিশে হেলানো করুণাকেতনের ছবিতে মালা পরিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে উঠে দাঁড়ালো। তারপর চেয়ারে না বসে বললে, 'আমি তেজস্বী মানুষকে ভীষণ শ্রদ্ধা করি। আমি যা শুনেছি, তাতে আপনার পিতাকে ভীষণ তেজস্বী মনে হয়েছে। আপনিও তেজস্বী। আপনার মনে আছে, একদিন আমি আপনার হাত ধরেছিলুম। আপনি আমাকে ভুল বুঝে বলেছিলেন, জুতো মারবো। আমি তখন ব্যাপারটা বোঝাবার মতো অবস্থায় ছিলুম না। নেশার ঘোরে পড়ে যেতে যেতে আমার মনে হয়েছিল আপনি আমার স্ত্রী। বিশ্বাস করুন, আমার ভুল হয়েছিল। আমি নিজের স্ত্রী ছাড়া অন্য সকলকে দেবীর মতো শ্রদ্ধা করি। এ আমার গুরুর নির্দেশ।'

ঠিক এই সময় শঙ্কর ঘরে এসে রতনকে দেখে বললে, 'এ কি. আপনি এখানে ?'

আরতি বললে, 'না, না, কোনও ভয় নেই শঙ্করদা। ইনি খুব সুন্দর মানুষ। আমরা সবাই দূরে থেকে এতদিন এঁকে ভুল বুঝে এসেছি। ইনি প্রকৃত ভদ্রলোক। কাছে না এলে মানুষকে ঠিক বোঝা যায় না।'

রতন শঙ্করের দিকে ঘুরে বললে, 'নমস্কার, শঙ্করবাবু। জানি, একটা কারণে আপনি আমার উপর খুব রেগে আছেন। আপনি আদর্শবাদী, সমাজ-সেবক, চরিত্রবান, কালীভক্ত, শিক্ষিত, সুন্দর, আপনি সব সব। আপনাকে আমি শ্রদ্ধা করি। এও জানি, আপনি তিন চারবার পুলিসের কাছে আমার নামে

কমপ্লেন করেছেন। আমি তার জন্য আপনার ওপর এতটুকু রাগ করিনি। কেন আমি মদ খাই জানেন? আমার মা, আর আমার ওই লাল পিঁপড়ে বউটার জন্যে। কি সাংঘাতিক কামড়, আপনি জানেন না! আর একটা জিনিস আপনি জানবেন, মদ খেলেই বউকে পেটাতে ইচ্ছে করবে। তাহলে জিনিসটা কি দাঁড়াল, বউয়ের জন্যে মদ, মদের জন্যে বউকে পেটানো। একটা গোলাকার ব্যাপার। আমার কি দোষ বলুন। আমি কি পেটাই? পেটায় আমার পেটের বোতল। জানেন কি আমার কোনও দাম্পত্য জীবন নেই।'

'আপনার ওই রুগ্ন স্ত্রীকে দিয়ে রোজ সকালে ভারি লোহার উনুনটা তোলান কেন। নিজে পারেন না।'

'কেন পারবো না, ওই তো আমাকে তুলতে দেয় না। আমার কোমরে একটা ফিক ব্যথা মতো আছে। মাঝে মাঝেই কষ্ট দেয়। তা আমার বউ বলে, ওই ভারি উনুন তুলতে গিয়ে চিরকালের মতো বিছানায় পড়ে গেলে কোন মিঞা দেখবে?'

'তার মানে আপনার স্ত্রী আপনাকে ভীষণ ভালোবাসেন।'

'বাসেই তো। আমিও ভীষণ ভালবাসি; ওই তো আমার একটি মাত্র স্ত্রী। জানেন তো, জীবনে স্ত্রী একবারই আসে। রাখতে পারলে রইল, না রাখতে পারলে গেল।'

'তাহলে অমন চিৎকার চেঁচামেঁচি, গালিগালাজ করেন কেন?'

'ছেলেবেলা থেকে ওইটাই আমার আদত। জানেন তো, মানুষ আসলে বাঁদরের জাত। আপনারা যাঁরা পড়ালেখা করেন তাঁরা জানেন। ঠিক মতো ট্রেনিং না পেলে আমার মতো দামড়া হয়ে যায়। ছেলেবেলায় বাবা আমাকে শুধু রতন বলতেন না। বলতেন, দামড়া রতন। আর আমার বউ, আমার এই স্বভাবটাই পছন্দ করে। চিৎকার, চেঁচামেচি যেদিন কম হয়, সেদিন জিজ্ঞেস করে, কি গো, তোমার শরীর ঠিক আছে তো?'

'তা এই যে বললেন, আপনার দাম্পত্য জীবন নেই।'

'সেটা হল, ছেলেপুলে না থাকলে দাম্পত্য জীবনের কি হল বলুন? তারপর তো ওই শরীর। ছত্রিশটা ব্যামো। সম্প্রতি যোগ হয়েছে ছুঁচিবাই। এইবার আমাকে বলুন, আমি কাকে পাশে নিয়ে শুই? বউ না ডিসপেনসারি। আমার এতখানি শরীর। তাই আমি মদ খাই। মদে একটা জিনিস হয়, চরিত্রটা মদেই আটকে থাকে। আর বেশি নড়াচড়া করতে পারে না।'

'এই যে বললেন, স্ত্রী আর মায়ের জন্যে মদ ধরেছেন।'

'সে কথাটাও ঠিক। রোজ মশাই দম খাটা খেটে বাড়ি ফেরার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেল কীর্তন। মা আসে বউ-এর নামে বলতে, বউ আসে মায়ের নামে বলতে। লে হালুয়া।'

রতন হালদার জিভ কেটে কান মললেন, 'এই আমার চরিত্র। কোথায় কি বলে ফেলি। মুখ নয় তো···।'

রতন তাড়াতাড়ি নিজের মুখ চেপে ধরে ঢোঁক গিলল। গিলে মুখ থেকে হাত সরিয়ে বললে, 'বুঝতে পারলেন ব্যাপারটা। কি বেরোতে চাইছিল। অ্যায় এই হল রতন হালদার! লক্ষ্মী ক্লথ স্টোরের মালিক। লক্ষ্মী হল, আমার স্ত্রীর নাম। তা নামটা মিলেছে জানেন। আসার পর থেকে রোজগারপাতি বেড়েছে। তা হয়েছে। ছোটলোক' হতে পারি মিথ্যেবাদী তো নই। না, আমি এবার যাই। আমার বউ একেবারে সিটিয়ে আছে। আসার সময় বলেই দিয়েছে, যাচ্ছ যাও, খুব সাবধান। যা-তা বলে মোরো না। খুব একটা যা-তা কিছু বলিনি, কি বলুন? খালি একটা শব্দ লিক করছিল।'

রতন আবার খাটের দিকে হাত তুলে নমস্কার করল. তারপর যেমন এসেছিল, সংযত হয়ে মাথা নিচু করে বেরিয়ে গেল। আমি অবাক। শঙ্কর আর আরতিও অবাক। শঙ্কর তৈরিই ছিল, এলোমেলো কিছু করলে, জীবনের প্রথম ঘুসিটা রতনের চোয়ালে গিয়েই পড়বে।

শঙ্কর বললে, 'এত সহজ সরল মানুষ আমি কমই দেখেছি।'

টেবিলের ওপর সাজানো রয়েছে রতন হালদারের আনা শহরের সেরা আপেল, মুসাম্বি, আতা, সফেদা, কলা। বিশাল এক বাক্স সন্দেশ। করুণাকেতনের ছবিতে দুলিয়ে দিয়ে গেছে, টাটকা, গোড়ের মালা। তলায় ঝুলছে টাটকা একটা গোলাপ। রোলেক্স চিকচিক করছে, আনন্দাশ্রুর মতো।

রতন হালদার তক্ষুনি আবার ফিরে এল। হাতে একটা বেশ বড় রঙিন প্যাকেট।

ঘরে সেই একই ভাবে সমীহ হয়ে ঢুকলো, 'একটা জিনিস ভুলে ফেলে এসেছিলুম। ধুপ। থেকে থেকে, ঘরের চারপাশে জ্বালিয়ে দিন। আমি আর দাঁড়াচ্ছি না। এদিকে এক কাণ্ড হয়েছে, আমার বউকে মনে হয় কাঁকড়া বিছে কামড়েছে। সেই কথায় বলে না, গোদের ওপর বিষ ফোড়া। আমি যাই দিদি।'

শংকর আর আরতির সেই রাতটা রতন হালদারের বউকে নিয়েই কেটে গেল। ডাক্তার, ইঞ্জেকসান, বরফ, পাখার বাতাস। সেবা। সব মিলিয়ে একটা রাত। মৃত মানুষের আত্মা এই খেলাটাই খেলেন। দুঃখ ভোলবার জন্যে একের পর এক বিপদ তৈরি করতে থাকেন। যাতে সব একেবারে তালগোল পাকিয়ে থাকে। মাথা না তুলতে পারে। সেই রাত্তেই রতন হালদারকে চেনা গেল। লোকটা কত খাঁটি। সারাটা রাত তার দৌড়ঝাঁপ। ছোটাছুটি। মনে হচ্ছিল, তার স্ত্রীকে নয়, বিছে তাকেই কামড়েছে। রতন যেন সেই প্রবাদ—শাসন করে যে-ই, সোহাগ করে সে-ই। ভোরের দিকে মনে হল, বিপদটা কেটে গেছে। একে রোগা শরীর তার ওপর বিছের কামড়। বিছে মানে বিছের রাজা, কাঁকড়া বিছে, প্রায় সাপের সমান। রতন হালদার ঠিকই বলেছে, তার বউয়ের শরীরে হাড়-কখানাই সার। স্রেফ ভেতরের তেজে মহিলা লড়ে যাচ্ছেন। রতন হালদার সত্যই সংযমী। অন্য কেউ হলে নারীসঙ্গের জন্য ছটফট করত। মদে আরও বাড়িয়ে দিত তার নারী-লিপ্সা। আর একটা ব্যাপার জানা ছিল না. সেটা হল রতনের ঈশ্বর-বিশ্বাস। দেয়ালের হুক থেকে ঝুলছিল রুদ্রাক্ষের মালা। রতন মাঝে মাঝেই সেই মালাটা নামিয়ে ঘরের কোণে বসে যাচ্ছিল জপে। সেটা এত আন্তরিক, যে কেউ বলতেই পারবে না, এটা ভণ্ডামি। কেউ হাসতেও পারবে না, নিউক্লিয়ার এজে, জপের শক্তি, ব্যাটা অশিক্ষিত গেঁয়ো কোথাকার।

মিনিবাস ছুটছে হুই হুই করে। জানালার ধারে বসে আছে আরতি। পাশে শংকর। আরতির রুক্ষ চুল বাতাসে উড়ছে। করুণাকেতনের মৃত্যু আরতি সহজভাবেই নিয়েছে। কষ্ট পাচ্ছিলেন ভীষণ। চলে গেলেন। আরতি এখন নিজের জীবনের পরিকল্পনা নিয়েই ব্যস্ত। বাগানবাড়ির দখলটা পেয়ে গেলেই সে একটা নার্সারি, কেজি স্কুল করবে। সে যোগ্যতা তার আছে। সে ঘোড়ায় চড়তে জানে, সে বন্দুক চালাতে জানে। ইংরেজি জানে সাংঘাতিক ভালো। ওই স্কুল কালে বড় হবে। বিশাল এক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। বাবার নামে নাম রাখবে সেই প্রতিষ্ঠানের—করুণাকেতন।

কণ্ডাক্টর কাছে আসতেই শংকর পকেটে হাত ঢোকাতে যাচ্ছিল, আরতি সঙ্গে সঙ্গে শঙ্করের হাত চেপে ধরল। খুব আস্তে বললে, 'এরই মধ্যে ভুলে গেলেন, আমাদের কাল রাতের চুক্তি।'

শংকর আরতির আঙুলগুলো দেখে মুগ্ধ হয়ে গেল। ঈশ্বর যাকে দেবেন মনে করেন, তার সবই ভাল করে দেন। লম্বা লম্বা মোচার কলির মতো আঙুল।

একেবারে দুধে-আলতা রঙ। ডগাগুলো সব টোপর টোপর গোলাপি। অনামিকায় একটা টুকটুকে লাল পাথর বসানো সোনার আংটি। যা মানিয়েছে। চোখ ফেরানো যায় না। শংকরকে ওইভাবে মুগ্ধ হয়ে যেতে দেখে আরতি বললে, 'কি হল আপনার ?'

'তোমার আঙুল। ঠিক যেন নন্দলাল বসুর ছবি।'

'এই রকম আঙুল আপনি কত মেয়ের পাবেন। আপনি মেয়েদের সঙ্গে মেশেন, যে জানবেন ?'

'তুমি এই আঙুলে বন্দুক ছুঁড়তে ?'

'হ্যাঁ। আমার টার্গেট খুব ভালো ছিল। সত্যি রাজস্থানের সেই দিনগুলো ভোলা যায় না। আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো দিন। দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায়, রইল না, রইল না, সেই যে আমার নানা রঙের দিনগুলি।'

শংকর হঠাৎ মুখ তুলে দেখে একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেল। কণ্ডাক্টর ছেলেটি অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে চুপ করে। সে-ও অবাক হয়ে আরতিকে দেখছে। টিকিটের পয়সা নিতে নিতে বললে, 'দিদি, আমি এত বছর কণ্ডাক্টারি করছি, আপনার মতো সুন্দরী দেখিনি। মনে হচ্ছে জ্যান্ত মা দুর্গা। আপনি কেন সিনেমায় নামছেন না দিদি। সুচিত্রা সেনের পর আর তো একই সঙ্গে অত সুন্দরী আর শক্তিশালী কেউ এলেন না।'

আরতি বললে, 'সিনেমায় নামা কি অত সোজা ভাই ?'

'আপনি একটু চেষ্টা করলেই চানস পেয়ে যাবেন।'

আরতি আর শংকর ভবানীপুরে নেমে পড়ল। আরতিদের অ্যাডভোকেট ভবতোষবাবুর চেম্বারে যখন গিয়ে পেঁছলো, তখন সন্ধ্যা হয় হয়। ভবতোষবাবু কোর্ট থেকে ফিরে সবে বসেছেন। এক মারোয়াড়ি মক্কেল রাজস্থানী বাংলায় খুব ক্যাচোর-ম্যাচোর করছেন। আরতিকে আসতে দেখে ভবতোষবাবু বললেন, 'একটু চুপ করুন।'

আরতির এমনই প্রভাব ভবতোষবাবু চেয়ার ছেড়ে প্রায় উঠেই পড়েছেন, 'এসো মা এসো।'

সামনের চেয়ারে বসতে বসতে আরতি বললে, 'বাবা, মারা গেছেন কাকাবাবু।'

মুখে মশলা দিতে যাচ্ছিলেন ভবতোষবাবু, তাঁর হাত নেমে এল। বললেন, 'যাঃ, একটা যুগ শেষ হয়ে গেল।'

ব্যবসায়ী ভদ্রলোক পাশ থেকে আরতিকে দেখছেন হাঁ করে। শংকরের মনে

হল মনে মনে তিনি হিসেব করছেন, 'ভাও কিতনা।'

ভবতোষবাবু বললেন, 'তোমরা জানো না, করুণাদা কত বড় ফাইটার ছিলেন? হি ওয়াজ এ গ্রেট সোল।'

কাজের মানুষ। সেণ্টিমেণ্ট নিয়ে পড়ে থাকার সময় নেই। ওই এক মিনিট নীরবতা পালনের মতো দু' কথাতেই সেরে দিয়ে আসল কথায় এসে গেলেন, 'খুব নিষ্ঠুরের মতোই বলছি মা, করুণাদা মারা গিয়ে তোমার কিছুটা সুবিধে করে দিলেন। কেসটাকে এবার আমি অন্যভাবে প্লেস করতে পারবো। তুমি এখন হেল্পলেস অসহায়। তোমার কেউ নেই। অ্যালোন ইন দিস ওয়ার্লড। বাই দি বাই, এই ছেলেটি কে? এত সুন্দর, স্বাস্থ্যবান, উজ্জ্বল যুবক, একালে সহসা দেখা যায় না।'

'আমরা একই বাড়িতে থাকি। আমার বন্ধু আমার দাদা, আমার শিক্ষক, আমার আদর্শ, আমি ঠিক বোঝাতে পারবো না, ইনি কে। একটি রেয়ার স্পেসিমেন, আই ক্যান সে।'

'ছেলেটিকে আমার ভীষণ ভালো লেগে গেল। আজকালকার খুব কম ছেলেই আমাকে মুগ্ধ করতে পারে। তুমি কি ব্রহ্মচর্য পালন করো?'

শঙ্কর বলল, 'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'ভেরি গুড। তুমি আমার বইটা পড়েছ? ইন প্রেইজ অফ ব্রহ্মচর্য।'

'বইটা আপনার লেখা? আপনি সেই ভবতোষ আচার্য। আপনার ওই বই-ই তো আমার ইন্সপিরেসান।'

শঙ্কর ঝট করে চেয়ার ছেড়ে উঠে, ভবতোষবাবুকে প্রণাম করল। ভবতোষবাবু সোজা দাঁড়িয়ে উঠে শঙ্করকে জড়িয়ে ধরলেন বুকে। সেই অবস্থায় এক হাতে শঙ্করের পিঠ চাবড়াতে লাগলেন। দু' হাতে, শঙ্করের দু' কাঁধ ধরে, সামনে সোজা দাঁড় করিয়ে, শঙ্করকে দেখতে দেখতে বললেন, 'চেস্ট কত?'

'ছেচল্লিশ।'

'ভেরি গুড।'

শঙ্কর ফিরে এসে চেয়ারে বসল। মাড়োয়াড়ি ভদ্রলোক অবাক হয়ে বাঙালিদের কাণ্ডকারখানা দেখছিলেন, অবশেষে থাকতে না পেরে জিজ্ঞেস করলেন, 'কেসটা কি ছিল? প্রোপার্টি কি ডামেজ স্যুট?'

ভবতোষবাবু বললেন, 'প্রপার্টি। হিউম্যান প্রপার্টি।'

'বিষোয় বিষ আছে। আমি তো মোশাই পাগোল হয়ে গেছি। চার ছেলেকে

চারটে প্রোপার্টি দিলিয়ে দিলুম, লেকিন শান্তি হোলো না দাদা। বোড়োটা ওখোন বলছে কি, আমাকে আরো দাও। মেজোর মকানের সামনে দিয়ে পাতাল রেল গেছে। আরে উল্লুকা পাঠঠে মেজোর তো ফ্ল্যাট। তোর তো বাগানবাড়ি। একটা গাড়ি নতুন মোডেল, আর একটা গাড়ি পুরানা মোডেল। আমি কি দিল্লি যাবো। দরবার লাগাবো। বেলেঘাটামে পাতাল রেল চালিয়ে দাও। মোশা আমি ভাবছি কি ভিখিরি হোয়ে যাই। জোয় রাম। দেখি একটা হুবন লাগাই, কি দোশ মণ ঘিউ ঢালি।'

'আপনার তো মশাই টাকায় ছাতা পড়ছে। এক বস্তা দিয়ে দিন না।'

'টাকা তো আমাদের কাছে টয়লেট পেপার। নো ভ্যালু। আমরা চাই রিয়েল এস্টেট। সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউতে নো বাড়ি। এদিকে কুছু আছে পুরনো বাঙালি বাড়ি। চেষ্টা তো চালিয়েছি। লেকিন সোব লিটিগেশানে আটকে আছে। ফ্রি প্রোপার্টি কোথায় ? এই আপনারটা ফ্রি আছে। হামি এক কোটির অফার দিয়ে রাখছি।'

'দশ বছর অপেক্ষা করুন। আমি আগে মরি।'

'লেকিন আপনি মোরলেই তো লিটিগেশানে চলে যাবে। যা করবেন মরার কম সে কম সাতদিন আগে করুন।'

'আমি কনট্যাক্ট করে ফাইন্যাল ডেটটা জেনেনি।'

মারোয়াড়ি ভদ্রলোক হাহা করে হাসলেন।

ভবতোষ আরতিকে বললেন, 'ডেথ সার্টিফিকেটটা আমাকে আগে পাঠাও। ফাইনাল লড়াইটা শুরু করা যাক। তোমাদের দুজনের বিয়ে হলে আমি খুব খুশি হব। তবে কেসটা ফয়সালা হবার আগে নয়। ফাইন ইয়াং ম্যান, তোমার নামটা কি ?'

'আজ্ঞে আমার নাম শঙ্কর মুখার্জি।'

'আরতিকে তোমার পছন্দ ?'

'আমি বেকার। আমার বোনের এখনও বিয়ে হয়নি। বিয়ের বাজারে আমি অচল কাকাবাবু।'

'তুমি অচল থাকবে না শঙ্কর। তুমি সচল হয়ে যাবে। যদি তুমি বিবাহ করো, আরতিকে করো। আমি নিজে আরতিকে সম্প্রদান করবো তোমার হাতে। যাও। তোমাদের মঙ্গল হোক। এইবার আমাকে কাজ করতে দাও।'

দুজনে হাঁটতে হাঁটতে অনেক দূর চলে এল। আরতি বললে, 'শঙ্করদা,

আপনি ছাড়া সত্যিই কিন্তু আমার আর কেউ নেই। এই পৃথিবীতে আমি কিন্তু একেবারে একা। এই কথাটা আপনাকে মনে রাখতে হবে। আমি কি খুব বেশি দাবি করে ফেলছি?'

'আরতি, তোমার স্বামী হবার যোগ্যতা আমার নেই, তবে এইটুকু বলতে পারি, যতদিন প্রয়োজন হবে, আমি তোমার ম্যানেজারি করবো। তোমার সেবা করবো। আমি কামজয়ী নই। কোনও মানুষের পক্ষে সম্ভব নয় কামজয়ী হওয়া। চেষ্টা করবে, হারবে, আবার চেষ্টা করবে। বাইরে একটা ভাব দেখাবে নির্বিকার, কিন্তু ভেতরে ভেতরে জ্বলে পুড়ে যাবে। তবে নিজেকে নানাভাবে ব্যস্ত রাখলে আক্রমণটা কম হবে। সত্যি কথা বলবো, তোমাকে কখনও মনে হয় প্রেমিকা, কখনও মনে হয় আমার আদরের ছোট বোন। দু'রকমের ভাব হয় আমার। তবে তৃতীয় আর একটা ভাব ভীষণ প্রবল তোমাকে আগলে রাখা, তোমাকে সামলে রাখা, তুমি আমার এত আদরের যে তোমার গায়ে যেন কোনও কিছুর স্পর্শ না লাগে। কর্কশ জীবন, কর্কশ সময় যেন তোমাকে ছুঁতে না দেয়। আমার চোখে, তুমি হলে পৃথিবীর সুন্দরতম ফুল। তুমি বলবে, হঠাৎ আমার এমন ভাব হল কেন? আমি বলব, এইভাবেই হয়। তোমার ওই ভুরু কোঁচকানো হাসি। তোমার কণ্ঠস্বর, তোমার কথা বলার ধরন, এইগুলো হল তোমার ব্যক্তিত্বের দিক, আমাকে এক কথায় কাবু করে ফেলেছে। তুমি প্রথম আমাকে চুম্বকের মতো টেনেছিলে সেই ফুলের দোকানের সামনে। পাশ থেকে রোদঝলসানো তোমার ধারালো মুখ দেখে, তোমার চাবুকের মতো শরীর দেখে আমি আত্মহারা হয়ে গিয়েছিলুম। তোমার কাছে আমি নিজেকে লুকোতে চাই না। গোপনীয়তাটাই পাপ। সেদিন তোমার ঘামে ভেজা কোমর ছুঁয়ে আমার ডান হাত এগিয়ে গিয়েছিল বালতি থেকে নোট তুলতে। সেই স্পর্শে আমি পেয়েছিলুম বিদ্যুৎ-তরঙ্গ। সেদিন আমি তোমার প্রেমিক। আবার যেদিন শ্মশানে, গঙ্গারধারে আমার বুকে মাথা রাখলে, তখন মনে হচ্ছিল আমাদের দু'জনেরই পিতৃবিয়োগ হয়েছে। আমরা দুটি ভাইবোন। আবার শেষ রাতে স্নানের পর তোমাকে যখন ভিজে কাপড়ে জল থেকে তুলছিলুম তখন মনে হচ্ছিল তুমি আমার নায়িকা। এইবার বলো আমাকে তোমার কেমন লাগে? আমার সম্পর্কে তোমার কি ভাব?'

দু'জনে অন্ধকার মতো একটা জায়গায় চলে এসেছে। দোকান পাট নেই। কিছুটা দূরে আবার আলোর এলাকা। ডানপাশে একটা পার্ক। আরতি

দাঁড়িয়ে পড়ল। শংকরকে বললে, 'আমার মুখটা এই আলোছায়ায় তুমি দেখ। যে কথা বলা যায় না, সে কথা ফুটে ওঠে মুখে।'

শংকর আকাশের আলোয় আরতির মুখের দিকে তাকাল। এ মুখ নায়িকার। চোখ দুটো যেন ইরানী ছুরি। পাশ দিয়ে এক প্রবীণ যেতে যেতে বললেন, 'উচ্চিক পোকা পড়েছে চোখে। অন্ধকারে হবে না, আলোতে নিয়ে যাও। নরম রুমালের কোণ দিয়ে টুক করে তুলে নাও। বাড়ি গিয়ে দু ফোঁটা গোলাপজল।'

পরিচালক আর প্রযোজক দু'জনেই এসেছেন আজ, সাদা, রঙ-চটা একটা অ্যামবাসাডার চেপে। যাক, আর কিছু না হোক, একটা বাহন হয়েছে। প্রযোজক বললেন, 'স্টোরির কি খবর ?'

'এই খবর।'

'সে কি ভিলেনটাকে মেরে ফেললেন।'

মারিনি তো, মানে মারিনি তো। এখন আমি আর লিখছি না। আমি আজ্ঞাবহ দাসমাত্র।'

'ওই হল। ও সব আপনাদের অনেক ভড়ং আছে। ধর্মের পথ মানেই মৃত্যুর পথ। স্টোরিটার আর কি রইল। তারপর আবার সেই রাত। আপনি নায়ক-নায়িকাকে একটা ঘনিষ্ঠ অবস্থায় নিয়ে এলেন,এনে কি করলেন, ডুবিয়ে দিলেন অন্ধকারে। আপনাকে অন্ধকারে পেয়েছে'।

পরিচালক বললেন, 'না, না, আধো অন্ধকার ডানপাশে একটা পার্ক, ইরাণী ছুরির মতো চোখ, আমার ক্যামেরার পক্ষে খুব ভালো। এ-সব মফট সিন। এর মর্ম আপনি বুঝবেন না। আপনি শুধু দয়া করে ওদের পার্কের মধ্যে ঢুকিয়ে দিন, তারপর খেল কাকে বলে আমি দেখিয়ে দিচ্ছি।'

প্রযোজক বললেন, 'তারপর কি হবে, পুলিস দু ব্যাটাকেই মারতে মারতে নিয়ে যাবে ভবানীপুর থানায় ?'

পরিচালক বললেন, আজ্ঞে না, এইখানেই আসবে নতুন এক ভিলেন, প্রেমের ঘুঘুটির পালক ছেঁড়ার জন্যে। আর প্রেমিক মোরগটির সঙ্গে লেগে যাবে ঝটাপটি। ফাইট সিকোয়েন্স।

প্রযোজক বললেন, 'আমি সাফ কথা জানতে চাই, শংকর আর আরতির বিয়ে হবে কি হবে না।'

পরিচালক বললেন, 'বলুন কি হবে ?'

এই ঘটনার ঠিক তিন দিন পরে একটা গাড়ি এসে দাঁড়াল আরতিদের

বাড়ির সামনে, নেবে এলেন ভবতোষ আচার্য ও আর এক ভদ্রলোক। শঙ্কর বেরোচিল পড়াতে যাবে বলে।

ভবতোষ বললেন, এই যে আমার ইয়ংম্যান, আরতি আছে?'

আছে কাকাবাবু। আসুন, ভেতরে আসুন।'

আরতি সবে চান সেরে চুলের জট ছাড়াচ্ছিল। ভবতোষ বললে, 'মা, দেখ কে এসেছেন?'

আরতি বললে, 'কে, রাধুকাকা।'

'দু'জনে ঘরে ঢুকলেন। ভবতোষ শঙ্করের মুখের ওপর দরজাটা বন্ধ করতে করতে বললেন, 'ইয়াংম্যান, আমরা একটু একান্ত বৈষয়িক কথা বলব, বাবা। যাবার সময় দেখা করে যাবো তোমার সঙ্গে।'

শঙ্করের মা জিজ্ঞেস করলেন, 'কে রে শঙ্কু?'

'আরতিদের উকিলমশাই। তুমি একটু চা বসাও মা। আমি খাবার কিনে আনি। মস্ত মানুষ। আমার গুরুও বলতে পারো।'

রাধুবাবু বললেন, 'করুণা মারা গেছেন আমি শুনেছি। তুমি আমার বন্ধুকন্যা। তোমার প্রতি আমার একটা কর্তব্য আছে। বলতে পারো, স্রেফ জেদাজেদির বশে এই কোর্ট কাছারি-মামলা। আমি এখন আমার সেনসে ফিরে এসেছি। আর মামলা নয়। এইবার সহজ সমাধান। এই পরিবেশে তোমার আর এক মিনিট থাকা চলবে না।'

'চোদ্দ বছর রয়েছি কাকু।'

'সে তোমার বাবার জেদে। আর না, প্যাক-আপ, প্যাক-আপ।'

ভবতোষ বললেন, 'প্যাক আপ, প্যাক আপ।'

'কোথায় যাবো আমরা?'

'বারাসাতে, তোমার বাগানবাড়িতে। যা আমি আজ চোদ্দ বছর আগলে বসে আছি। দেখবে চলো, সেখানে তোমার মানসদা কি করেছে? বিশাল এক নার্সিং হোম। সেই নার্সিং হোমের নাম হবে, করুণাকেতন। সেখানে তোমার কত কাজ। এক যুগ ধরে তুমি সেবা করেছ বাবার। এইবার করবে সমাজের। তুমি হবে নিবেদিতা। দিস ইজ নট ইওর প্রেস, মা। তুমি এখন বন্ধনমুক্ত, তোমার সামনে নবদিগন্ত।'

'আমি একবার শঙ্করদার সঙ্গে পরামর্শ করেনি।'

ভবতোষ বললেন, 'কোনও দরকার নেই মা, আমরা ছাড়া, তোমার কে

আছে ? রোমানস রোমানস্, জীবন জীবন। তোমার ব্যাগে সামান্য কিছু ভরে নাও, ভ্যালুয়েবলস্। পরে সব লরিতে যাবে। তোমার ফিউচারের একটা সমাধান করতে পেরে আজ আমার ঘাম দিয়ে জবর ছেড়ে গেল।'

'আমি শঙ্করদার সঙ্গে একবার কথা বলব।'

'না, করুণাকেতনের মেয়ে হয়ে তুমি কোনও ফিল্ম নাটক করতে পারবে না। তুমি আর দেরি কোরো না। ওদিকে মানস বেচারা রাইটার্স বিল্ডিং-এর সামনে দাঁড়িয়ে থাকবে।'

আমি যদি না যাই।

রাধুকাকা বললেন, 'তোমার ভবিষ্যৎ অন্ধকার হবে। আমার স্বপ্ন ভেঙে যাবে। তোমার পিতা দুঃখ পাবেন। আমরা ঠিক করেছিলুম, আমাদের দুজনের যদি ছেলে আর মেয়ে হয়, তাহলে তাদের বিয়ে হবে। আমরা ছেলে মানস এফ-আর-সি-এস।'

রাধুকাকা বললেন, 'এতে হবে কি তুমি তোমার সম্পত্তি ফিরে পেলে। প্লাস পেলে আধুনিক এক নার্সিং হোম। যে হোমের নাম হবে করুণাকেতন। মামলা লড়ে যা তুমি কোন দিন পাবে না।'

কাকাবাবু ক'লাখ ?'

'ক'লাখ মানে ?'

'রাধুকাকু ক'লাখ খাইয়েছেন আপনাকে ?'

দুই প্রবীণের চোখ-মুখ লাল হয়ে গেল। হড়াস করে দরজা খুলে গেল। দু'জনে ছিটকে বেরিয়ে এলেন। শঙ্কর আর তার মা চা-খাবার নিয়ে আসছিলেন। ছিটকে পড়ে গেল। ভবতোষ ঝড়ের বেগে বেরিয়ে যেতে বললেন, ব্রহ্মচারীর বিয়ে করা উচিত নয়।

আরতি একটু গলা চড়িয়ে বললে, 'চোদ্দ বছর যখন একা চলতে পেরেছি, বাকি জীবনটাও পারবো।'

প্রযোজক বললেন, 'সেই পাঁচশো টাকা আছে, না খরচ হয়ে গেছে।'

'চলেনি, সব কটা অচল।'

'আজ্ঞে হ্যাঁ, ওটাই আমাদের হাতের পাঁচ, হাতের প্যাঁচও বলতে পারেন। দিন। আবার আর এক জায়গায় গিয়ে টোপ ফেলি।' বিকট শব্দ করে গাড়িটা চলে গেল। আমার নিয়তির অট্টহাসি।